শিল্পীর নবজন্ম

দ্বিতীয় খণ্ড

রম্যাঁ রলাঁ

অনুবাদ : সরোজকুমার দত্ত

ভূমিকা : সরোজ আচার্য

অগ্রণী বুক ক্লাব

১৬, বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা

প্রকাশক
প্রফুল্ল রায়
অগ্রণী বুক ক্লাব
১৬ বৃন্দাবন বসু লেন
কলিকাতা

মুদ্রাকর
শ্রীফণীভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেস
৩৭।৭ বেণিয়াটোলা লেন
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লকনির্মাণ ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা

আড়াই টাকা

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৪৬
কার্তিক ১৩৫৩

ভূমিকা

রম্যাঁ রলাঁর "আমি থামিব না" (*I Will Not Rest*) গ্রন্থ বাংলায় পরিচিত হয়েছে শিল্পীর নবজন্ম নামে। নামকরণ সার্থক। সংগীত-রসিক রলাঁ, কথাশিল্পী রলাঁ "বিশুদ্ধ" আর্টের রুদ্ধদ্বার মন্দির থেকে নেমে এসেছেন মাটিতে,—যে-মাটির সঙ্গে আকাশের বিরোধ নাই। "আমি থামিব না" গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে শিল্পী রলাঁর নবজন্মের স্বাক্ষর। রলাঁর আত্ম-পরিশুদ্ধি ও প্রসারণের কাহিনী কিন্তু তাঁর একলার কথা নয়, গোটা একটা ঐতিহাসিক যুগের কাহিনী·শিল্পী রলাঁর নবজন্ম। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বাইশটি প্রবন্ধ, ও একটি উপসংহারে যে ঘটনাপ্রবাহের আলোচনা করা হয়েছে তার সঙ্গে এই শতাব্দীর সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ জড়িয়ে রয়েছে।

আমাদের যুগ সংকটের, সংশয়ের, সংগ্রামের যুগ। সেই রাজকীয় শান্তি ও সুনিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যের দিন আর নাই, যখন কি না শিল্পী, সাহিত্যিক, সুরকার ভাবতে পারতো, আমরা আছি সব কোলাহল ও কুশ্রীতার ঊর্ধ্বে, জগতের ভালোমন্দ ব্যাপারে নিরাসক্ত। শিল্পীর স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টিলোক আজ বিগতদিনের কাহিনী মাত্র। কবি এলিয়ট অবশ্য এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধের যুগেও স্পেণ্ডরকে উপদেশ দিয়েছেন, যুদ্ধের কথা ভুলে যাও, ভুলে যাও পারিপার্শ্বিকের কথা। নিজের মত আর্ট সৃষ্টি করে যাও। তবুও শিল্পীর গজদন্ত মিনারের চূড়াতে আজ আর নিরঙ্কুশ শান্তির আশ্বাস নাই। তাই অমন যে আর্টের স্বাতন্ত্র্যবাদী মনস্বিনী ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, তাঁকেও শেষজীবনে মান্‌তে হ'ল, গজদন্ত মিনার বেঁকে পড়ছে (Leaning Tower), ভেঙে পড়ছে। সভ্যতার সংকটমুহূর্তে শিল্পীরও আর নির্লিপ্ত থাক্‌বার সুযোগ নাই। আমাদের দেশেও কি তার আভাস পাচ্ছি না শিল্পী-গোষ্ঠীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিচয়ের মধ্যে? কংগ্রেস সাহিত্যিক, প্রগতিবাদী সাহিত্যিক, সাম্যবাদী সাহিত্যিক—

শিল্পীদের এই বিভিন্ন ভূমিকার মূলে একটিমাত্র সর্বজনসম্মত সত্য রয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে শিল্পীরা সমাজসচেতন হচ্ছেন।

রলাঁর নবজন্ম সেই সত্যকেই প্রতিফলিত করেছে। আমার জন্যই আর্ট, আমার শিল্পলোক জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন, এই রকম বৈদান্তিক আর্টের গণ্ডী পেরিয়ে এসেছেন রলাঁ তাঁর "আমি থামিব না" গ্রন্থে। জাঁ ক্রিস্তফের স্রষ্টা হিসাবেই রলাঁর প্রথম পরিচয়, কিন্তু ক্রিস্তফের জীবনদর্শনে এই "আমি"ই প্রবলভাবে উচ্চারিত ছিল, যদিও ক্রিস্তফও আদর্শের জন্য লড়াই করতে ভয় পায়নি। জাঁ ক্রিস্তফের কাহিনীতে সমাজমানসের উপরে, প্রতিদিনের জীবনের জটিলতার উপর শিল্পীমনের অবজ্ঞার সীমা নাই। ক্রিস্তফ বারবার চেষ্টা করেছে নিজেকে সমাজের উর্ধ্বে তুলে ধরতে; প্রতিভা ও পরিবেশের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ক্রিস্তফ আশ্রয় নিয়েছে কল্পনার শান্তিনিকেতনে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পরিবেশে কোথায় যে গলদ তার সন্ধান নেবার মত ধৈর্য ও স্থির বুদ্ধি ক্রিস্তফের ছিল না।

রলাঁর প্রতিভা কিন্তু জাঁ ক্রিস্তফের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হয়নি। বড় প্রতিভার এইটাই বিস্ময়কর দিক যে কোনো বিশেষ সৃষ্টির মধ্যেই তা' সমাপ্ত নয়, প্রতি মুহূর্তেই তার চেষ্টা এগিয়ে চলা, নিজেকে অতিক্রম করা। রেনে আর্কো তাই লিখেছেন, রম্যাঁ রলাঁ সম্বন্ধে বলতে পারা যায় সেই কথা যা তিনি নিজে লিখেছেন গ্যেটে সম্বন্ধে— "একটা ছবির ফ্রেমে তাঁকে আটকে রাখবার চেষ্টা করা বৃথা। কেউ তা কখনো পারেনি।" জাঁ ক্রিস্তফ রলাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। ক্রিস্তফ লেখা শেষ হয়েছিল ১৯১২ সনে। শক্তিমান কথাশিল্পী হিসাবে রলাঁর খ্যাতি তখন সারা য়ুরোপে। তবুও রলাঁ ত কেবল শিল্পী হবেন না। তিনি যে হবেন শিল্পী-যোদ্ধা। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকে গত বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমকাল পর্যন্ত রলাঁ হয়েছিলেন শিল্পী-যোদ্ধা। জাঁ ক্রিস্তফ থেকে "যুদ্ধের উর্ধ্বে," "বিমুগ্ধ আত্মায়" (*The Soul Enchanted*), "আমি থামিবে না" গ্রন্থে,

অসংখ্য পুস্তিকায় ও প্রবন্ধে রলাঁর শিল্প-প্রতিভার যে অপূর্ব বিবর্তন দেখা যায় তা' আমাদের যুগের আদর্শ সংঘাতেরই কাহিনী। "বিমুগ্ধ আত্মায়" আনেৎ ও মার্ক এই আদর্শ-সংঘাতের মূল খুঁজে বার করেছে, ক্রিস্তফ যা পারেনি। আনেৎ ও মার্ক দেখেছে আমাদের আত্মিক দুর্গতির মূলে রয়েছে ধনতন্ত্রের বীভৎস লোলুপতা; তারা জেনেছে গণশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবীর কল্পিত স্বাধীনতা কত অসহায়, দিশাহীন; শান্তি, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী কী নির্লজ্জ ভাবেই না বাজারের পণ্যে পরিণত হচ্ছে। আনেৎ ও মার্কের চোখে তাই ভাবীসমাজের স্বপ্ন; নতুন জীবনাদর্শ সফল করবার দৃঢ় সংকল্প মনে। "আমি থামিব না" গ্রন্থের মূল সুরটিও এই।

সভ্যতার শেষ সংগ্রামে পিছিয়ে থাকলে চলবে না, শিল্পীকেও যোদ্ধার বেশে নেমে আসতে হবে গণ-সংগঠনের সাহায্যে।

"বিমুগ্ধ আত্মায়", "আমি থামিব না" গ্রন্থে, রলাঁপ্রতিভার যে পরিচয় পাই, শিল্পীর মানবতা-বোধের সেইটিই শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কম্যুনের রক্তরঞ্জিত ফ্রান্সে রলাঁর জন্ম, ভলতেয়র-হুগোর তিনি মানসশিষ্য। রলাঁ ভুলতে পারেননি ভলতেয়রের বজ্রগর্ভ বিদ্রোহের বাণী।

"গোনা কয়েকটি দিনমাত্র আমাদের আয়ু। সেই দিনগুলি যেন আমরা নীচ দুর্বৃত্তদের পায়ের তলায় গুঁড়ি মেরে না কাটাই।" রলাঁ ভুলতে পারেননি হুগোর কথা।

"কেবলমাত্র নিজেরই জন্য জীবন যাপন, এই সুখভোগ করার অধিকার আমাদের নাই।" আর একজন শিল্পী-যোদ্ধাও অমনিভাবে বলেছিলেন, বড় কবি যে হতে চায় তার জীবনকেও একটা মহৎ কবিতার মত করে তুলতে হবে। মিল্টনের এই উক্তি "আমি থামিব না" গ্রন্থের লেখক, ক্রিস্তফের স্রষ্টার জীবনে ব্যর্থ হয়নি। সংকটকে এড়িয়ে যাব না। সুদূর স্বপ্নচারী আত্মসর্বস্বতাকে আত্মহত্যা বলে মনে করব, মানবতার মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে চলব—এই-ই আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীযোদ্ধার জীবনবেদ।

রলাঁর মৃত্যুর পরে লণ্ডনের এক বেতার বক্তৃতায় রসজ্ঞ সাহিত্যিক ই. এম ফর্স্টার বলেছেন, পঁচিশ বছর পূর্বে রলাঁকে মনে হয়েছিল টলস্টয়ের সমকক্ষ, লোকে আশা করেছিল তিনি হবেন য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। সে আশা পূর্ণ হয়নি। ফর্স্টারের মতে রলাঁর শেষজীবনে লোকে তাঁকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। ফর্স্টার বনিয়াদী সাহিত্য-সমালোচক। সম্ভবত লোক বল্‌তে তিনি বনিয়াদী সাহিত্যিকগোষ্ঠীকেই বোঝাচ্ছেন। "বিশুদ্ধ" সাহিত্যের আসরে রলাঁ বিস্মৃতপ্রায় হতে পারেন। তার কারণও পাঠকেরা খুঁজে পাবেন "আমি থামিব না" গ্রন্থে। শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে রলাঁর মতামত যেমন সুস্পষ্ট, তাঁর নিজের শিল্পী জীবনের অভিজ্ঞতাও তেমনি দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী। একদিকে রলাঁর সংগ্রামপ্রবণতা ও তাঁর সাম্যবাদে বিশ্বাস, অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বনিয়াদী বুদ্ধিজীবীদের আত্মপ্রতারণা ও আত্মসমর্পণ প্রতিক্রিয়ার কাছে এই সবই "বিশুদ্ধ" সাহিত্যের সদর দপ্তরে রলাঁর খ্যাতিকে মলিন করেছিল। আমাদের দেশেও তার জের চলেছে দেখতে পাই। ভারতবর্ষে রলাঁর প্রধান পরিচয় গান্ধীজী শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চরিতকার হিসাবে; রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ রূপেও রলাঁ কোনো কোনো ভারতীয় সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কাছে সমাদর পেয়েছেন। এইই রলাঁ-প্রতিভার অবশ্য সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। গান্ধীজী শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনেও রলাঁ অধ্যাত্ম-বিলাসের সন্ধান করেননি। রলাঁর "হিরো" হ'ল তাঁরাই যাঁরা মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ, যাঁরা জনগণের উপরওয়ালা নন, তাদের স্বাধিকার প্রচেষ্টার সহযাত্রী। "হিরো" এবং "পিপল" (People) মানব-মুক্তির পথ-সন্ধানে এরাই হ'ল রলাঁর ধ্রুবতারা।

"আমি থামিব না" সেই মানব-মুক্তির পথ-সন্ধানীর ডায়েরী। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে রলাঁ বলেছেন, "আমাদের যুগ যেপথে চলেছে, তার উদ্যম, তার যন্ত্রণা, তার বিভ্রম, তার অন্ধতা তার পুনরাবিষ্কৃত আলোক, আমার বিশ্বাস এর অনেক অংশ এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে।" ১৯১৯ সন থেকে পনের বৎসরের

ভাব-দ্বন্দ্বের ইতিহাস রয়েছে এই গ্রন্থে। রলাঁর নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা এই পনের বৎসরের অবিশ্রান্ত অনুসন্ধানের ফলে যে-সত্য আবিষ্কার করেছে তা ঘোষণা করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। "আমি থামিব না" গ্রন্থ সভ্যতার যুগসন্ধিক্ষণে এই সত্যকেই পৃথিবীর মুক্তি-কামীদের সামনে তুলে ধরেছে; "কমিউনিজম হচ্ছে বর্তমান সামাজিক কর্মপন্থার একটিমাত্র বিশ্বব্যাপী পার্টি, যা' কোনো রফা না করে ও কিছুই গোপন না করে পতাকা বহন করছে।" রলাঁ সাম্যবাদী। বুদ্ধির কাল্পনিক আভিজাত্যকে আশ্রয় করে তিনি গণমুক্তির সংগ্রামকে এড়িয়ে থাকাকে ঘৃণা করেছেন।

আমাদের দেশের রলাঁ-ভক্ত বুদ্ধিজীবী অনেকেরই এই কথাটি জানবার দরকার আছে। রলাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সাম্যবাদী আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টাকে অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছিল এদেশে। আমাদেরই কোনো খ্যাতনামা সাহিত্যিক বলেছিলেন, "রলাঁ ছিলেন দলগত গণ্ডীর ঊর্ধ্বে, যাঁরা স্বয়ং মহৎ এবং যাঁদের সকল মোহ অপগত হয়েছে।" এর উত্তর রলাঁ নিজেই দিয়ে গেছেন শিল্পীর নবজন্মে। রলাঁ বলেছেন, "সামাজিক, নৈতিক ও জাতিগত কুসংস্কারের বিপুল অস্ত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ পুরানো ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী জগতকে ধ্বংস করে যাঁরা নতুন জগত সৃষ্টি করার চেষ্টায় আছেন তাদের সকল কর্মে, সকল আশায়, সকল দুঃখবেদনার মধ্যে আমি আছি।" বনিয়াদী বুদ্ধিজীবীর ছদ্ম নিরপেক্ষতার ("দলগত গণ্ডীর ঊর্ধ্বে") বিরুদ্ধেও রলাঁ বারবার বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

"বুদ্ধিজীবিগণ সুবিধাভোগী শ্রেণী। শোষণকারীরা যে সম্মান ও সুযোগ সুবিধা তাদের দেয় তাতেই কৃতার্থ হয়ে তারা জনসাধারণের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।" রলাঁর "আমি থামিব না" কেবলমাত্র শিল্পীর নবজন্মের স্বাক্ষর নয়, কোটি কোটি নির্যাতিত জনসাধারণের মুক্তি সংগ্রামে হাত মিলানোর জন্য বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর কাছে আবেদনও এইটি।

আমাদের দেশের বনিয়াদী সাহিত্যের সমাজ-পতিরা দাবী করেছেন, রলাঁ

ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-গান্ধী-বিবেকানন্দের চরিতকার, যুদ্ধ-বিরোধী এই মাত্র, আর কিছু নন। সাম্যবাদী নন, সোভিয়েট সমর্থক নন, শিল্পী সাহিত্যিকের উপর নবজীবনের দাবীতে বিশ্বাসী নন। কথাটি মিথ্যা অবশ্যই। রলাঁপ্রতিভার বিচিত্র বলিষ্ঠ পরিণতি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশই রলাঁ রেখে যাননি। শিল্পীর নবজন্মে তার অজস্র নিদর্শন রয়েছে। "কার জন্য লিখি" প্রবন্ধে পাওয়া যাবে শিল্পীযোদ্ধার গণসংগ্রাম সমর্থনের আমরণ সংকল্প। ১৯১৪-১৯১৯ সনে যিনি ছিলেন "যুদ্ধের উর্ধ্বে" সেই রলাঁই হয়েছেন গণমুক্তির শেষযুদ্ধের নির্ভীক যোদ্ধা। মুসোলিনীর ফাশিস্টবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতি রলাঁর সতর্কবাণী, বারবুসের সহযোগিতায় ফাশিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা, জর্মানি ও স্পেনে শ্রেণীস্বার্থের পাশবিক প্রভুত্বের উচ্ছেদে রলাঁর দৃঢ়পণ, এই সবই রলাঁপ্রতিভার বিস্ময়কর পরিবর্তনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই সবেরই মূল প্রেরণা হচ্ছে, "আমি থামিব না", আমরা থামিব না যতদিন না ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে দৃঢ়ভিত্তির উপরে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ-কথা মোটেই সত্য নয় যে "রলাঁর লেখা থেকে কোন বিশেষ মতবাদের পোষকতা করার চেষ্টা আতসকাঁচের ভেতর দিয়ে সূর্য-কিরণকে বিকৃত করে আগুন ধরানোর সঙ্গে তুলনা করা চলে।" একটি বিশেষ মতবাদের পোষকতা রলাঁ করেছিলেন, এবং সেই মতবাদ হচ্ছে সাম্যবাদ, সাম্যবাদী কর্মাদর্শ। করেছিলেন বলেই ফর্স্টার কতকটা ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, রলাঁকে লোকে প্রায় ভুলে গেছে অর্থাৎ "ভদ্র লোক"দের আসরে রলাঁর জাতিচ্যুতি হয়েছে। রলাঁ বিশেষ মতবাদের সমর্থক শিল্পীযোদ্ধা যে। এই জন্যই "বিশুদ্ধ" সাহিত্যের আসরে রলাঁ হয়ত বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষের আত্মার সঙ্গে যিনি আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করেছেন আদর্শে ও কর্মে, এ-যুগের সেই শ্রেষ্ঠ শিল্পী-যোদ্ধাকে আমরা ভুলিনি। গণসংগ্রামের যোদ্ধারাও ভুলতে পারেনি।

আমাদের সাহিত্যিক-সমাজপতিরা বলেছেন, রলাঁর "জীবনের দর্শন,

আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিহিত আছে তাঁর "যুদ্ধের উর্ধ্বে" ও "মনের স্বাধীনতা" ঘোষণাটির মধ্যে। এঁরা ইচ্ছা করেই "আমি থামিব না" গ্রন্থে শিল্পী রলাঁর নবজন্মের নিদর্শন এড়িয়ে গেছেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আসরে আজ প্রতি-বিপ্লবী শক্তিগুলির সমাবেশ প্রবল, সমারোহেরও অভাব নাই। আমাদের অতিসাবধানী বুদ্ধিজীবীরা সম্ভবত এর কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত হচ্ছেন। সেইজন্যই হয়ত "আমি থামিব না" গ্রন্থে রলাঁর সাম্যবাদী, ফাশিস্ট-বিরোধী ও সোভিয়েট সমর্থকের ভূমিকা এঁদের মনোমত নয়। তা' হলে অবশ্য এঁদের মুখে রলাঁর "মনের স্বাধীনতা" ঘোষণাটির প্রশংসাও বেমানান। কারণ রলাঁর আদর্শ যে-মনের স্বাধীনতা তার মধ্যে জাতি-গৌরব বা কায়েমী স্বার্থের গোপন দাসত্বের স্থান নাই। এঁদের মত বনিয়াদী বুদ্ধিজীবীদের লক্ষ্য করেই রলাঁ বলেছেন, এঁরা "যুদ্ধের উর্ধ্বে" গ্রন্থের শিরোনামা ছাড়া আর কিছু পড়েননি। আর এঁরা স্বীকারই করেন না যে "গত ১৫বৎসর আমি যুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি।" এই সংগ্রাম ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে। এই সংগ্রাম সাম্যবাদী কর্মাদর্শের স্বপক্ষে, গণমুক্তির সংগ্রাম। ১৯৩৩ সনে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত সাম্যবাদীদের কাছে রলাঁ যে বাণী পাঠিয়েছিলেন সে-ও এই সংগ্রামের সমর্থনে। এই সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে ১৯২৭ সনে রলাঁ ঘোষণা করেছিলেন :

"য়ুরোপের সমস্ত স্বাধীন মানুষকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে রাশিয়া আজ বিপন্ন এবং সে যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তবে কেবল পৃথিবীর মজুরেরাই শিকলে বাঁধা পড়বে না—কি সামাজিক, কি ব্যক্তিগত সবরকমের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। জগত কয়েক যুগ পিছিয়ে যাবে।......রুশবিপ্লবের মতো এত শক্তিশালী ও এতখানি সম্ভাবনাময় সামাজিক আন্দোলন বর্তমান য়ুরোপে আর হয়নি। আসুন এর সাহায্যে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাই।"

রলাঁর এই আবেদন ব্যর্থ হয়নি। তার পরিচয় আমরা পেয়েছি দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধে। আজকের দিনেও তবু এই আবেদনের মূল্য কম নয়। ফাশিজম্-এর দৃঢ় দুর্গগুলি ভেঙ্গে পড়েছে বটে; রলাঁ যে ফাশিস্ট-বিরোধী অভিযান শুরু করেছিলেন জনগণের সহায়তায় তা' সার্থক হয়েছে। এই যুদ্ধে সাম্যবাদী সোভিয়েটের দুর্জয় প্রতিরোধক্ষমতা প্রমাণ করেছে রলাঁর জাগ্রত গণশক্তিতে বিশ্বাস। তবু এখনও শিল্পী-যোদ্ধাদের, মুক্তিকামী জনগণের বিশ্রামের অবকাশ নেই। রলাঁর "আমি থামিব না" মন্ত্র আজও জীবন্ত। কারণ ফাশিজম্-এর মূল এখনও ছড়িয়ে রয়েছে নানা শাখাপ্রশাখায় ধনতান্ত্রিক দেশগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দেশে দেশে চল্‌ছে প্রতি-বিপ্লবীশক্তির গোপন ষড়যন্ত্র। সোভিয়েটের সাফল্য এবং সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী জনগণের বিপ্লবী জাগরণ কায়েমী-স্বার্থবাদীদের সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। এরা থেমে নেই; এরা ছড়িয়ে দিচ্ছে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে, সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা, গণ-আন্দোলনকে আঘাত করতে এগিয়ে আসছে দক্ষিণে বামে। দক্ষিণপন্থী চার্চিল-কৃপালনি-পট্টভীরা চীৎকার শুরু করেছেন, শান্তি যায় যায়, সভ্যতা রসাতলে গেল সোভিয়েট এবং সাম্যবাদের ধাক্কায়। বামপন্থী কোয়েস্‌লার-মাসানি—এঁরা প্রগতির মুখোশ পরে প্রচার করছেন সাম্যবাদ ভাল হলেও হতে পারে বটে, কিন্তু সাম্যবাদীরা ভাল নয়, সোভিয়েটের সাম্যবাদী প্রচেষ্টা ভাল নয়। দুনিয়া জোড়া প্রতিক্রিয়াচক্রের এই হ'ল বাম ও দক্ষিণ শ্রমবিভাগ, দক্ষিণী দমননীতি ও কুৎসা আর বামপন্থী বুদ্ধিবিকার ও কপটাচার। দুয়েরই লক্ষ্য এক—গণমুক্তির গতিরোধে প্রতি-বিপ্লবী ইউনাইটেড ফ্রন্ট। সেই জন্যই শিল্পীর নবজন্মের কাহিনীতে আজও ফিরে যেতে হয় বার বার। কী উদার মানবতাবোধ, কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে রলাঁ এইসব পোশাকী বাম ও পেশাদার দক্ষিণের ষড়যন্ত্র ও ছলাকলার মোহমুক্ত হয়ে এগিয়ে গিয়েছেন সোভিয়েট এবং সাম্যবাদের সমর্থনে। কুণ্ঠাহীন আত্মসমালোচনার সুরে রলাঁ বলেছেন:

"আজ আমাদের চোখের আচ্ছাদন খুলে গিয়েছে। যে স্বাধীন শক্তিগুলির মুক্তির জন্য আমরা অন্ধের মত এতকাল ঘুরে বেড়িয়েছি, এক সমাজ-

তান্ত্রিক সমাজে আজ তার সুস্থ ও সম্পূর্ণ বিকাশ শুরু হয়েছে।" "যে অহংকার নিজেকে চেনে, চেনে না নিজের দীনতাকে, সেই অহংকার বুর্জোয়া সমাজের বুদ্ধিজীবীদের মনে।...লেখক হিসাবে আমাদের কর্তব্য এই অস্পষ্টতার অবসান ঘটানো; মার্কসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে "অবাস্তব মনুষ্যত্ব" থেকে মানুষকে মুক্ত করে আনা, মানবতার সঙ্গে সাম্যবাদের স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত মিলন ঘটানো।"

এই কর্তব্যের দাবীতেই রলাঁর "আমি থামিব না" অঙ্গীকার, শিল্পীর নবজন্মের সূচনা এইখানে। যুদ্ধ ও বিপ্লবের ইঙ্গিত জাঁ ক্রিস্তফকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল; সে পালিয়েছিল "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে।" ক্রিস্তফের স্রষ্টা শিল্পীযোদ্ধা রলাঁ কিন্তু থামেননি, এগিয়ে চলেছেন। তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত কবির বাণীই সত্য হয়েছে

"ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে।
আলোক যেথা নিভিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে।"
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে।

বুদ্ধিজীবীর কৌলীন্য তিনি বিসর্জন দিয়েছেন সভ্যতার সঙ্কট মুহূর্তে; এউজেন রেলজিসের চিঠিতে তাই রলাঁ ঘোষণা করেছেন, "যে-সংগ্রাম আজ নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করছে তার মহান যোদ্ধা হওয়ার চাইতে বুদ্ধিজীবীর আর বড় কোনো কাজ নাই।" বারবুসের সঙ্গে তিনিই প্রথম আবেদন করেছেন "বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের সংযুক্ত ফ্রন্ট" গঠনের জন্য।

১৯১৯ সনের "মনের স্বাধীনতা" ঘোষণাটি থেকে ১৯৩৩এর "কার জন্য লিখি" পর্যন্ত এই গ্রন্থের প্রবন্ধ সমষ্টির মধ্যে পাঠকেরা সহজেই একটা সাধারণ ঐক্যের সন্ধান পাবেন। এই ঐক্যের মূলে আছে রলাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর অকুণ্ঠ উদারতা, তাঁর আদর্শের সর্বজনীনতা। রলাঁ কোনো দেশ-বিশেষের বা জাতি-বিশেষের উন্নতি-অবনতির সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হননি। সারা পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁর ভাবনার বিষয় ছিল। এই জন্যই তাঁর "মনের

স্বাধীনতা” ঘোষণাটি সকলদেশের মানবতাবাদী শিল্পীসাহিত্যিকদের সমর্থন পেয়েছিল। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও আনন্দকুমারস্বামী এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। ফাশিজমের বিরুদ্ধে রলাঁর আমরণ যুদ্ধ সংকল্পও একই কারণে সারা পৃথিবীর প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা ও সমর্থন পেয়েছিল। এক কথায় রলাঁ সকলদেশের তাঁর সমগোত্রীয় বুদ্ধিজীবীদের বারবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দুর্গতি। আর তারই সঙ্গে এনেছেন সাম্যবাদী সমাজে মানব-মুক্তির আশ্বাস। শিল্পীর নবজন্ম গ্রন্থের প্রত্যেকটি প্রবন্ধ এই কারণে এখনও মূল্যবান।

যুদ্ধ ও শান্তি, ফাশিজম্ ও কমিউনিজম, চিন্তার স্বাধীনতা কার ও কতখানি, বুদ্ধিজীবীর সামাজিক দায়িত্ব, দুনিয়াজোড়া গণবিপ্লবের প্রস্তুতি,—এমনতর অসংখ্য বিষয়ের আলোচনায় শিল্পীর নবজন্ম এই যুগের একখানি মূল্যবান ইতিহাস। এই ইতিহাসের শেষ পরিচ্ছেদ এখনও লেখা বাকী আছে। ঠিক সেই কারণেই যে মানবসত্যের অনুশীলন করে গেছেন রলাঁ, তার আবেদন আজও নষ্ট হয়নি। “আমি থামিব না” এই অঙ্গীকার আজও ধ্বনিত হচ্ছে শিল্পী-যোদ্ধাদের, গণবিপ্লবের অগ্রপথিকদের কণ্ঠে।

সরোজ আচার্য

চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী

হে মানসক্ষেত্রের শ্রমিকগণ, সমস্ত পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত হে সমধর্মী সহকর্মিগণ, যুদ্ধরত জাতিগুলির বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদনীতির ফলে গত পাঁচ বৎসর সেনাবাহিনীর দ্বারা তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছ। আজ যখন সীমান্তপ্রাচীর আবার ধ্বসিয়া পড়িয়াছে তখন পুনরায় ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপনের জন্য এই আবেদন তোমাদের কাছে পাঠাইতেছি। যে নূতন বন্ধন আজ আমরা বরণ করিব তাহা পূর্বের বন্ধনের চেয়ে আরও দৃঢ়, আরও শক্ত হইবে।

যুদ্ধ আমাদের বিশৃঙ্খলার গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছে। বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই তাহাদের বিজ্ঞান, শিল্প ও মনকে রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োগ করিয়াছে। আমরা কাহাকেও অপরাধী করিতে চাহি না। বিচ্ছিন্ন একক মানুষের মানসিক দুর্বলতা আমরা জানি, বিপুল সমষ্টিগত শক্তির সমষ্টিগত ঘটনাপ্রবাহের আদিম শক্তিকেও আমরা চিনি; শেষটি আগেরটিকে এক মুহূর্তে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল; কারণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইবার মত বিপদের ইঙ্গিত সে পায় নাই। এই অভিজ্ঞতা যেন ভবিষ্যতে আমাদের কাজে লাগে।

যে শৃঙ্খলমুক্ত শক্তিনিচয়ের পায়ে স্বেচ্ছায় সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়া আমরা উহাদের ক্রীতদাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিলাম, তাহা যে আমাদের জীবনে কি সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটাইয়াছে তাহা সর্বপ্রথমে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। ঘৃণার যে অসংখ্য বিষাক্ত বীজাণু

চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী

আজ ইউরোপের সর্বদেহ জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে তাহার জন্ম ও বৃদ্ধিলাভের দায়িত্ব আর্টিস্ট ও মনস্বীদেরও কম নহে; জ্ঞান ও কল্পনার অস্ত্রাগার হইতে তাহারা পুরাতন ও নূতন, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক, যৌক্তিক ও কাব্যিক সর্বপ্রকারের যুক্তি বাছিয়া লইয়া এই ঘৃণার যুদ্ধে আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছেন; মানুষের সহিত মানুষের অন্তরের মিলন ধ্বংস করিতে তাহারাও কম করেন নাই। যে চিন্তার প্রতিনিধিত্বের দাবী তাহারা করেন সেই চিন্তার মহিমাকে তাহারা কলুষিত করিয়াছেন; মনস্বিতাকে তাহারা উত্তেজনার উপকরণ হিসাবে বিশেষ কোনো কোনো গোষ্ঠী, রাষ্ট্র, দেশ ও শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছেন। আজ এই বর্বর হানাহানির মধ্য হইতে বিজয়ী বা পরাজিত প্রত্যেক জাতি বিক্ষত, বিনষ্ট এবং (মুখে স্বীকার না করিলেও) মনে মনে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে জড়িত হইয়া মনস্বিতার মহিমাও খণ্ডিত হইয়াছে।

এই আপোস, এই অপমানকর মৈত্রী, এই গোপন দাসত্ব হইতে মনকে মুক্ত করিতে হইবে। চিন্তা কাহারও ক্রীতদাস নহে; আমরাই চিন্তার ক্রীতদাস। আমাদের অন্য কোনো প্রভু নাই, চিন্তাকে উঁচু করিয়া রাখিবার জন্য, তাহার আলোককে চিরদিন প্রোজ্জ্বল রাখিবার জন্য, পথভ্রমে যাহারা দূরে সরিয়া গিয়াছে তাহাদের একত্রিত করিবার জন্য আমাদের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্ধকারে অন্ধ বাসনা কামনার ঝড়ের মধ্য দিয়া একটি স্থির বিন্দুতে, একটি ধ্রুব তারকায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আমাদের চলিতে হইবে। দম্ভ ও হানাহানি ইহাদের মধ্যে কোনোটাই আমরা গ্রহণ করিব না, দুটিকেই বর্জন করিয়া চলিব, একমাত্র সত্যকেই আমরা মানিব; মানিব সেই সত্যকে যে-সত্যের পায়ে কোনো শৃঙ্খল নাই, যে-সত্যের পূর্ণতাকে ভৌগলিক সীমান্তপ্রাচীর দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে না, যে-

চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী

সত্যের বিস্তৃতির শেষ নাই, জাতি ও বর্ণের সংকীর্ণতা যে-সত্যকে স্পর্শ করিতে সাহস করে না। মানুষের নিয়তি ও জীবনযাত্রায় আমাদের যে কৌনো কৌতূহল নাই তাহা নহে, আমাদের সমস্ত পরিশ্রম তো সেই মানুষের জন্যই। কিন্তু এ-মানবতা পূর্ণ মানবতা, খণ্ড মানবতা নহে। বহু জাতিকে আমরা স্বীকার করি না; আমাদের কাছে জাতি এক, সে-জাতি অনন্য ও বিশ্বব্যাপী, সে-জাতির মানুষ দুঃখ ভোগ করে, লড়াই করে, বারম্বার পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, রক্তসিক্ত কঠিন পথে অশ্রান্ত চরণে আগাইয়া চলে। এ-জাতি সমস্ত মানুষের এক জাতি। এ-জাতির প্রত্যেকটি মানুষ আমাদের ভাই। তাহারাও যাহাতে আমাদের মত এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সম্পর্কে সচেতন হইতে পারে সেইজন্য তাহাদের অন্ধ আত্মকলহের শীর্ষদেশে মৈত্রীর এই তোরণ আমরা স্থাপন করিতেছি। এ-তোরণ এক বহুবিচিত্র চিরন্তন মুক্ত মনের মহাতোরণ!

ভিলে নেভে
আর. আর

১৯১৯ সালের বসন্তকাল।

[এই ঘোষণাবাণীর স্বাক্ষরকারিগণ সম্পর্কে দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। অনুবাদক।]

বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর ঐক্যের আবেদন

এই যুদ্ধের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের ও শ্রমজীবী-জগতের মধ্যকার বিচ্ছেদ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং যতই দিন যাইতেছে এ-বিচ্ছেদ ততই গভীর ও ব্যাপক হইতেছে। এ-যুদ্ধের সাংঘাতিক কুফলের ইহা অন্যতম এবং ভবিষ্যতের পক্ষে সবচেয়ে বিপদজনক। প্রত্যেক দেশেই এই পবিত্র ঐক্য লইয়া বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এই ঐক্য প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্ট নিজ স্বার্থে সমর্থন ও পোষণ করেন, কিন্তু যাহারা দেশে দেশে এই ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন তাহাদের আন্তর্জাতিক ঐক্যকে বিসর্জন দিয়া এই ঐক্যকে রক্ষা করা হয়। ঐক্যের এই আন্তর্জাতিক আকাঙ্ক্ষাকে দলন করিতে বুদ্ধিজীবীরা যাহা করিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। গবেষণামন্দির, বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্যিক-সমিতিগুলি অবিশ্রান্তভাবে যে জাতীয় বিদ্বেষ ও দম্ভের ইস্তাহারগুলি প্রচার করিয়াছে সে-কথা স্মরণ করিয়া আজ আর লাভ নাই। বুদ্ধিজীবীদের মত, জাতীয়তাবাদের এত বড় উৎসাহী সমর্থক যে আর নাই তাহা আজ অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

জার্মানির মত যে-সকল দেশে বিপ্লব হইয়াছে সেইসব দেশে প্রায়ই ছাত্র-প্রতিষ্ঠানগুলি হইতেই হোয়াইট-গার্ডস্-এর সৃষ্টি হয়। ইহাও দেখা গেল নূতন ভাবাদর্শকে দলনের জন্য বিপ্লব-বিরোধীরা এই সৈন্যদের ব্যবহার করিয়াছে। পারির পলিটেকনিকস্ ও বড় বড় কলেজগুলির ছাত্রগণ ১৮৩০ সালে একটা জাগ্রত জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ব্যারিকেডে দাঁড়াইয়া, যে-টুকু করিয়াছিল তাহা যেন আজ কতদূর অতীতের কথা বলিয়া মনে হয়।

আজিকার বুদ্ধিজীবিগণ যেন মধ্যশ্রেণীর সাথে আপনাদের একাত্ম করিয়া ফেলিয়াছে, মধ্যশ্রেণীর সমস্ত সংকীর্ণ কুসংস্কারগুলিকেই, সমস্ত রক্ষণশীলতাকেই তাহারা যেন গ্রহণ করিয়াছে; যে-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে তাহাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে তাহার ভয়েই তাহারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পায়ে আত্মসমর্পণ করিতেছে।

ফলে সাধারণ মানুষের চোখে ইহাদের স্বরূপ প্রকট হইয়া উঠিতেছে; অথচ ইহাদের অনেকেই সাধারণ মানুষেরই আত্মজ; অতএব সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক পরিচালক ও উপদেষ্টা হওয়াই তাহাদের উচিত। বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে জনসাধারণের এই মোহমুক্তি ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইতেছে। তাই দেখিতে পাই রাশিয়ায় কিছুকাল বুদ্ধিজীবীদের নিষ্ঠুর দমন চলিল; বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় আজ হয়তো সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ভিতরে আজও সন্দেহের আগুন জ্বলিতেছে। তীব্রতায় কিছু কম হইলেও ঐ একই লক্ষণ দেখা যাইতেছে জার্মানি, ফ্রান্স ও ইটালিতে; মাঝে মাঝে ভাষার যে-তিক্ততা প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহাতেই বোঝা যায় বিষ কত গভীরে প্রবেশ করিয়াছে।

'বুদ্ধিজীবীরা ধ্বংস হৌক'—এই রণধ্বনিকে কেন্দ্র করিয়াই যেন বুদ্ধিমান অথচ অতীত অভিজ্ঞতায় তিক্ত ও ক্রুদ্ধ কতকগুলি শ্রমিককেন্দ্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। মসীজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যকার এই বিচ্ছেদের মত মর্মান্তিক ঘটনা পৃথিবীতে আর কি হইতে পারে! ইহার ফলে মসীজীবিগণ নতুন জীবনের উৎসের সহিত সর্বপ্রকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, গ্রন্থাগারের ধুলিধূসরিত কোনো প্রাচীন প্রতীকের মত অস্তিত্বই বহণ করিবে মাত্র; অথবা ইহার চেয়েও বড় বিপদ আসিবে ইহাদের জীবনে— শোষক-শ্রেণীর হাতে গণনির্যাতনের উপকরণ হইয়া দাঁড়াইবে ইহারা। আর বুদ্ধিজীবীদের হাতের জ্ঞানের মশাল নিবিয়া গেলে, শ্রমজীবীদের অভিযাত্রায়

আসিবে বিশৃঙ্খলা ; তাহারা শুধু ধ্বংসের স্তূপই নির্মাণ করিবে, তাহাদের দ্বারা কোনো স্থায়ী নির্মাণকার্য সম্ভব হইবে না।

উভয় শ্রেণীর মধ্যকার এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে আমাদের দূর করিতে হইবে। বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী উভয় শ্রেণীর মধ্যেই আমাদের চেতনা আনিতে হইবে। এই কার্যের অধিকার আমাদের আছে। আমরা সংখ্যায় অল্প হইতে পারি কিন্তু সমস্ত দেশের এমন কয়েকজন চিন্তাজীবী লইয়া আমরা গঠিত যাহারা অত্যাচারের চারিটি বৎসর আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে অটল বিশ্বাসে ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ আর শুধু এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। কর্মক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করিবার জন্য আমাদের সম্মিলিত হইতে হইবে। অতীতের স্বেচ্ছাচারের দুর্গের উপর আঘাত হানিবার জন্য একই আবেগে সম্মিলিত সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সহিত আমাদের যোগ দিতে হইবে। অতীতপন্থী শক্তিনিচয়ের যে বিশাল প্রাচীর মানুষের স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ করিতেছে তাহাও ভাবাদর্শ ও স্বার্থ দিয়া গঠিত। স্বার্থকে তাহারা প্রকাশ করিতে চাহে না, কিন্তু ভাবাদর্শকে তাহারা মহিমামণ্ডিত করিয়া দেখাইতেছে ; স্বার্থের প্রকাশের চেয়ে এই ভাবাদর্শের প্রচারই বিপদ্‌জনক বেশি। আদর্শবাদের আচ্ছাদনে লোভ ও হিংসা আত্মগোপন করিয়া আছে।

এই সংগ্রামে আমাদের একটি বিশেষ স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। এই মৃত্যুময় ভাবাদর্শগুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে আমাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এই রক্তলিপ্সু জাতীয়তাবাদে ও ঈর্ষাকাতর স্বদেশপ্রেমে হয়তো প্রথম অভ্যুদয়ের সময় পূর্ণতার সুষমা ও আদর্শের মহিমা ছিল। কিন্তু ব্যর্থ ত্যাগ, নিষ্ফল আত্মহনন, ব্যাপক ধ্বংস ও বিপুল আহুতি ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি করিবার শক্তি ইহাদের নাই। অথচ এই ধ্বংসের মধ্যে নূতন সৃষ্টির একটি বীজেরও সন্ধান মেলে না ; এই ধ্বংসের ফলে পৃথিবী বহুশতাব্দী ধরিয়া শুধু শ্মশান

ভস্মেই পরিণত হইয়া থাকিবে। এই জাতিপ্রেম ও দেশপ্রেমের মুখোশ খসাইয়া ফেলাই আমাদের কাজ। অতীতের দেবতাদের নির্বাসিত করিয়া সেখানে আমরা সত্য ও জীবনের নূতন নিশ্বাসবায়ু প্রবাহিত করাইতে চাহি। কি নৈতিক কি বাস্তবিক সর্বপ্রকারের বিচ্ছেদ-সীমান্তের শৃঙ্খল হইতে, মৃত অতীতের সর্বপ্রকার প্রগতি-বিরোধী প্রাণহানিকর কুসংস্কার হইতে মানুষকে আমাদের মুক্ত করিতে হইবে।

আজ শ্রমিকশ্রেণী পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, সমবায়-সমিতি, ইউনিয়ন ও সোভিয়েটগুলির মধ্য দিয়া বিপুল নির্মাণকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। পণ্যোৎপাদনের হার যথাসম্ভব বেশি করিয়া, কল্যাণ ও বাস্তব সম্পদের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া শ্রমিক শ্রেণী সমগ্র মানবসমাজের জীবনযাত্রাকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিতেছে। মানসক্ষেত্রের শ্রমিকগণ, আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না; আমাদেরও কাজ রহিয়াছে। জাতি, বর্ণ, জাতীয়তাবাদ ও কুসংস্কারের নিগড় হইতে মানুষের মনকে মুক্ত করিবার দায়িত্ব আমাদেরই। বুক ভরিয়া টানিবার মত নিখিলপৃথিবীর মুক্ত বাতাসে শ্রমজীবিগণকে পরিপ্লাবিত করাই আজ আমাদের কাজ। একমাত্র এই বাতাসে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণেই তাহার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকিতে পারে, ঐতিহাসিক দায়িত্ব বহনের শক্তি অটুট থাকিতে পারে। কাহাকেও দেশের মাটি হইতে ছিনাইয়া লওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বিক্ষত না হইয়া নিজের স্মৃতি ও জাতীয় বন্ধন হইতে নিজেকে ছিন্ন করা লেখক ও শিল্পীর পক্ষেই সবচেয়ে কঠিন।

সাধারণ কর্মধারা পরিপুষ্ট করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও রূপের আবিষ্কার ও প্রচারের দায়িত্ব বৈজ্ঞানিকের ও চিন্তাজীবীর। গাছের শিকড় মাটির গভীরে থাকে বটে, কিন্তু শুধু মাটিই গাছের প্রাণ যোগায় না, উপরের আলো ও বাতাস হইতেও গাছ প্রাণ আহরণ করে। তাই নিখিলবিশ্বের

চিন্তাধারার বিশাল সমুদ্রে মানববনস্পতিকে স্নান করিতে হইবে। আজ, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের মধ্যে এক অর্থহীন, অকল্যাণকর সংঘর্ষের ফলে সমাজের সৃজনীশক্তি ও উৎপাদনশক্তির মধ্যেও সংঘর্ষ চলিয়াছে। বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের মধ্যে যাহারা মুক্ততর, যোগ্যতর, আনন্দোদ্বেল এক নূতন পৃথিবীর সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেন তাহাদের আজ মিলিত হইতে হইবে এবং প্রত্যাশা করিতে হইবে এমন এক ব্যবস্থার যেখানে সৃজন ও পণ্যোৎপাদনের মধ্যকার বর্তমান বিরোধ সহযোগিতায় পরিণত হইয়াছে। বিশ্বের প্রগতি আজ আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা যেন নিরাশায় ভাঙ্গিয়া না পড়ি, কর্মে আমাদের যেন শ্রান্তি না আসে। শ্রমিকেরা যে-পথ গড়িতেছে বুদ্ধিজীবীদের তাহা আলোকিত করিতে হইবে। তাহারা দুইটি বিভিন্ন মজুরের দল। কিন্তু কাজের লক্ষ এক।

বার্লিনে রক্তাক্ত জানুয়ারী

৪ঠা জানুয়ারী, ১৯১৯

লাইবনেক্‌ট্ ও রোজা লুক্‌সেমবুর্গ-এর হত্যায় জনসাধারণ স্তম্ভিত হইয়া যায়। আরও স্তম্ভিত হয় তাহারা এই হত্যার জঘন্য হিংস্রতা দেখিয়া। একটি সংজ্ঞাহীন স্ত্রীলোকের মুমূর্ষু দেহ যে পাশবিক উল্লাসে একপাল শৃগাল টানিয়া লইয়া গেল—কিভাবে কোথায় তাহাকে কলুষিত করিতে জানি না—তাহা দেখিয়া সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত হইলেও ফরাসী সংবাদপত্রগুলিতে তেমন কোনো সাড়া জাগে নাই। এই জানুয়ারীর দিনগুলির মর্মান্তিক তাৎপর্য যেন ফ্রান্সের সংবাদপত্র-জগৎ ভালো বুঝিতে পারে নাই, বুঝিতে পারে নাই এই ঘটনাগুলি শুধু জার্মান বিপ্লবের পক্ষে নহে, সমগ্র পৃথিবীর শান্তির পক্ষে, কতবড় সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। মিত্ররাষ্ট্রগুলির শাসকশ্রেণী ও তাহাদের বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি অদ্ভুত এক দৃষ্টিহীনতার পরিচয় দিতেছে। এই দৃষ্টিহীনতা সত্যই এতদূর গিয়াছে যে সন্দেহ হয় ইহা অনিচ্ছাকৃত নহে। ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারলাভ ও বাস্তবক্ষেত্রে তাহার আসন্ন প্রয়োগের সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহারা স্পার্টাসিস্টদিগের পরাজয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে; অথচ এই পরাজয়ে মিত্রশক্তিবর্গের যে কত বড় রাজনৈতিক বিপদ সূচিত হইতেছে সে সম্পর্কে তাহারা উদাসীন। ধনতান্ত্রিক স্বার্থরক্ষায় তাহারা এতদূর অন্যমনা হইয়া পড়িয়াছে যে নিজেদের জাতিসম্পর্কে এই জাতীয়তাবাদীদের কোনো উদ্বেগের অবকাশ নাই।

গত দুইমাসের ঘটনাবলী মনোযোগের সহিত লক্ষ করিয়া আজ স্পষ্ট বুঝিতেছি প্রাচীনপন্থী, সমরলিপ্সু ও রাজতন্ত্রীদের প্রতিক্রিয়াশীল অভিযান জার্মানিতে দানবীয় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, আর ইহার সাথে

একটা জাতীয়তাবাদী বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার উন্মাদনা জড়ের মত সমগ্র জাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। মিত্ররাষ্ট্রগুলির প্রতি আজ আমি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে চাই :– "তোমরা তোমাদের কদর্য, স্ববিরোধী, একাধারে দৃঢ় ও দুর্বল নীতির দ্বারা এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছ। একদিকে যেমন তোমরা জাতীয় দম্ভের পাশবিক প্ররোচনা যোগাইয়াছ, অন্যদিকে তেমনি জার্মানির কতিপয় শাসক সম্পর্কে দেখাইয়াছ অবিশ্বাস্য ঔদাসীন্য।

"তোমরাই তো একদিন কাইজার ও যুবরাজের শাস্তি দাবী করিয়াছ। সেই তোমরাই আজ কেমন করিয়া এর্ৎস্‌বের্গে-এর সহিত আপোস আলোচনা চালাইতেছ। এই এর্ৎস্‌বের্গেরই তো একদিন লিখিয়াছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে একটি জার্মান নাগরিকের রক্তপাত হইতে দেওয়ার চেয়ে সমগ্র লণ্ডন ধ্বংস করা অনেক বেশি মানবিক।······আমাদের একখানি জাহাজ ডুবিলে আমরা একটি ইংরেজ নগর ধ্বংস করিব।······যুদ্ধের সময় ভাবালুতা এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা যাহা সামাজিক অপরাধের সমান।" সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমর্থক ও অন্যতম প্রয়োগকর্তা শাইডেমানদের জয়লাভ তোমরা কেমন করিয়া সমর্থন কর বুঝি না; কেমন করিয়া সমর্থন কর তোমরা সেই এবার্টদের ও নোসকদের যাহারা লুডেনডর্ফের অদৃশ্য অথচ চিরবিরাজমান জেনারেল স্টাফ্ হইতে আজও প্রেরণা আহরণ করিতেছে। স্পার্টাসিস্টদের ধ্বংস করিতে কেমন করিয়া তোমরা মনার্কিস্টদের সাহায্য আহ্বান করিতেছ। অথচ এই স্পার্টাসিস্টরাই তো শান্তির জন্য জাতিতে জাতিতে মিলন স্থাপনের জন্য, যুদ্ধের শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল। হে ইউরোপের বুর্জোয়া গভর্ণমেন্টগণ! দেশের স্বার্থ অপেক্ষা শ্রেণীর স্বার্থ তোমাদের কাছে বড় (মানবতার স্বার্থের কথা ছড়িয়াই দিলাম, উহার সহিত তোমাদের যে কোনো সম্পর্ক নাই তাহা তো সকলেই জানে)।

ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেছি। উইলিয়াম হার্জগ-এর পত্রিকা দী রেপুবলিক হইতে মোটামুটি এই তথ্য আমি সংগ্রহ করিয়াছি। সেই

রক্তাক্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও একটা অনাসক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি ইনি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমি এই রচনা লিখিতে বসিয়াছি তাহাও সেই দৃষ্টিভঙ্গী। এ-দৃষ্টিভঙ্গী এমন এক মুক্তচেতা বুদ্ধিজীবীর— যাহার জীবনে সত্যের অনুসন্ধানই সবচেয়ে বড় আসক্তি। শ্রমিকশ্রেণীর মিলনের প্রতি তাহার সহানুভূতি রহিয়াছে। দলগত সংকীর্ণতা ও নেতাদের বিদ্বেষ এই সহানুভূতিকে কলুষিত করিতে পারে নাই। কিন্তু উভয় শিবিরের হিংসাত্মক কার্যকে নিন্দা করিলেও তাহার মধ্যে যে সামাজিক সুবিচারের আগ্রহ রহিয়াছে তাহার ফলেই তিনি নির্যাতিত স্পার্টাসিস্টদের সমর্থনে সাহসের সহিত আগাইয়া আসিয়াছেন। কারণ, স্পার্টাসিস্টদের মধ্যেই তিনি, সবচেয়ে আদর্শনিষ্ঠ, সবচেয়ে নিঃস্বার্থ, জনস্বার্থের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য যোদ্ধাদের দেখিতে পাইয়াছেন।

৬ই হইতে ১৭ই জানুয়ারীর মধ্যে যে নাটকের অভিনয় হইয়া গেল, ৬ই, ২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বরের রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্যেই ছিল তাহার প্রস্তাবনা। এই সংঘর্ষগুলির ফলে অধিকাংশ সোশালিস্টই বিপ্লব হইতে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সোশালিস্টরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন অধিকাংশ স্পার্টাসিস্টদের নিকট হইতে। (পূর্বোক্তরা স্পার্টাসিস্টদের হিংসাত্মক কার্যাদির জন্য সমালোচনা করিত)। কেন্দ্রীয় পরিষদ হইতে যখন তাহারা ২৮শে ডিসেম্বর প্রতিবাদ স্বরূপ বাহির হইয়া আসিলেন তখন সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের মধ্যকার প্রতিক্রিয়াশীলদের বাধা দিবার কেহ থাকিল না। তাহারা তৎক্ষণাত কিল-এর শাসনকর্তা "শক্ত" মানুষ নোসককে আমন্ত্রণ করিলেন। ইনি পরে সেই কুখ্যাত জানুয়ারী দিনগুলির রক্তাক্ত নাটকের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন।

২রা জানুয়ারী কর্নেল রাইন্‌হার্ট প্রুশিয়ার সমরসচিব পদে নিযুক্ত হন। বিপ্লবী ভাবাদর্শের প্রতি ইহার কোনোই সহানুভূতি ছিল না।

স্টে্রাবেল, কাউণ্ট আর্কো, আডল্‌ফ্‌ হফ্‌মান্‌, কুর্ট রোজেনফেল্ড, ব্রাইট্‌চাইড্‌, পাউল্‌ হফমান্‌, হকার ও সিমন—প্রুশিয়ার গভর্ণমেণ্টে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদের এই কয়জন তখনও ছিলেন, ইহারা এইবার একযোগে পদত্যাগ করিলেন। ৩রা জানুয়ারী তারিখের এক ঘোষণাবাণীতে তাহারা জানাইলেন যে, একটা মিটমাটের জন্য তাহারা সর্বোপায়ে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের নিকট দাবী করা হইয়াছিল যে, কর্নেল রাইনহার্ট-এর নিয়োগপত্রে পরীক্ষা না করিয়াই তাহাদিগকে স্বাক্ষর দিতে হইবে। কর্মসূচী সম্পর্কে রাইনহার্ট-এর লিখিত বিবৃতিও তাহাদের জানিতে দেওয়া হয় নাই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সমিতির নীরবতা কিছুতেই ভঙ্গ করা যায় নাই। এইভাবে তাহাদের সহযোগিতাকে একেবারেই মূল্যহীন করিয়া ফেলা হইয়াছে।

বিপ্লব-বিরোধী সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে ইতিমধ্যেই বহুস্থানে রক্তাক্ত সংঘর্ষ তখন শুরু হইয়া গিয়াছিল। ৩০শে ডিসেম্বর উলস্টাইন-এ রণাঙ্গণ প্রত্যাগত গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যগণের সহিত গণসমিতির সংঘর্ষ হইল; গণসমিতিগুলি ঐ সৈন্যদেরই সম্বর্ধনা করিতে গিয়াছিল লাল পতাকা লইয়া। ৪ঠা জানুয়ারী কনিগস্‌হুটেতে সৈন্যগণ মজুরদের উপর গুলি চালাইল। পূর্বসীমান্ত রক্ষার অজুহাতে এই বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলন শুরু হইল। প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারকের দল পূর্বোক্ত জেলাগুলিতে গিয়া আস্তানা গাড়িল। ৪ঠা জানুয়ারী বার্লিনেই বিপ্লব-বিরোধীদের এক সম্মেলন হইয়া গেল। এই সম্মেলনে কাউণ্ট ভেস্ট্রাপ, ক্যাপ্টেন নের্গের ও অন্যান্য বহু অঁফিসার যোগ দিলেন। এবং সেখান হইতে তাহারা সম্রাটের নিকট আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়া একটি তার প্রেরণ করিলেন।

অবশেষে ৫ই জানুয়ারী দেশরক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী পুলিশ প্রেসিডেণ্ট আইকহর্নকে সরাইয়া তাহার স্থলে রাশিয়ার পুলিশ বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী আর্নস্টকে বসাইলেন; কারণ, আইকহর্নের বিপ্লবী মনোভাবের কথা সকলেই

জানিত। এই ঘটনাই চূড়ান্ত হইল, স্পষ্ট বোঝা গেল গভর্নমেণ্ট সমস্ত প্রতিবন্ধকতা নিঃশেষে নির্মূল করিতে বদ্ধপরিকর এবং রক্ষণশীল দলগুলির সাহায্যে ক্ষমতার একমাত্র অধীশ্বর হইতে সংকল্পবদ্ধ।

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টগণ, স্পার্টাসিস্টগণ এবং বার্লিনের বৃহৎশিল্পের মজুর প্রতিষ্ঠান-গুলি গণবিক্ষোভের এক আবেদন ঘোষণা করিয়া তৎক্ষণাত এই প্ররোচনার জবাব দিল। স্পার্টাসিস্ট নেতা লাইবনেক্‌ট্‌ ও রোজা লুক্‌সেমবুর্গ এই বিক্ষোভকে আঘাত হিসাবে ব্যবহার করিলেন। ৫ই তারিখের সন্ধ্যাবেলায় ফরভায়ের্ট্‌স্‌, ভোল্‌ফ্‌ অফিস এজেন্সির সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস এবং রাইক্‌স্‌-বাঙ্ক স্পার্টাসিস্টরা দখল করিয়া লইল। তাহারা যে হঠাৎ কেন এই হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন করিল জানা যায় না, কারণ তাহাদের ডিসেম্বরের ইস্তাহারেও তাহারা ঘোষণা করিয়াছিল যে, শ্রমিক সাধারণের সুস্পষ্ট ইচ্ছার পূর্ণ অভিব্যক্তি না হইলে তাহারা কিছুতেই বলপ্রয়োগ করিবে না।

লাইবনেক্‌ট্‌ ও রোজা লুক্‌সেমবুর্গ নিশ্চয়ই একটা আকস্মিক উত্তেজনায় এই নির্দেশ দিয়াছিলেন। যে ক্রোধ এতদিন ধরিয়া তাহাদের মধ্যে জমা হইতেছিল এবং যুদ্ধের সাড়ে চার বৎসরের উত্তরাধিকাররূপে যে-মিথ্যার মহামারী বুর্জোয়া সংবাদপত্র-জগতকে আবিষ্ট করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে আক্রোশই হয়তো তাহাদের এই ধৈর্যচ্যুতির মূলে ছিল। মিথ্যার এই বেসাতি বিপ্লবের পরে যতখানি নির্লজ্জ আকার ধারণ করিয়াছিল পূর্বে তাহা আর কোনোদিন হয় নাই। যে কারণেই হোক এই সাংঘাতিক নির্দেশ একবার দেওয়া হইয়া গিয়াছে, গৃহযুদ্ধ শুরু হইয়া গেল।

শুরু হইবামাত্রই ভাষা ও উত্তেজনার সমস্ত সংযম ভাঙ্গিয়া উহা হিংস্রতার চরমে উঠিয়া গেল। সীগেসালেতে ৬ই তারিখে জনতাকে লক্ষ করিয়া লাইবনেক্‌ট্‌ বলিলেন:

"আঘাত হানিবার মুহূর্ত উপস্থিত। সমাজতান্ত্রিক রিপাব্‌লিক আজ

আর মিথ্যা কথা নহে, উহা বাস্তব সত্যে পরিণত। আজ যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হইল তাহা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখার মতো জ্বলিতে থাকিবে। এবার্ট-শাইডেমান-এর গভর্ণমেন্টকে জনগণ যেন তীব্র ঘৃণার চোখে দেখে।"

ইম্পিরিয়াল চ্যান্সেলারীর বাতায়ন হইতে অনুচরবর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া শাইডেমান ঘোষণা করিলেন:

"আজ বার্লিনে যে জঘন্য অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসান ঘটাইতে হইবে। গভর্ণমেন্ট কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, এখন আর কিছু বলা হইবে না। শুধু এই প্রতিশ্রুতি আপনাদের দিতে পারি যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতে গভর্ণমেন্ট কার্পণ্য করিবে না। এই সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিতে হইবে, সাহায্যার্থ গভর্ণমেন্ট সেনাবাহিনীকে আহ্বান করিবে। জনগণের হাতে আমরা অস্ত্র তুলিয়া দিব। এবং সে অস্ত্র কাঠের অস্ত্র নহে।" ইতিমধ্যে ৬ই জানুয়ারী লাইবনেক্ট্ যখন ভিলহেল্‌ম্‌স্ট্রাসের মধ্য দিয়া মোটরে যাইতেছিলেন তখন তাহাকে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

নোসককে সরকারী সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করা হইল। তিনি প্রত্যেক স্থান হইতে সেনাবাহিনীকে আহ্বান করিলেন। রণাঙ্গন হইতে আহ্বান করিলেন গোলন্দাজ বাহিনীকে। কীল হইতে তিনি তাহার প্রিটোরিয়ান রক্ষীবাহিনী "লৌহবাহিনী"কে আহ্বান করিলেন। এই বাহিনী ছিল তাহার পরম অনুগত ১৪০০ সৈন্য লইয়া গঠিত। বুর্জোয়া ছাত্রদের লইয়া তিনি একটি শ্বেত রক্ষী-বাহিনী গঠন করিলেন। ফ্রীডরিক-ভিলহেলম্, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ ও কর্তৃমণ্ডলী এক সপ্তাহের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করিলেন। ছাত্রেরা যাহাতে গভর্ণমেন্টের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে ইহাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। বার্লিনে অন্ধ

উত্তেজনার এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। ৭ই হইতে ১০ই পর্যন্ত রাত্রিদিন গুলির শব্দ ও ভয়ার্তের আর্তনাদ অবিশ্রান্ত শোনা যাইতে লাগিল। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলি এই সকল ঘটনা ফলাও করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। শহরের অভ্যন্তরে গভর্ণমেন্ট সর্বশক্তি সমবেত করিলেন। শহরের পূর্ব পার্শ্বে রহিল বিপ্লবীদের প্রধান দপ্তর। প্রথম সাফল্যের পর তাহারা চের্ল, মসে ও উল্‌স্টাইনের পুস্তক প্রকাশালয়গুলি ও সেখান হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি দখল করিল, ছোটখাট সংঘর্ষ লাগিয়াই রহিল। উত্তেজনার তীব্রতা এতদূর উঠিল যে ভিলহেল্‌ম্‌স্ট্রাসের প্রহরিগণ একদল নিরপরাধ বুর্জোয়া পথচারীর উপর কয়েকটি হাতবোমা ছুড়িয়া মারিল।

প্রথমে লেদবুর ও পরে কাউট্‌স্কি, অস্কার কন ও ডিটমান ও ব্রাইট্‌চাইড সংঘর্ষের দলগুলির মধ্যে একটা মিটমাটের জন্য আপ্রাণ ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। ৯ই তারিখে নাবিক সমিতিগুলির স্বাক্ষরিত এক ঘোষণাবাণীর কয়েক সহস্র পুস্তিকা বিমান হইতে শহরের উপর বর্ষণ করা হইল। ঐ ঘোষণাবাণীতে ছিল: "আর রক্তপাত নহে, আমরা শান্তি চাই। সাফল্য আসিবে বিচার বুদ্ধির দ্বারা, পশুশক্তির দ্বারা নহে।" এই আবেদনের কোনোই সাড়া মিলিল না। ঐ দিনই কেন্দ্রীয় নাবিক-পরিষদ সমস্ত সোশালিস্টদের ও গভর্ণমেণ্টের নিকট একটা আবেগময় ঘোষণাবাণীতে আইকহর্ন, শাইডেমান, এবার্ট, নোসক ও অন্যান্য নেতাদের সশস্ত্র সংঘর্ষ ও কলহ ত্যাগ করিবার জন্য আবেদন জানাইল।

"শাইডেমান, এবার্ট, নোসক, লাণ্ডস্বের্গ, আইকহর্ন! জনগণের মঙ্গলের কথা কি এখনও তোমরা ভাব না? তাহাদের ভালোমন্দে কি তোমাদের কিছুই যায় আসে না? তোমরা বিদায় লও, অন্যে তোমাদের স্থান গ্রহণ করুক, দম্ভের দ্বারা পরিচালিত হইও না। তোমাদের ডেপুটির আসনের চেয়ে জনসাধারণের রক্তের মূল্য অনেক বেশি। জনগণের ঐক্য সাধনই তোমাদের সর্বোত্তম কর্তব্য হউক।"

এ আবেদনেরও কোনো ফল হইল না।

১০ই জানুয়ারী বার্লিনের ৪০ হাজার মজুর সোশালিস্ট দলগুলির শ্রমিককে বৃথাই ঐক্যবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। নেতারা যদি যোগ দেন তবে ভালোই, না দেন তবে নিজেরাই তাহারা এই ঐক্য আনিবে। রক্তপাত রোধ করিবার এই সংকল্প তাহাদের কার্যে পরিণত হইতে পারিল না। ঐক্যের জন্য আবেদন জানাইয়া বৃথাই তাহারা শোভাযাত্রা বাহির করিল ও সমবেত ভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করিল। সোশালিস্ট, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টস্, বিপ্লবীদল, স্পার্টাসিস্ট, সকলকে লইয়া নূতন মৈত্রীর ভিত্তিতে একটা সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা তাহাদের ফলবতী হইল না। কতকগুলি প্রতিশ্রুতি পাইলে স্পার্টাসিস্টরা তখনও মিটমাট করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সেনাবাহিনী সমবেত করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই কালহরণ করিতে লাগিলেন। মনে মনে তাহারা অমানুষিক দম্ভে অটল রহিয়া সর্বপ্রকারের বিরোধিতাকে ধ্বংসের সংকল্প লইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষমতার পাশবিক মোহ মানুষকে এতদূর নিচে নামাইয়া আনে যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অধিকাংশ সোশালিস্টদের নিকট তাহাদের নির্দেশগুলিকে আলোচনার জন্য পেশ করাটাই পরম অপরাধ বলিয়া মনে হইল। যাহারা কেন্দ্রীয় নাবিক-পরিষদের ঐক্যের আবেদনগুলি বিলি করিলেন তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইল, প্রহার করা হইল এবং এমন ব্যবহার করা হইল যেন তাহারা "বলশেভিক ডাকাত, খুনে, এবং মিত্রশক্তির অনুচর।" তাহাদের ভয় দেখান হইল, পরে মুখে আঘাত করা হইল। প্রায়ই শোনা যাইত একদল বলিতেছে উহাদের গুলি করিয়া মার, অপরদল বলিতেছে না তাহাদের হ্রদের জলে ফেলিয়া দাও।

১০ই তারিখে সমস্ত সেনাবাহিনী গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে আসিল। তাহারা সমস্ত আলাপ আলোচনা বন্ধ করিয়া দিলেন। চরম সংগ্রাম নিকটে আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া বিপ্লবিগণ সংগ্রামের ও সাধারণ ধর্মঘটের

আবেদন জানাইলেন। বাভেরিয়া, ড্রেসডেন, ওল্ডেনবুর্গ ও ব্রুন্‌স্‌ভিক-এর গভর্ণমেণ্টগুলি বৃথাই টেলিগ্রামযোগে গভর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে হিংসাত্মক নীতি ত্যাগ করিতে আবেদন জানাইলেন।

কুর্ট আইসনার লিখিলেনঃ "যদি সমগ্র জার্মানির ধ্বংস দেখিতে আমরা না চাহি তবে এ-অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে। নিষ্কৃতির একমাত্র পথ হইতেছে এমন এক গভর্ণমেণ্ট যাহা জনসাধারণের আস্থাভাজন এবং যাহার মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা প্রতিফলিত হইবে। যতদিন পর্যন্ত না জয়লাভ হয় ততদিন পর্যন্ত বিপ্লবের পথে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অভিযান পরিচালনা করিবার সংকল্প লইয়া এই গভর্ণমেণ্টকে চলিতে হইবে। দক্ষিণে সর্বত্রই বার্লিনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্রোধ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে।"

উইলিয়াম হার্জগ লিখিলেনঃ "কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এক চুলও নড়িল না। অমানুষিক নির্দয়তায় সে অটল রহিল। সাম্রাজ্যবাদী প্রাক্তন গভর্ণমেণ্টের মতোই সে সামরিক শক্তির উপরেই নির্ভর করিয়া রহিল। নোসকে চাহিলেন বিপ্লবে হিণ্ডেনবুর্গের ভূমিকায় অভিনয় করিতে। শোনা যায় লুডেনডর্ফ বার্লিন হইতে মাত্র ২০ মিনিটের পথ দূরে আছেন। শাইডেমান ও এবার্ট-এর দল বিশ্বযুদ্ধের ডিয়স্‌কুরাস-এর সাথে যোগদান করিতে বদ্ধপরিকর।

এই কথাগুলি যখন লেখা হইতেছিল তখন চরম দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। নূতন ভের্সাইয়ে বার্লিনে প্রবেশ করিয়া শহরের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ১১ই জানুয়ারি এক সংঘাতিক দিন। সে-দিনটা বুর্জোয়া সংবাদপত্র-গুলির পক্ষে এক মহা বিজয়ের দিন। তাহারা সংঘর্ষের যে কাহিনীগুলি প্রকাশ করিল তাহা জাতীয় জয়লাভের উচ্ছ্বসিত ঘোষণাবাণীর মতোই শোনাইল। বড় বড় মেশিনগান ও হাতবোমা লইয়া আক্রমণ-কারী সৈন্যগণ বেল-আলিয়াংসস্ট্রাসে ও ব্লুশারস্ট্রাসে হইতে অগ্রসর হইল।

ফরভায়েট্র্স্-এর উপর বর্ষিত হইল কামানের গোলা ঘণ্টায় পঞ্চান্নটি। তারপর সংবাদপত্রগুলি অত্যন্ত সহজভাবেই লিখিল: "হাতবোমা দিয়াই কাজ শুরু হয়; প্রত্যেক সৈন্যের ছিল ১৫টি করিয়া বোমা। ফরভায়েট্র্স্-এর ধ্বংসস্তূপের তলে হতাহতে মিলিয়া ছিল একশত জন।"

এক জন আহত ক্ষতবিক্ষত লোককে পার্শ্ববর্তী দালানের উপর হইতে ছুড়িয়া ফেলা হইল। স্পার্টাসিস্টদের যাহারা আত্মরক্ষার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহারাও আশঙ্কায় হাঁপাইতে লাগিল। তারপর সেকস্‌পিয়ার-এর চিরন্তন জনগণ, সেই হিংস্র জনতা, দুর্ভাগা জনতা, দুর্ভাগা বন্দীদের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে অসহ্য প্রহার করিল। সমস্ত অঞ্চলটা যেন উল্লাসে আত্মহারা হইয়া উঠিল। মহিলারা ও তরুণেরা উন্মাদ হইল সবচেয়ে বেশি। তাহারা ভাবিল দুর্ভাগাদের দুঃখভোগ বোধ হয় এখনও যথেষ্ট হয় নাই। মেয়েদের একটি বোর্ডিং স্কুল ছিল সেই গোলমালের মধ্যে। উইলিয়াম হার্জগ লিখিতেছেন: "টানেনবুর্গ-এর যুদ্ধ জয় ও লুজিটানিয়া নিমজ্জনের পর যে-উল্লাস জার্মানগণের মধ্যে দেখা গিয়াছিল সেই উল্লাস এবারেও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।"

ডয়চ টার্গেৎসাইটুং পত্রিকা লিখিল: "জনগণের এই উদ্দাম আনন্দকে ম্লান করিয়া দিয়াছে মাত্র একটি চিন্তা: লাইবনেক্ট্ ও রোজা লুকসেমবুর্গ ধরা পড়েন নাই। সর্বত্র সকলে এই কামনা করিতেছি। আশা করি যাহারা নররক্ত পান করিয়াছে তাহারা ল্যাম্প-পোস্টেই ঝুলিতেছে।" ইণ্ডিপেণ্ডেট ওয়ার্কার্স দলের কেন্দ্রীয়সমিতি বন্দীদের দেখিবার জন্য একটি কমিটি প্রেরণ করিলেন। ঐ কমিটি যে একটি চাঞ্চল্যকর বিবৃতি প্রকাশ করিলেন তাহাতে তাহারা লিখিলেন: বুর্জোয়া জনসাধারণের পাশবিক নির্যাতনের পর তাহাদিগকে মিলিটারি ব্যারাকগুলির সংলগ্ন কতকগুলি জানালাহীন আস্তাবলে একসঙ্গে তিনশত লোককে ঠাসিয়া রাখা

হইয়াছে ; ব্যারাকের প্রবেশদ্বারে ক্রুদ্ধ সৈন্যগণ উহাদের মধ্যে সাতজনকে গুলি করিয়াছে। যে সৈন্যেরা তাহাদিগকে পাহারা দিতেছিল তাহারা পট্স্ডাম রেজিমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত। লেফ্‌টন্যাণ্ট প্রিন্স হোহেনৎসোলান এই রেজিমেণ্টেরই লোক। "এবার্টকে নিরাপদ করিবার জন্য হোহেনৎসোলান লড়াই করিতেছে।" অলডয়চেন জয়লাভ করিল। ১৩ই তারিখের একটি সভায় ধর্মযাজক ট্রাউব ঘোষণা করিলেন : "স্পার্টাসিস্টদের হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি গভর্ণমেণ্ট দেয় নাই, দিয়াছে পট্স্ডাম-এর শিকারিগণ। বহুলোক আজ প্রাচীন ব্যবস্থাকে ফিরাইয়া পাইতে চায় (প্রবল হর্ষধ্বনি)। আমাদের জার্মান সম্রাট উইলিয়মকে সম্বর্ধনা জানাইতে আমরা ভুলিব না। লুডেন-ডর্ফকেও আমরা অভিবাদন জানাইতেছি (প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি)।" প্রিভি কাউন্সিলর হয়েচ বলিলেন : "রাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি ভালোবাসা আমাদের হৃদয় হইতে কেহই মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। বিসমার্কের কীর্তি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয় নাই ; ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে এক নূতন জার্মান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইবে, ..আলসেস্-লোরেন-এর কথা আমরা ভুলিব না। সমগ্র জগতকে উচ্চকণ্ঠে আমরা জানাইতে চাই : "আমরা কিছুতেই পরাজয় মানিব না। (দীর্ঘ হর্ষধ্বনি)। সম্রাটের পরিবারকে আমরা যে পুনরায় আহ্বান করিয়া আনিতে পারিব—এ-আশা আমি ত্যাগ করি নাই।" (অবর্ণনীয় উত্তেজনা, কয়েক মিনিট ধরিয়া চীৎকার ও হর্ষধ্বনি, কালো, লাল ও সোনালি রংএর পতাকাকে অভিবাদন জানান হইল। 'হাইল ডির ইন সীগেরক্রান্‌ৎস্,' 'ডয়চ উবের আলেস' সংগীত দুইটি গীত হইল।)

এই অন্ধ উন্মত্ততার মধ্যে ব্যাকুল হইয়া ফাদার নিকলাই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের জন্য বিষণ্ণকণ্ঠে আবেদন জানাইলেন। রাগে ও দুঃখে তাহার বিচারবুদ্ধিও প্রায় বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। "সন্ত্রাসবাদ ও ঘৃণার বিরুদ্ধে, ভ্রাতৃপ্রেম ও মানবতার জন্যে"—এই নামে তিনি একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন।

গত নবেম্বর মাসে বিপ্লবের মুখে জার্মানিতে ফিরিবার মুহূর্তে সুইডেন হইতে আমার নিকট লিখিত একটি পত্রে তিনি লিখিলেন: জেলে থাকিবার সময় মানুষের প্রগতিতে আশা ও আস্থাস্থাপন কত সোজা। কারণ, বাহিরে আসিলে মানুষের সহিত যে-সম্পর্কবন্ধন পুনরায় স্থাপিত হয়—বন্দীশালায় তাহার সুযোগ ছিল না। হার্জগ-এর প্রবন্ধগুলি তিক্ত হতাশায় পূর্ণ: "জার্মান জাতির কোনো পরিবর্তন হয় নাই। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেও যুদ্ধের সময়কার মতোই তাহারা প্রতারিত হইয়াছে, ব্যবহৃত হইয়াছে শাসকশ্রেণীর স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হিসাবে, তথাপি পশুশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা তাহাদের রক্তে রহিয়াছে এখনও। ...পূর্বে যেমন হিণ্ডেনবুর্গ ও লুডেনডর্ফ ছিল তাহাদের দেবতা আজ তাহাদের দেবতা তেমন হইয়াছে তাহাদের নূতন প্রভু এবার্ট ও শাইডেমান। ...সেই পুরাতন ব্যবস্থাই কায়েম রহিয়াছে। হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা, কায়েম রহিয়াছে প্রাচীন ব্যবস্থার সেই পুরাতন মন্ত্র: "পিতৃভূমির শান্তি ও স্বাধীনতার কল্যাণ।" কিন্তু জাতি রহিয়াছে আগের মতই অন্ধ। ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত দেশের নিকট আমরা ছিলাম দেশদ্রোহী। ১৯১৯ সালে আমরা হইয়াছি বলশেভিস্ট, স্পার্টাসিস্ট—লুণ্ঠন ও হত্যার সমর্থক। কেন? কারণ, আমরা আমাদের প্রতিবেশী নাগরিকদিগের জন্য সুবিধার দাবী করিয়াছি; কারণ, আমাদের বিশ্বাস জার্মানির সমগ্র জনজীবনকে কলুষমুক্ত না করিলে জার্মানি পৃথিবীতে তাহার হৃতগৌরব ও হৃতসম্মানের স্থান ফিরিয়া পাইবে না। কারণ, বণিক-স্বার্থ, হিংসা ও প্রতিক্রিয়ার সহস্রমুখী আক্রমণে সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ আজ বিপন্ন। ...শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের আদর্শ আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে। জাতি আর কিছু চায় নাই; এখনও আর কিছু চায় না। সমগ্র জাতি না হউক, অন্তত জাতির অধিকাংশের পক্ষে একথা সত্য। ইহাদের কোনো সাহায্য দিবার উপায় আমাদের নাই। কোনো রাজনৈতিক চেতনা ইহাদের নাই। ...অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া

মিথ্যাচার ও পশুশক্তির অন্ধ উপাসনার পরিণামের সম্মুখে মন হতাশায় ভরিয়া ওঠে...।

১৪ই জানুয়ারি মিউনিকের এক বক্তৃতায় ডিক্টেটর নোসকেকে কুর্ট আইস্নার তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিলেন, "নোসকে-গভর্ণমেণ্ট বলশেভিক গভর্ণমেণ্টের মতোই বিপজ্জনক। জনগণের পরিষদগুলির মধ্য দিয়াই জনগণের আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি হওয়া উচিত। আমাদের পক্ষে সমাজতন্ত্রের সাফল্যময় প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিতভাবে কার্য করাই উচ্চাভিলায।"

১৫ ই জানুয়ারি কমিটি অব দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ওয়ার্কার্স অব বার্লিন-এর একটি সভায় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হইল। তাহাদের মতে এই গভর্ণমেণ্টের কিছুটা জনতার নিকৃষ্টতম অংশ লইয়া গঠিত, কিছুটা সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমাবেশ। সুদীর্ঘ অভ্যর্থনার মধ্যে মোলকেনবুর্গ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন: "সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে এমন একটি মনোবৃত্তি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে যাহার বিরুদ্ধে অমাদের লড়াই চালাইতে হইবে স্পার্টাকাশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চাইতেও তীব্র ভাবে। যে সামরিক প্রতিক্রিয়াকে তাহার শিকারের দিকে লেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে আর কিছুতেই থামান গেল না। অফিসারগণ (বহুক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ ব্যতিরেকে ও নিজেদের কর্তৃত্ববলেই) লেদবুর, মেয়ার, কাউট্স্কি, ডী আকটিয়ন পত্রিকার সম্পাদক ফ্রান্ৎস্ পফেমফের্ট, লেখক কার্ল আইনস্টাইন ও শান্তিবাদী ক্যাপ্টেন ফন্ বেরফেল্ডকে গ্রেপ্তার করিল। আইনস্টাইন সাংঘাতিকভাবে আহত হইলেন। বিয়ার "নূতন পিতৃভূমি" নামক প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রকাশ্য সভায় বেরফেল্ড-এর দুঃসাহসী বক্তৃতা সম্প্রতি আমি উদ্ধৃত করিয়াছি ল্যুমানিতের ১৯১৯-এর ২৭শে জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে)।" বুণ্ড-এর অফিসগুলি পর্যন্ত দখল করিয়া— উহা স্পার্টাসিজম্-এর কেন্দ্র এই হাস্যকর অভিযোগে বন্ধ করিয়া দেওয়া

হইল। চূড়ান্ত আঘাত হানিবার সময় তখন উপস্থিত। ১৫ই জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় লাইবনেকট্ ও রোজা লুকসেমবুর্গ-কে হত্যা করা হইল।

ডী রেপুবলিক-এর যে-সংখ্যায় সংবাদটি বাহির হইল সে-সংখ্যার রূপ কী গভীর মর্মান্তিক (১৭ই জানুয়ারির পূর্বে অবশ্য সংবাদটি বাহির হয় নাই)। সংখ্যাটির সম্মুখের পৃষ্ঠার সমস্তটি লইয়া হোয়েলডেরলিন-এর একটি বিখ্যাত চিঠি (হিপেরিয়ন ও বেলারমিন ১৭৯৮) মুদ্রিত হইল। স্বদেশের বর্বরদের সহিত এই ব্যথিত বিরাট শিল্পীর একটি তিক্ত বিচ্ছেদ চিঠিটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাতাটি উল্টাইলেই চিঠিখানির এই অংশটুকু চোখে পড়িবে:

"নিপীড়িত নির্বোধ জনগণ যে-পাপ আজ করিল তাহার সম্মুখে ঘৃণায় ও লজ্জায় আমাদের রসনা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মানবতা আর বাঁচিয়া নাই, মানুষ পশু হইয়া গিয়াছে। তাহার মস্তিষ্কে আজ বিকারের উন্মাদনা।... এই দানবীয় নির্বুদ্ধিতার সহিত সংগ্রাম করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।" ইহার পর ছাপা হইয়াছে বৃহত্তর বার্লিনের শ্রমিক ও সৈনিকদিগের কেন্দ্রীয়সমিতির জনৈক সদস্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী: ১৫ই জানুয়ারি রাত্রি ১১-২০ মিনিটের সময় জনৈক লেফটেনাণ্ট কর্তৃক লাইবনেকট্-এর মৃতদেহ একজন সাধারণ মানুষের মৃতদেহের মত শবব্যবচ্ছেদ কক্ষে জমা দেওয়া হয়। পরদিন এক ঘণ্টার জন্য দেহটিকে সাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়!

উল্ফ এজেন্সি যে সরকারী বিবরণী পাঠান তাহাও আমরা দেখিয়াছি:

১৫ই তারিখে বুধবার রাত্রি ৯॥ টায় ভিলমেরস্‌ডর্ফ-এর একজন বুর্জোয়া রক্ষী কর্তৃক ধৃত হইয়া লাইবনেকট্ অশ্বারোহী রক্ষী বাহিনীর হেড কোয়ার্টারস্ এডেন হোটেলে নীত হন। সেখান হইতে তাহাকে মোবিট বন্দীশালায় প্রেরিত হইবার আদেশ দেওয়া হয়। হোটেলের বাহিরে আসিবামাত্রই সমবেত জনতা তাহার মাথায় গুরুতর আঘাত

করে। যে গাড়িতে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তাহা টীরগার্টেন -এর মাঝামাঝি ভাঙিয়া যায়; বন্দী যখন রক্ষিগণের সহিত শার্লটেনবুর্গ-আলের দিকে আর একটি গাড়ীর জন্য হাঁটিয়া চলিয়াছিলেন সেই সময় তিনি পালাইবার চেষ্টা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার পৃষ্ঠদেশে বন্দুক বুলেট বিদ্ধ করা হয়।

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করিবার মত; ১৬ই জানুয়ারি শবব্যবচ্ছেদ-কক্ষে যাহারা মৃতদেহটিকে প্রথম পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল তাহারা মাত্র তিনটি ক্ষতের কথা উল্লেখ করে। উহার মধ্যে মুখের বামপার্শ্বের যেটা সেটা গুরুতর এবং তাহাতেই আহতের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় আঘাতটি দক্ষিণ দিকের কণ্ঠাস্থির নিকটে, এবং তৃতীয় আঘাতটি লাগিয়াছে হাতের উপরিভাগে। মিলিটারি পিস্তল দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত নিকট হইতেই তিনটি গুলি করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া লাইবনেক্ট-এর ভ্রাতা থিওডোরও সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিচালিত সরকারী তদন্তের প্রতিবাদ করেন তাহার পরিবারের পক্ষ হইতে, কারণ এই ব্যাপারে সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেরাই জড়িত ছিলেন। পরিশেষে লাইবনেক্ট-এর হত্যার অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত আর একটা নৃশংসতার অনুষ্ঠানকালে উপস্থিত কোনো ব্যক্তির বিবরণী হইতে ঘটনাটির একটি পূর্ণ চিত্র আমরা পাই।

আধ ঘণ্টা পরে রোজা লুকসেমবুর্গ গ্রেপ্তার হন। তাহাকে এডেন হোটেলে লইয়া যাওয়া হয়। সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে হোটেলের প্রবেশ পথে যাহাতে লোক না থাকে তাহার জন্য সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং একটা মিথ্যা ইঙ্গিতে ক্রুদ্ধ জনতাকে অন্য দিকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তাহারা ধাপ্পা ধরিয়া ফেলে। হোটেল হইতে বাহিরে আসিতেই রোজাকে আঘাত করা হয় এবং তাহার অচেতন দেহকে

একটি সামরিক মোটর গাড়িতে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কিছুদূরে বার্লিনের প্রবেশমুখে একজন পাহারাওয়ালা গাড়িখানাকে থামায়, এই সুযোগে কয়েকজন অজ্ঞাত লোক রোজার দেহ টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া যায়।

কিন্তু বার্লিনের শ্রমিক ও সৈনিকদিগের কেন্দ্রীয়সমিতির নিকট প্রেরিত একটি চিঠিতে একজন সৈনিক এইরূপ লিখিয়াছেন :

"১৫ই তারিখে সন্ধ্যায় তিনি এডেন হোটেলে ছিলেন, রোজাকে তিনি বাহিরে আসিতে দেখেন। একজন অসামরিক ব্যক্তিও হোটেলের সম্মুখে ছিল না। জন পনের কুড়ি সৈনিক—উহাদের মধ্যে অধিকাংশই অফিসার—উত্তেজিতভাবে গাড়িখানির চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যে মুহূর্তে রোজা চৌকাটের উপর দেখা দিলেন সেই মুহূর্তেই দ্বারে দণ্ডায়মান প্রহরী রাইফেল তুলিয়া রোজাকে গুলি করে। রোজা চিৎ হইয়া পড়িয়া যান। সে তখন আর একবার গুলি করে। প্রহরীটি তৃতীয়বার গুলি করিতে উদ্যত হইলে দেখা গেল প্রাণহীন দেহটি ইতিমধ্যে গাড়িতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এবং গাড়িখানি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন সৈনিক পিছন হইতে লাফ দিয়া গাড়িতে গিয়া ওঠে এবং রোজার অচেতন দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে কি যেন একটা জিনিস দিয়া আঘাত করে। পত্রলেখকের বিশ্বাস জিনিসটা একটি রিভলভার। গাড়িটি যখন প্রায় একশত গজ গিয়াছে তখন আর একটি গুলির শব্দ শোনা যায়।

শাইডেমান ১৬ই তারিখে ক্যাসেল-এ ছিলেন। তিনি যখন তাহার রাজনৈতিক শত্রুগণের মৃত্যুর খবর শুনিলেন আনুষ্ঠানিকভাবেও তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। উপরন্তু এক হিংস্র বক্তৃতায় তিনি তাহার বিরোধীদের তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন। সেকস্‌পিয়ারের নাটকগুলিতে

দেখা যায় মহান প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন মারা যান তখন বিজেতারা তাহাদের মহত্ত্বের প্রতি সহৃদয় সম্মান প্রদর্শন করেন। কোরায়লেনাস নিহত হইবার পর আউফিডিউস তাহার মহত্ত্বকে স্বীকার করিয়া বিপুল সম্মানসহকারে তাহাকে সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শাইডেমান সেক্‌স্‌পিয়ারের নায়ক নহেন।

তিনি বলিলেন: "এ-যুদ্ধকে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বলা হইয়াছে—না, চোর ও অপরাধীরা আমার ভাই নহে।"

যদিও তিনি লাইবনেক্‌ট্‌ ও রোজাকে বিপজ্জনক উন্মাদ বলিয়া মনে করিতেন তথাপি তাহাদের ব্যক্তিগত চরিত্রমাহাত্মকে স্বীকার করিতে তিনি রাজী ছিলেন; কিন্তু স্পার্টাসিস্টরা যে বলশেভিজম্-এর বিষে বিষাক্ত হইয়াছে—এই প্রচারটুকু যাহাতে ব্যাহত না হয় সে-বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাই আধুনিক চিচেরোর মতো তিনি প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, দেশকে তিনি ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। "জনস্বার্থের কল্যাণেই স্পার্টাসিস্টদের দলন আবশ্যক; জাতির নিকট, ইতিহাসের নিকট এই কর্তব্য আমাদের পালন করিতে হইবে।"

বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি আনন্দে যেন প্রলাপ বকিতে শুরু করিল—ডয়চ ৎসাইটুং লিখিল লাইবনেক্‌ট্‌ ও রোজা লুকসেমবুর্গ যে-অপরাধ করিয়াছে কোনো শাস্তিই তাহার উপযুক্ত নহে। ডয়চ টাগেৎসাইটুং লিখিল লাইবনেক্‌ট্‌ ভাগ্যবান, বৈধ শাস্তির হাত হইতে ভাগ্য তাহাকে রক্ষা করিয়াছে; যে-শাস্তি সে পাইয়াছে তাহা ঈশ্বরের শাস্তি। কাগজখানি ইহাও লিখিল যে, কাপুরুষের মতো পালাইতে গিয়াই নাকি লাইবনেক্‌ট্‌ নিহত হইয়াছেন। ক্রয়ৎস ৎসাইটুং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। লোকাল আনৎসাইগের-এর চোখে সমস্ত দোষ লাইবনেক্‌ট্‌-এরই: জার্মান জাতি স্বভাবতই শান্ত প্রকৃতির, লাইবনেক্‌ট্‌ তাহাকে উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শুধু একটু মহত্ত্ব দেখা গেল ভসিশে ৎসাইটুং কাগজখানির। স্পার্টাসিস্ট নেতা দুইজনকে নিন্দা করিলেও তাহাদের নৃশংস হত্যাকে সে সমর্থন করে নাই। ফরভায়েট্‌র্স্‌ মৃত দুই নেতাকে নিন্দা করিলেও হত্যাকারীদের তিরস্কার করিল। কিন্তু সত্যকার মহত্ত্ব দেখাইল ৮-উর আবেণ্ড ব্লাট। আইনজীবী লাইবনেক্‌ট্‌-এর প্রাক্তন সহকর্মী ডাঃ জোহানেস ভেটহাউয়ার মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। নিঃস্ব ও নিপীড়িত মানুষের স্বার্থ লইয়া এই হৃদয়বান পুরুষের সংগ্রাম যে, কত গভীর ও আন্তরিক ছিল তাহার কথা তিনি স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করিলেন। নিজের চোখে তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহারই কথা তিনি লিখিলেন লাইবনেক্‌ট্‌-এর চরিত্র বর্ণনায়। তিনি লিখিলেন: "সত্যের পতাকাতলে অশ্রান্ত যোদ্ধা, নিঃস্বার্থ, পূতচরিত্র এই মানুষটি দুঃখভারনত মানুষের সেবায় আপনার সব কিছু ঢালিয়া দিয়াছিলেন।"

এই শাঠ্য ও পশুবলের যুগে 'সুবিচার' কথাটা যখন মানুষের রসনায় রসনায় অবিশ্রাম ঘুরিয়া ফিরিতেছে, তখন সুবিচার সত্যই এত বিরল হইয়া উঠিয়াছে যে হত্যার প্রত্যুষেই লাইবনেক্‌ট্‌-এর নৈতিক নির্মলতার পদপ্রান্তে এই হৃদয়বান প্রতিদ্বন্দ্বীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন স্মৃতির ভাণ্ডারে চিরদিন রক্ষা করিবার মতো জিনিস।

কিন্তু এ বাণীর কোনো প্রতিধ্বনি উঠিল না। ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের বিজেতাগণ নির্লজ্জের মতো উল্লাসে মাতিয়া উঠিলেন। হার্জগ লিখিলেন: "যে-জাতি একদিন হের্ডের, হোয়েলডেরলিন, কাণ্ট, হুম্বোল্ট ও ক্লাইস্ট-কে জন্ম দিয়াছিল সে-জাতি আজ এক মধ্যযুগীয় ব্যক্তির সামনে মাত্র ৫০ বৎসরের সিদ্ধি-পূজার ফলে, এতখানি নিচে নামিয়াছে, মানবীয় অনুভূতি হইতে এত দূরে সরিয়া আসিয়াছে যে, এই হত্যাকাণ্ডকে সে লুজিটানিয়া নিমজ্জনের মতোই ন্যায়ের কথা বলিয়া মনে করিতে দ্বিধা করে না।······কোনো কথা বলা নিরর্থক। এই মিথ্যার সমুদ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজেকে

শক্তিহীন মনে হয়।......আমরা আহত, বিপন্ন।......বিভিন্ন দলের সমন্বয় সাধনের জন্য আমরা চেষ্টা করিয়াছি। পশুশক্তির প্রতিনিধিগণ এই চেষ্টাকে অপমানকর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে; তাহারা তাহাদের নিজেদের ব্যবস্থার কারাগারে নিজেরাই বন্দী।......আমরা ভাবিয়াছিলাম এই বিপ্লবের ফলে মানবতার আদর্শগুলি আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব ভাবিয়াছিলাম অপর জাতির ভায়েদের দিকে আমরা হাত বাড়াইয়া দিতে পারিব।... এ-বিপ্লব বিপ্লব নয়, নাবিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান মাত্র; ইহার ফলে যে জার্মান জাতির মনোবৃত্তির পরিবর্তন হইয়াছে এইরূপ ধারণা বিপজ্জনক। মত্ততা বহুদূর গিয়াছে......

"নিজেদের কার্যের পরিণাম দেখিয়া শাসকেরা নিজেরাই আজ শঙ্কিত; কিন্তু পিছু হাটিবার উপায় নাই; যে-জালে তাহারা জড়াইয়াছে তাহা ছাড়াইয়া বাহিরে আসা অসম্ভব। তাই, কৃতকার্যের নির্ভুলতার প্রমাণের চেষ্টা তাহাদের করিতেই হইবে। সমগ্র জাতি আজ জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন এক রোগীর মতো; চিকিৎসকেরা তাহাকে নীরোগ করিতে চাহেন না, ঘৃণা করেন। ...একি উন্মাদ দৃশ্য দেখিতেছি। জাতির জন্য যাহারা সর্বস্ব দিয়া সংগ্রাম করিল, জাতিই তাহাদের আজ শত্রু বলিয়া ঘৃণা করিতেছে। কারণ, জাতি যে-পথে চলিতে চাহিতেছে তাহারা সে-পথের বিঘ্ন।......আজ যখন তর্জন, হিংসা ও হত্যা প্রতিদিনের স্বাভাবিক সাধারণ জীবনযাত্রার অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে, যখন নাগরিকদের জীবনরক্ষার ব্যবস্থা দ্বিতীয় উইলিয়মের যুগ হইতেও শিথিল, তখন মানবতার কথা তোলা বাতুলতা মাত্র।......সভ্যতার প্রগতি-পথের এই স্থান এখনও যে-জাতি উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, তাহাকে তাহার পশ্চাদ্পরতার জন্য অপরাপর জাতির গণতন্ত্রগুলি যে তাহাদের মধ্যে স্থান না দিতে পারে এমন ভয় কি তাহার মনে স্থান পায় না?"......

কুর্ট আইসনার-এর তীব্র তিরস্কারের মধ্যে এই কথাই ধ্বনিত হইয়াছে;

২৬শে সন্ধ্যায় তিনি বলেনঃ "যখন ভাবি দ্বিতীয় উইলিয়ম, যুবরাজ টিরপিট্‌স্ ও লুডেনডর্ফ্-এর মতো লোক (শেষোক্ত লোকটি তো একেবারে বার্লিনের প্রবেশদ্বারে) বুক ফুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তখন বার্লিনের এই উন্মত্ত অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। যাহারা সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে যুদ্ধের বিরোধিতা শুরু করিয়াছিলেন, দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যাহারা নির্মল নিষ্কলুষ আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন —বার্লিনের ক্রুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী আজ তাহাদেরই বিরুদ্ধে নিজেদের নিয়োগ করিতেছে। ওদিকে বিশ্বযুদ্ধের পাপাত্মাগণ এখনও বাঁচিয়া। চোখের উপর দেখিতেছি জার্মানির দেহের মধ্যে সাংঘাতিক এক ব্যাধির ক্রিয়া শুরু হইয়াছে। জার্মানির সম্মান আজ বিনষ্ট......।"

প্রতিবাদে হামবুর্গ ধর্মঘট করিল, বন্ধ রহিল সবকিছু, সবকিছুই বহন করিল শোকচিহ্ন; ডুসেলডর্ফ গভীর শোকে নিমগ্ন হইয়া রহিল; এই ডুসেলডর্ফ-এই হইল শবযাত্রা। বার্লিনে পর্যন্ত বড় বড় শিল্পগুলির শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিল।

২৫শে জানুয়ারি শনিবার লাইবনেক্‌ট্ ও তাহার সহকর্মীদের সমাহিত করা হইল। গভর্ণমেণ্ট কঠোর আদেশ জারি করিলেন, সৈন্যেরা সর্বত্র কামান দিয়া বড় বড় রাস্তাগুলি ও স্কোয়ারটি বন্ধ করিয়া রাখিল; তথাপি ফ্রীড্রিক্‌স্-ফেল্ড-এর সমাধিক্ষেত্রে যে জনসমাবেশ হইল তাহা মনে রাখিবার মতো। বার্লিনের সমস্ত স্থান হইতে দরিদ্রের দল ভীড় করিয়া আসিল; ৩৩টি শবাধারের পার্শ্বে দৈন্য ও দুর্দশা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া 'গার্ড অফ্ অনার' রচনা করিলঃ জীর্ণবেশ পরিহিত রুক্ষ ও বিষণ্ণ তরুণের দল; কৃশ বন্দীশালা হইতে সদ্যমুক্ত শহিদের দল; চোখে জল ও পরিচ্ছদে শোক-চিহ্ন বহন করিয়া নারী ও বালিকার দল; সম্রাজ্যের সর্বত্র হইতে সমাগত শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকের প্রতিনিধিগণ; সমাজতন্ত্রী তরুণ দল; লাল পতাকার সারি; প্লাকার্ডে প্লাকার্ডে মাত্র একটি কথা লেখা "হত্যাকারীর দল"।

৩২ জন স্পার্টাসিস্ট এবং তাহাদের নেতাদের একটি কবরে সমাহিত করা হইল। কোথাও কোনো একটি গুঞ্জনও শোনা গেল না। কিন্তু হৃদয়ের গম্ভীর তলদেশ যেন প্রচণ্ড মেঘগর্জনে কাঁপিয়া উঠিল। তাহাদের নেতা লাইবনেক্‌ট্ মৃত্যুর পূর্বাহ্নে বসিয়া রোটেফানে পত্রিকার জন্য মরণোন্মুখ স্পার্টাকাশের যে মাল্‌গ্রে তু রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা না জানি কত হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিলঃ "স্পার্টাকাশকে নিষ্পেষিত করা হইয়াছে। অস্বীকার করি না বিপ্লবী কর্মীদের পিষিয়া মারা হইয়াছে। অস্বীকার করি না তাহাদের একশ শ্রেষ্ঠ বীরদের একত্রে হত্যা করা হইয়াছে ও একশ বিশ্বস্ততম কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। এ-সব কিছুই অস্বীকার করি না। ইতিহাসের প্রয়োজনেই তাহারা দলিত হইয়াছে। সময় তখনও আসে নাই···কিন্তু এমন অনেক পরাজয় আছে যাহা পরাজয় নয়, জয়লাভঃ এমন অনেক জয়লাভ আছে যাহা বিপর্যয়ের চেয়েও বিষাদময়। জানুয়ারির রক্তাক্ত সপ্তাহে যাহারা পরাজিত হইল তাহাদের লক্ষ মহান। বেদনা-বিহ্বল মানবতার উদারতম বিকাশের জন্য, তাহার ঐহিক ও নৈতিক বন্ধন মোচনের জন্য, সেই বীরের দল প্রাণ দিয়াছে। যে-রক্ত তাহারা ঢালিয়াছে তাহার প্রতি বিন্দু হইতে জন্ম লইবে প্রতিশোধের রক্তবীজদল। জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর ভিয়া দলোরসা এখনও শেষ হইয়া যায় নাই। মুক্তির দিন দ্রুত আগাইয়া আসিতেছে। এবার্ট, শাইডেমান, নোসকে ও অন্য যে-সকল পাণ্ডারা ইহাদের পশ্চাতে লুকাইয়া কাজ করিতেছে তাহাদের বিচারের দিন আসিতেছে। লক্ষলাভ পর্যন্ত যদি আমরা বাঁচিয়া না থাকি, বাঁচিয়া থাকিবে আমাদের কর্মনির্দেশ। নূতন মানবতা ও নূতন পৃথিবী চালিত হইবে ঐ নির্দেশেই। সব কিছু সত্ত্বেও মাল্‌গ্রে তু ···"

মাল্‌গ্রে তু—ভবিষ্যতের সমাজসংগ্রামে এই কথাটি আহ্বানবাণীর কাজ করিবে। কোনো রক্তাক্ত নির্যাতনই কোনোদিন ইহার কণ্ঠরোধ করিতে

পারিবে না। এই প্রথম সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত শক্তির পক্ষে ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপক্ষে সংগ্রাম করিতেছে। শ্রমিকশ্রেণী বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম করিয়াছে, ফলে এমন এক গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের মধ্যে এমন একটা উন্মত্ত উদাসীন তিক্ততার সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে যাহার ফল সমস্ত জাতিকে ভোগ ক'রতে হইবে। এই গৃহ-যুদ্ধের জ্ঞাতি যোদ্ধাগণ কি একথা বুঝিবে না! সর্বসাধারণের স্বার্থের কল্যাণে কি তাহারা ব্যক্তিগত বাসনা-কামনাকে খর্ব করিবে না। বার্লিনের 'রক্তাক্ত জানুয়ারির' যে-বর্ণনা আমি দিয়াছি তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মজুরেরা তাহাদের নেতাদের চেয়ে অনেক বেশি দেখিতে পায়; সমস্ত মজুরের ঐক্য তাহারা অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষা করে। আজ নয়, এ-কথা আমরা বহুদিনই জানি যে, যে-বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমজীবীশ্রেণীর মধ্য হইতে জন্ম লইয়াও তাহাদের সহিত এই জন্মের বন্ধন অস্বীকার করে তাহাদের চেয়ে শ্রমিকশ্রেণীর শুভ-বুদ্ধি অনেক বেশি! পাঁচ বৎসরের যুদ্ধের কল্যাণে এ-সত্য আজ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, দম্ভ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তাহাদের নেতাদের চেয়ে শ্রমজীবী-সাধারণের বুদ্ধির বিচারবোধ বেশি।

১-৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯ সাল। রমাঁ্যা রলাঁ

১৯১৯ সালের ১৬ই, ১৭ই ১৮ই ফেব্রুয়ারি ল্যুমানিতে
পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

খাদ্য অবরোধের বিরুদ্ধে রুশ ভ্রাতাগণের জন্য লিখিত

মিত্রশক্তিবর্গ, জার্মানগণ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি অর্থাৎ ইউরোপের সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণী মিলিত হইয়া রুশ বিপ্লবকে ধ্বংসের যে আয়োজন করিতেছে তাহাতে এক নারকীয় পাপের পথই প্রশস্ত হইতেছে। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এ-ব্যাপারে ইউরোপ ও আমেরিকার তথাকথিত গণতন্ত্রগুলির মুখোশ খসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা বলে তাহারা নাকি জার্মান স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোসহীন অভিযান করিয়াছিল। কিন্তু শাঠ্যে ও স্বার্থপরতায় তাহাদের মুষ্টিমেয়শাসিত গণতন্ত্র জার্মান স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে কম নহে। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে-যুদ্ধের আগুন জ্বলিতেছে সে-যুদ্ধ যে তাহাদেরেই যুদ্ধ, মুষ্টিমেয়শাসিত বুর্জোয়াশ্রেণীর যুদ্ধ, সে-যুদ্ধের লক্ষ যেমন একদিকে প্রাচীন রাজতন্ত্রের শেষ দুর্গকে ধ্বংস করা, তেমনি অপর দিকে জাগরমান জাতিসমূহের অধিকারের দাবিকে শুদ্ধ করা—ইহা আজ দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। এই চতুর ব্যবসায়ীশ্রেণীর স্বার্থপরতায় আদর্শের বিন্দুমাত্র উত্তাপ নাই, ভাবাদর্শের কোনো স্পষ্ট রূপ নাই। ইহাই একটা অন্ধ উন্মাদনায় এই যুদ্ধ পরিচালিত করিতেছে। ফরাসী বিপ্লবের বহু পূর্ব হইতে—ফিলিপ ল্য ফেয়ার-এর সময় হইতে—যে-রাষ্ট্রক্ষমতা ইহাদের করায়ত্ত তাহার পরিচালনা হইতেই ইহারা শক্তি আহরণ করিতেছে। কল্পনা ও মিথ্যার দুর্গ খাড়া করিয়া ইহারা চিরদিনই নিজদের দায়িত্বহীনতাকে আড়াল করিয়া আসিয়াছে। অতীতে এই মিথ্যার বেসাতি করিয়াছিল তাহারা রাজাকে খাড়া করিয়া, আর আজ স্থাপন করিয়াছে সুবিচার, স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার পুতুল-মূর্তি। সেদিন যেমন রাজ-আনুগত্যের নামে তাহারা

নিজেদের স্বার্থ ও বাসনার চরিতার্থতা খুঁজিয়াছিল, আজ ঠিক তেমনি সেই হিংস্র প্রবঞ্চকের দল গণতন্ত্রের নামে সমস্ত পৃথিবীকে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে উদ্যত। বেদনার্ত হৃদয়ে দেখিতেছি কত না নির্মল-হৃদয় শ্রমিক-কর্মী, এমন কি বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যকার বহু নিঃস্বার্থ মহাত্মা এই কপটতার ফাঁদে পা দিয়াছেন। যত দিন এই বৃহৎ প্রবঞ্চনার অবসান না হইবে ততদিন কোনো গভীর ও ব্যাপক সামাজিক প্রগতি অসম্ভব, প্রাচীন অচল দুর্নীতিবিষাক্ত সমাজব্যবস্থাকে যতবারই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইবে, ততবারই সে-চেষ্টা হইবে শোচনীয়ভাবে নিষ্পেষিত, যে-ভাবে আজ নিষ্পেষিত হইতেছে আমাদের রুশ ভ্রাতাগণের বিশৃঙ্খল ও বিরাট প্রয়াস। কিন্তু ন্যায় ও মানবতার আরো ব্যাপক প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন ব্যবস্থার জন্য মানুষের মনে যে অনন্ত পিপাসা রহিয়াছে জোর করিয়া তাহাকে নিবারণ করা যাইবে না। সে-আকাঙ্ক্ষার শিখাকে হাজার বার নিবাইয়া দাও—একাধিক হাজার বার সে আবার জ্বলিয়া উঠিবে।

ল্যুমানিতে, ২৬শে অক্টোবর, ১৯১৯

• আঁরি বারব্যুসের সহিত 'চিন্তার স্বাধীনতা' লইয়া বিতর্ক

বারব্যুসের নিকট রলাঁর প্রথম খোলা চিঠি

বুধবার, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২১

প্রিয় বারব্যুস্,

"রলাঁবাদ সম্পর্কে" শীর্ষক আপনার প্রবন্ধটি আমি পাইয়াছি। আমার প্রতি যে ব্যক্তিগত সহানুভূতি দেখাইয়াছেন এবং বিতর্কের মধ্যে যে উদার ও পরিমিত সুরটি আপনি আনিয়াছেন তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আশা করি, ভবিষ্যতে এই পথ হইতে আমরা বিচ্যুত হইব না; কারণ, যাহাই ঘটুক না কেন, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও বুদ্ধিগত সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়া-শক্তির বিরুদ্ধে আমরা সর্বদা সম্মিলিত থাকিবই।

আপনার চিঠির ব্যাপক ও বিশদ জবাব আজ দিব না। আমার সময়াভাব এবং এই প্রবন্ধের স্থানাভাব উহার কারণ। পরে যখন সময় পাইব তখন আমার ভাবধারা ও বিশ্বাস সম্পর্কে একটি বিবৃতিতে আপনার সব কথার উত্তর দিব। আজ পর্যন্ত এই ধরনের জবাব আমি দিই নাই। তাহার একটি কারণ, আপনার চেষ্টায় বাধা সৃষ্টি না করিবার জন্য আপনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। আপনি তো জানেন ক্লার্তের মতবাদে আপনাদের বৈদেশিক দলগুলির কোনো কোনো নেতার আস্থা রক্ষা ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। "রলাঁবাদ"-এর উপর আপনি যে সৌজন্যপূর্ণ আক্রমণ করিয়াছেন তাহার ফলেই আজ আমাকে আমার কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইতেছে। ইহার ফল হইবে, যে 'রলাঁবাদ'-এর অস্তিত্ব এতদিন ছিল না

তাহাকে প্রতিষ্ঠা করা। ইহা যদি করিতে হয় তবে দুঃখের সঙ্গেই করিব; কারণ, যাহা কিছু ব্যক্তিগত উদ্যম ও স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে আমি তাহার প্রতি বিরূপ। তবে আজ এই যে সংক্ষিপ্ত জবাব লিখিতেছি ইহা 'রলাঁবাদীদের' সমর্থন নহে, কেবলমাত্র রম্যাঁ রলাঁর নিজের কথা।

আপনি লিখিয়াছেন যে আমি সংস্কৃতিক্ষেত্রে সংগ্রাম পরিচালনা ব্যাপারে আপনাদের দলের সহিত সহযোগিতা করিতে চিরদিনই অস্বীকার করিয়া আসিতেছি। প্রিয় বারব্যুস্, আপনি আমাকে বিস্মিত করিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে গেলে ক্লার্তের সূচনাকাল হইতেই আমি উহার প্রতিষ্ঠাতাগণের সহিত মতানৈক্য অনুভব করিয়া আসিতেছি। অবশ্য হঠাৎ কোনো স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিতে আমি চাহি নাই; তাই নীরবে সতর্কভাবে উহার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করিয়া আসিয়াছি মাত্র।

আমার এই নীরবতাকে আপনি 'নিরাসক্তি' অর্থাৎ সেই অতি-বিখ্যাত 'গজদন্ত মিনারে' আত্মগোপন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখিয়া আমি দুঃখিত।

যিনি আমাকে জানেন, আমার যে-কোনো একখানি বই পড়িয়াছেন এমন যে-কোনো লোক বলিতে পারেন আমার মূল সুর অনাসক্তি, না জগতের দুঃখ-দুর্দশায় বিদীর্ণ হৃদয় লইয়া আমি করিয়াছি মানুষের কষ্টের উপশম ঘটাইবার চেষ্টা। আমার মতকে তাহারা না মানিতে পারেন, আমার বিশ্বাসকে তাহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। আমার যৌবনকাল হইতেই সে-বিশ্বাস আমাকে সর্বপ্রকার বিপদের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া আসিতেছে, সেই বিশ্বাসে ভর করিয়াই পার হইয়াছি আমি মহা গহ্বর।

আপনার কোনো বন্ধু আমাকে "এ মিস্টিক আঁ দিস্পানিবিলিতে" বলিয়াছেন। আমার চিন্তাধারার বিভিন্ন অংশের মধ্যকার ভারসাম্যের কথা বাদ দিলে বলা চলে যে যদিও এই পরিহাসোক্তি আমাকে আঘাত করিবার

জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে তথাপি 'সৌন্দর্যবাদীর অনাসক্তি' বলিয়া যে আখ্যা আপনি দিয়াছেন তাহার চেয়ে উহার মধ্যে সত্যের ভান আছে অনেক বেশি। কিন্তু ধর্মের শক্তি (কথাটি যতদূর সম্ভব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি) আজ মানুষের কোনো উপকারেই আসে না এইরূপ ভাবিয়া আপনার বন্ধু অত্যন্ত ভুল করিতেছেন। মানবতার আধ্যাত্মিক জগতে যে বিপুল গোপন-শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, যে প্রবল প্রবাহে আলোড়িত হইতেছে তাহার গভীর অন্তস্থল, আপনার বন্ধু তাহার সংবাদ রাখেন না। আপনাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব নাই। জগতের উপরিভাগেই আপনাদের দৃষ্টি একটু বেশি নিবদ্ধ। জীবনকে বড় বেশি করিয়া আপনারা যুক্তির বন্ধনে বাঁধিতে চান। আপনারা যাহা বলেন তাহা শুনিয়া মনে হয় মানুষের বিবর্তনের রহস্যকে অয়ক্লিডেআউ-র জ্যামিতির একটি সমস্যায় পরিণত করাই ক্লার্তে-দলের মনোবৃত্তি।

কিছু মনে করিবেন না, আপনার প্রবন্ধের একটি স্থান পড়িয়া আমার হাসি পাইল, এ হাসি শক্রর বিদ্রূপের হাসি নয়। আপনি লিখিয়াছেন: "কার্তের মূল নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া সমাজবিপ্লবের যে সংজ্ঞা ও রূপ নির্ধারিত হইয়াছে সেই সমাজবিপ্লবের জ্যামিতির গণনায় ভুল হইতে পারে না।" মানুষের সম্পর্কে কি অদ্ভুত অবাস্তব এই ধারণা। কত অচেতন ও আদিম শক্তি, কত শৃঙ্খলা ও সংহতির আলোকের উৎস এই মানুষ। রাজার চেয়েও রাজভক্ত আপনারা, যে বিজ্ঞানীদের সহিত নিজেদের তুলনা করেন তাহাদের চেয়েও আপনারা বেশি যুক্তিবাদী; 'মূল নিয়মগুলির অভ্রান্ততা' সম্পর্কে তাহারা আপনাদের মতো এতখানি নিশ্চিত নহেন।

যাহাই হউক না কেন আমার সম্পর্কে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে আপনাদের 'সামাজিক জ্যামিতির' নিয়মনিচয়ের অভ্রান্ততায় আমি বিশ্বাস করি না, ইহার আহ্বানে আমি সাড়া দিব না।

তাহার প্রথম কারণ, মতবাদের দিক হইতে (সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে মতবাদের কি মূল্য আছে? কীর্তিই তো সব) নয়া-মার্কসীয় সাম্যবাদের মতবাদ (যে সুসম্পূর্ণ রূপ বর্তমানে উহাতে আরোপ করা হইতেছে সেই রূপ বিশিষ্ট মতবাদ) মানুষের সত্যকার প্রগতিকে খুব বেশি আগাইয়া লইয়া যাইতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

(পরে আমি এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিব; প্রসঙ্গটি এত ব্যাপক ও সাধারণ যে কয়েক কথায় ইহাকে সারিয়া দেওয়া যায় না।)

আপনাদের 'সামাজিক জ্যামিতির' নিয়মগুলি আমার না মানিবার দ্বিতীয় কারণ, বাস্তবক্ষেত্রে দেখিতেছি রাশিয়ায় উহাদের প্রয়োগের ফলে যে শুধু নিষ্ঠুর ও শোচনীয় বহু ভ্রান্তির উদ্ভব হইয়াছে তাহা নহে, (ইউরোপ ও আমেরিকার বুর্জোয়া গভর্ণমেণ্টগুলির সম্মিলিত শয়তানিই এ-গুলির জন্য সর্বাধিক দায়ী) দেখিতেছি এই 'অভ্রান্ত আইন' প্রয়োগ করিতে গিয়া নূতন ব্যবস্থার নেতাগণ প্রায়ই ইচ্ছা করিয়া বহু উচ্চতম মৌখিক আদর্শকে বলি দিয়াছেন; বলি দিয়াছেন মানবতাকে, স্বাধীনতাকে এবং সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ, সত্যকে। এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। আজ অত্যন্ত বেদনার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে রুশ বিপ্লবের অধিকাংশ নেতার নিকটে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নেতাদের মতোই সব কিছুর উপরে রেজ্ঁ দে'তা।

এক রেজ্ঁ দে'তা-র বিরোধিতা করিয়া অপর একটির প্রতিষ্ঠার সমর্থন আমি করি না। সামরিক শাসন, পুলিশের জুলুম অথবা পশুশক্তির প্রয়োগ—মুষ্টিমেয়চালিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার হাতিয়ার না হইয়া কমিউনিস্ট একনায়কত্বের হাতিয়ার হইয়াছে বলিয়া উহারা আমার চোখে পবিত্র হইয়া ওঠে নাই।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত দেখিলাম আপনি লিখিয়াছেন: "হিংসার প্রয়োগ মূল নীতির অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা একটি অস্থায়ী বিশেষ ব্যাপার।" বুর্জোয়া ব্যবস্থার

জাতিরক্ষা বিভাগের কোনো মন্ত্রীও ঠিক এই কথা বলিবেন। উভয় ক্ষেত্রেই ইহা মিথ্যা। মানুষের প্রকৃতি যদি একখানি পরিষ্কার শ্লেট অথবা একখানি ব্লাকবোর্ড হয়—যাহার উপর এক টুকরা খড়িমাটি দিয়া যাহা খুশি লিখিতে পারা যায় এবং খুশিমতো মুছিয়া ফেলা যায়, একমাত্র তাহা হইলেই ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু জীবন্ত জীবদেহ অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়া তৈয়ারী, সামান্যতম ঘটনাও সেখানে দাগ রাখিয়া যায়; হিংসার দাগ কিছুতেই ওঠে না। এ-কথা স্বীকার করিতে হইবেই যে প্রত্যেক দেশের প্রকৃত বিপ্লবী সৈন্যদের মধ্যে 'সুবিচার ও স্বাধীনতার জন্য' যুদ্ধে গিয়াছিলেন এমন অনেক স্বাধীন-চেতা প্রাক্তন সৈনিক পাওয়া যায়। নাম এখন বদলাইয়াছে, আবার যে বদলাইবে না তাহার প্রমাণ নাই, কিন্তু মনোবৃত্তি তাহাদের আগের থেকে কম বিপজ্জনক নহে কারণ হিংসার পুরাতন অভ্যাসের উপর এক হিংসারই নূতন এক অভ্যাসকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে নূতনতর তীব্রতর হিংসার প্রতি মানুষ আসক্ত হইয়া উঠিবেই।

এই কথাটি স্মরণ করিয়াই আমি ক্লেরাঁবো-তে লিখিয়াছিলাম (এ মত আমার ক্রমেই দৃঢ় হইতেছে), "উদ্দেশ্য পবিত্র হইলে যে-কোনো উপায়ই পবিত্র, এ-কথা সত্য নহে। সত্যকার প্রগতির দিক হইতে উদ্দেশ্যের চেয়ে উপায়েরই গুরুত্ব বেশি।......" কারণ উদ্দেশ্য (উহা প্রায়ই সিদ্ধ হয় না, হইলেও অসম্পূর্ণভাবে হয়) মানুষের বাহিরের সম্পর্ককে পরিবর্তিত করে; আর উপায় ঘটায় মানুষের মনের রূপান্তর—ন্যায় অথবা হিংসার আঘাতে আঘাতে। লক্ষলাভের পথ যদি হিংসার পথ হয়, তবে কোনো গভর্ণমেণ্টই দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারকে রোধ করিতে পারে না।

তাই তো আমি নৈতিক সম্পদগুলিকে রক্ষা করা, বিশেষত বিপ্লবের দিনে রক্ষা করা, একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। বিপ্লবের যুগ পুরানো

পালক ঝাড়িয়া ফেলিবার যুগ, জাতির মনে পরিবর্তনের দাগ তাই এই সময়েই সব চেয়ে বেশি গভীর হয়।

তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কমিউনিস্ট আদর্শের সেবা আপনারা সব চেয়ে বেশি করিতে পারেন যদি কৃতকর্মের সমর্থন না করিয়া পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সহিত মন খুলিয়া আপনারা নিজেদের কার্যের সমালোচনা করেন। পার্টিতে কেবল একজন আছেন বিচারের স্বাধীনতাকে যিনি পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করেন। ইনি লেনিন। কিন্তু এই প্রবল প্রভাবশালী পুরুষ নিজেই মতান্ধতা ও ক্রেমলীন-প্রাচীরের সংকীর্ণতার (অর্থাৎ নিজের ক্ষমতার) মধ্যে বন্দী। তাহার চারিপাশে আইনের শুষ্ক লিপি ছাড়া আর কিছুই তো আমার চোখে পড়িতেছে না। কমিউনিস্টগণ, আপনারা স্বাধীন মানুষ হন। নিজের হাতে গড়া জিনিসটির সংশোধনের চেষ্টা কোনোদিন যেন আপনাদের শিথিল না হয়। ভুলকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিবার ও আদর্শকে অপপ্রয়োগের হাত হইতে রক্ষা করিবার দুঃসাহসের অভাব যেন কোনোদিন আপনাদের না হয়।

যতদিন আমি কোনো পার্টির মধ্যে সত্যের প্রতি এই অনুরাগ ও স্বাধীন সমালোচনার প্রতি সম্মান না দেখিব, যতদিন পর্যন্ত দেখিব ঐ পার্টি যে-কোনো উপায়ে, যে-কোনো মূল্যে লক্ষ লাভ করিতে চাহে, যতদিন দেখিব চিরন্তন ন্যায় ও কল্যাণের সহিত পার্টির স্বার্থের বিরোধ চলিতেছে; অর্থাৎ, এক কথায়, যতদিন বিপ্লবের সেবকগণ সংকীর্ণ এক রাজনৈতিক পরিসরের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্বাধীন বিবেকের পবিত্র দাবীকে 'উচ্ছৃঙ্খলাবাদ' অথবা 'ভাবালুতা' বলিয়া ব্যঙ্গ ও উপেক্ষা করিতে থাকিবেন, ততদিন সংগ্রামের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মোহমুক্ত হইয়া আমি দূরেই দাঁড়াইয়া থাকিব।

এই দূরে দাঁড়াইয়া থাকিবার অর্থ নিষ্ক্রিয় থাকা নয়। প্রত্যেকেরই কাজ আছে। আপনারা আশু বিপদ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন

(এ জন্য আমি আপনাদের প্রশংসা করি)। কিন্তু আমার মনে হয়, জগতের বর্তমান আলোড়নগুলি মানুষের প্রগতি-পথের এক সুদীর্ঘ সংকটের সূচনা মাত্র ; একটা ভাঙ্গা-গড়ার যুগের ভূমিকা। মনে হয়, সম্প্রতি জাতিগুলি যত আঘাত পাইয়াছে, তাহার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি আঘাত তাহাদের পাইতে হইবে। এই লৌহযুগের জন্য আমরা প্রস্তুত হইতেছি ; এ-যুগ চোখে আমরা দেখিব না জানি, কিন্তু আত্মিক শক্তি আমাদের একেবারে ধ্বংস হইবে না বলিয়া আশা করি। যাহারা আমাদের পশ্চাতে আসিতেছে তাহাদের জন্য যুক্তি, প্রেম ও বিশ্বাসের শক্তিকে বাঁচাইতে ও সংহত করিতে আমরা চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে এই সম্বল লইয়া তাহারা ঝড় কাটাইয়া উঠিতে পারে। আর সেদিন ক্ষণিকের কথা সমাপ্ত করিয়া আপনাদের কমিউনিস্ট বিশ্বাস ধ্বসিয়া পড়িবে (এই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য ক্ষমা করিবেন) সংগ্রামকালীন অন্যায় অবিচারের পাপের গুরুভারে, ধ্বসিয়া পড়িবে সেই ঔদাসীন্যের আঘাতে যে-ঔদাসীন্য একান্তভাবে রাজনৈতিক জয়লাভের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

আমাকে ভুল বুঝিবেন না, বারব্যুস। আমি আপনার সদৃশ, আপনার আন্তরিকতা, আপনার সর্বব্যাপী আদর্শনিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা করি। আমাদের দুজনের কর্মধারা পরস্পরবিরোধী নহে, পরস্পরের পরিপূরক। একই বিপ্লবের ধারাস্রোতে, মানুষের নবজাগরণের ও চিররূপান্তরণের একই তরঙ্গপ্রবাহে আমরা দুইজনেই ভাসিয়া চলিয়াছি। যে আলোর রশ্মি মাটি হইতে আকাশে উঠিতেছে তাহার পানে চাহিয়া আছি দুইজনেই ; যে-মৃত্যুর বেষ্টনী মানুষের জয়যাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, আমরা দুজনেই তাহা ভাঙ্গিতে চাহিতেছি। কিন্তু পুরাতন শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া সেখানে নূতন কঠিন শৃঙ্খল পরাইতে আমি চাহি না।

আঁরি বারব্যুসের সহিত 'চিন্তার স্বাধীনতা' লইয়া বিতর্ক

অতীতের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমি আপনার ও বিপ্লবীদের সাথে আছি। ভবিষ্যতের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে আমি ভবিষ্যতের অত্যাচারিতদের সঙ্গে থাকিব।

ইন তিরানর (সমস্ত অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে)—শীলারের এই বাণী চিরদিনই আমার ধ্রুবতারা।

রম্যাঁ রলাঁ

(আমি এখানে একটি পরিশিষ্ট যোগ করিতে চাহি। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে জনৈক রুশ-বিপ্লবীকে লিখিত একখানি পত্র হইতে ইহা উদ্ধৃত। পত্রখানিতে আমি বিপ্লবের সময় 'নৈতিক সম্পদগুলিকে' রক্ষা করিবার প্রয়োজনের উপর বিশষ গুরুত্ব আরোপ করি।)

"নৈতিক সম্পদগুলিকে সর্বদা রক্ষা করিতেই হইবে ; রক্ষা করিতে হইবে মানবতার স্বার্থে ও বিপ্লবের নিজের স্বার্থে। কারণ, ইহাদের যে-বিপ্লব উপেক্ষা করে—আজ হোক কাল হোক, পরাজয় তাহার ঘটিবেই। এ পরাজয় শুধু ঐহিক পরাজয় নহে, ইহার সঙ্গে আসিবে নৈতিক অধঃপতন। কারণ, 'যে-কোনো উপায়ের' অর্থ ই—সব চেয়ে বড় অস্ত্র, নৈতিক অস্ত্র খোয়ানো। আর যদি এ-বিপ্লব পরাজিত হয়, তবে যে সে শুধু যুদ্ধেই হারিবে তাহা নহে, তাহার সর্বস্ব যাইবে। 'চারিত্রিক গুণের উপর গণতন্ত্রের ভিত্তি'—মঁতেকিও-র এই বাণী যে কত গভীর তাহা প্রথম দৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। সত্য ও মানুষের বিবেকের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাই ইহার ভিত্তি। এই ভিত্তি শিথিল হইলে ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িবেই। কারণ, যদি পশুশক্তি, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাই গণতন্ত্রের ভিত্তি হইত, তবে ঐ তিনের প্রশস্ততর প্রয়োগক্ষেত্র তো রহিত অন্য শাসনব্যবস্থার মধ্যে। এই তিন পাপকে যদি বিপ্লব কাজে লাগাইতে চাহে, তবে ইহারা তিনে মিলিয়া বিপ্লবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবেই। তারপর যখন চরম আঘাত আসিবে, বিপ্লব দেখিবে তাহার আত্মদানের উৎস শুকাইয়া গিয়াছে ; আর আত্মদান ছাড়া তো বিপ্লব বাঁচিতে পারে না।…

আঁরি বারব্যুসের সহিত 'চিন্তার স্বাধীনতা' লইয়া বিতর্ক

আঁরি বারব্যুসের নিকট দ্বিতীয় পত্র

পারি, ২রা ফেব্রুয়ারি

প্রিয় বারব্যুস্,

আপনার পূর্ব প্রবন্ধে যে সংযম দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম এবারকার পত্রে তাহার কিছু অভাব দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। বিতর্ককালে যাহার সহিত মতবিরোধ হয়, তাহাকে তুচ্ছ করিয়া দেখা বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু এই পদ্ধতি অতিমাত্রায় আইন ব্যবসা-সুলভ। মজুরশ্রেণীর নামে যে-সকল কুসংস্কার প্রচলিত আছে, সেইগুলির সুযোগ লইবার চেষ্টা আমরা করিতেছি না। এই ধরনের কুসংস্কার জাতীয় কুসংস্কার অপেক্ষা কম নহে। বারব্যুস্, আজ আমরা যে-দুইজন পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছি তাহারা এমন দুইজন কর্মী যাহারা সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহারা বিপুল দুঃখ-দুর্দশার মূল্য দিয়া নিজেদের স্বাধীনতাকে ক্রয় করিয়াছে, যাহাদের দুইজনই সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। আমাদের কেহই ইহা অপেক্ষা কমও নহে, বেশিও নহে।

আপনাদের চিন্তাধারার সহিত যাহাদেরই মিল হইবে না, তাহারাই যে বিপ্লবের বাহিরে রহিয়াছে এইরূপ নির্দেশ দিবার কি অধিকার আপনার আছে? বিপ্লব কোনো দলবিশেষের সম্পত্তি নহে। যে-কেহ বৃহত্তর মহত্তর মানবোত্তর স্বপ্ন দেখিবে, বিপ্লবের প্রাসাদে তাহারই স্থান রহিয়াছে। আমারও তো তাই সেখানে স্থান রহিয়াছে। আমি শুধু সেখানে উপদলীয় আবহাওয়ায় বাস করিতে অনিচ্ছুক। অথচ এই আবহাওয়ার ভিতরেই বুর্জোয়াশ্রেণী ও কমিউনিস্টগণ আমাদের টানিতে চাহিতেছে। তাই আমি বাতায়ন খুলিয়া দিয়াছি। নিশ্বাস লইবার জন্য প্রয়োজন হইলে আমি কাচের জানালা পর্যন্ত ভাঙ্গিতে প্রস্তুত। কারণ, আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাহারা বিপ্লবের মধ্যে থাকিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অধিকার দাবী

করেন। অসঙ্গত মনে হইলেও, এই দাবী করিবার অধিকার তাহাদের আছে।

প্রথম পত্রের মতো এই পত্রে আমার নিজের কথা আর লিখিব না। কারণ এই বিতর্ক আরম্ভ হইবার পর আপনার বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ রলাঁবাদীদের মধ্য হইতে আমার আদর্শকে পৃথক করিয়া দেখিতে শুরু করিয়াছেন।

"রলাঁর রলাঁবাদে আপত্তি করিব না। কিন্তু রলাঁবাদীদের পক্ষে রলাঁবাদ সহ্য করা হইবে না।" এই বিশেষ সুবিধা আমি গ্রহণ করিতে চাহি না। প্রথমত, অতীতে যে-সকল অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছে সেইগুলি স্মরণ করিয়া এই বিশেষ সুবিধা আমাকে দেওয়া হইয়া থাকে। তবে এই কথাও মনে রাখিতে হইবে আরো অনেকেই আমার মতো অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন, নিজেদের সমস্ত ভবিষ্যতকে আন্তর্জাতিকতার আদর্শের পায়ে সঁপিয়া দিতে দ্বিধা করেন নাই এবং আজও তাহারা কৃতকর্মের ফলভোগ হাসি মুখে করিতেছেন। কিন্তু আজ আর বিশেষ সুবিধাভোগের প্রশ্ন নহে। আজিকার প্রশ্ন অধিকারের প্রশ্ন—চিন্তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ ও সম্পূর্ণ রাখিবার অধিকারের প্রশ্ন। এই অধিকার কোনো ব্যক্তিবিশেষের অধিকার নহে—সর্বসাধারণের অধিকার।

চিন্তাজীবীদের পক্ষে এই অধিকার শুধু অধিকার নহে, কর্তব্যও বটে। কারণ, যে-মতবাদ সহজ পথে বিপদ এড়াইয়া চলে তাহার কি মূল্য আছে? পার্টির মতবাদ, চার্চের মতবাদ, বিশেষ জাতের মতবাদ—নির্যাতনের বিভিন্ন উপকরণ। এই সকল আমরা খুব ভালোভাবেই চিনি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানুষের মন এই বাঁধন ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছে। এক এক করিয়া তাহারা থামিয়া পড়িতেছে। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও রাজতন্ত্রের বাঁধন খসিয়া পড়িয়াছে। আধুনিক ধর্মসংস্রবহীন গণতন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়-

গুলির বন্ধন, প্রাচীনতন্ত্র অথবা বিপ্লবের—কালো, সাদা, লাল—সব বিপ্লবের বন্ধন আমরা ছিঁড়িতে চাহি। বন্ধন ছেদনই আমাদের প্রথম কাজ।

বারব্যুস, আপনি কাজের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন—কাজ, যে-কোনো উপায়ে কাজ। মানুষকে তাহার বর্তমান দুর্গতি হইতে এবং ভবিষ্যতের আরো সাংঘাতিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার কথা আপনি লিখিয়াছেন। আপনার এই মনোভাবকে আমি শ্রদ্ধা করিঃ ঈশ্বর করুন এই মনোভাব সম্পর্কে নিরুৎসাহকর কিছু যেন কোনোদিন না বলি।

আমি নিজে কিন্তু অনুভব করিতেছি অন্য প্রয়োজন: প্রয়োজন—কল্পনার চোখে বাস্তবকে আমাদের মনের মতো করিয়া না দেখিয়া, জাগ্রত চোখে বাস্তবের প্রকৃত নগ্ন রূপকে চিনিতে পারা। পরিকল্পনা চমৎকার, যুক্তির বন্ধন কোথাও এতটুকু শিথিল নহে। কিন্তু এ শুধু কাগজের পরিকল্পনা,—বাস্তবের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। যাহাদের জন্য এই পরিকল্পনা কোথায় তাহারা? বারব্যুস, আপনি নিজে ও মুষ্টিমেয় আর কয়েক জন ছাড়া তো আমি কাহাকেও দেখিতেছি না। আপনি তো জানেন, ফ্রান্সের অগ্রণী নেতাগণের দিকে চাহিলে আশায় বুক ভরিয়া ওঠে না। আর জনগণ? তাহাদের ঘিরিয়া আছে একটি বিরাট উদাসীন আত্মম্ভরিতা; আর তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে হিংস্র ও নির্যাতিত এমন শক্তি যাহা সৃষ্টির কাজে লাগিতে চাহে না, ধ্বংস করিয়া ধ্বংস হইতে চায়। নিজেকে প্রতারিত করিবার শক্তি লইয়া আমি জন্মাই নাই; নিজেকে এ-কথা আমি বলিতে পারি না: "তুমি শুধু ইচ্ছা কর, তাহা হইলেই জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।" কারণ, আমি জানি জগৎ আজ পরিবর্তিত হইতে চাহে না।

পশ্চিম ইউরোপ যেন এক প্রকাণ্ড আহত পশু। সে তাহার ক্ষতস্থানগুলি

চাটিতেছে, কিন্তু রক্ত থামিতেছে না। নূতন ক্ষতের মধ্য দিয়া কি সে তাহার হারানো শক্তি ফিরিয়া পাইতে চাহে? কিন্তু আমার তো ভয় হয়, যেটুকু রক্ত এখনও তাহার শরীরে অবশিষ্ট আছে, নূতন ক্ষত হইলে তাহাও থাকিবে না। বিরাট বিপ্লবের মধ্যে যে প্রচণ্ড বিপুল শক্তি আছে তাহা আমি জানি এবং জানি বলিয়াই যে-সকল জাতি অবসাদে অসাড় ও প্রচণ্ড আলোড়নের সম্মুখীন, বিপ্লবের মধ্যে তাহাদের বাঁচিবার কোনো পথ আমি দেখি না। আমার মনে হয়, শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতারা আজ এই ভীষণ মনস্তাত্ত্বিক ভুলই করিতেছেন। জয়লাভ করিতে হইলে বিপ্লবকে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে ভবিষ্যতের জন্য প্রচণ্ড শক্তি; ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে জাতির বলদৃপ্ত স্বাস্থ্য ও হর্ষোজ্জ্বল আশার ঐশ্বর্যে। আজ ইউরোপের জাতিগুলি বিদীর্ণ রক্তাক্ত-দেহ কতক-গুলি নেকড়ের মতো বিধ্বস্ত রণক্ষেত্রের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; উহাদের কেহ কেহ মরিতে বসিয়াছে। ইহাদের নিকটে বিপ্লবের উপযোগী শক্তি স্বাস্থ্য ও আশা তো আমি প্রত্যাশা করিতে পারি না।

আপনি আমার বিরুদ্ধে নৈরাশ্যবাদের অভিযোগ আনিয়াছেন। কিন্তু গ্যুস্তাভ দ্যুপ্যাঁ-র কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমিও বলি, নৈরাশ্যবাদ যদি বাস্তবের মুখের দিকে চোখ মেলিয়া তাকাইতে পারে তবে তাহারও কিছু মূল্য আছে। কিন্তু যে-আশাবাদ মুখ ও মুখের উপরের তিক্ত বেদনার অশ্রুকে ঢাকিয়া রাখে তাহা সত্যই বিপজ্জনক। (হে আমার বিপ্লবী বন্ধু, যতোই তুমি তোমার দৃঢ় বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করিয়া তোলো, আমি যে তোমার চোখে অশ্রু দেখিতে পাইয়াছি)।

না, বারব্যুস, আমি নৈরাশ্যবাদী নই। কারণ, বর্তমানের অথবা আশু-ভবিষ্যতের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আমি আমার মনকে আবদ্ধ রাখি নাই। ইতিহাসের কল্যাণে, বৃহত্তর, ব্যাপকতর বিস্তৃতিকে আমি আমার দৃষ্টির

সীমানায় আনিতে শিখিয়াছি। আমি জানি পারি একদিনে তৈয়ারী হয় নাই; আমি জানি মানুষের ঐক্য এক শতাব্দীতে আসিবে না; কিন্তু সে-জন্য এ-ঐক্যে আমার বিশ্বাস এতটুকু কম নহে। এমন কি, এ-বিশ্বাস আমার বাড়িয়াছে, কারণ, সাময়িক ব্যর্থতায় আমার এ-বিশ্বাস তো টলাইতে পারে নাই। আমি আমার আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য অবিশ্রাম কাজ করিয়া যাইতেছি; হতাশার অন্ধকার একদিনের জন্যও আমার জীবনে আসে নাই।

আমি কি কাজের নির্দেশ দিই সেই প্রশ্ন লইয়া এইখানেই আপনি আমার জন্য ওত পাতিয়া বসিয়া আছেন।

বারব্যুস, মানুষের সমাজে বর্তমানে যে হিংস্র নিপীড়ন প্রচলিত রহিয়াছে তাহা আমাদের উভয়েরই শত্রু। কিন্তু সেই হিংসার বিরুদ্ধে এক বিপরীত হিংসাকে আপনারা অস্ত্র-সজ্জিত করিতেছেন। আমার মনে হয়, এই নীতির ফলে উভয় পক্ষই ধ্বংস হইয়া যাইবে। শত্রুর পথ লইয়াই যদি আপনি শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন তবে জার্মান ও ফরাসীদের যুদ্ধের মতোই এই সামাজিক যুদ্ধের অবসান হইবে আর এক ভের্সাইয়ে-র সন্ধিতে। কিন্তু ধ্বংস হইয়া যাইব আমরা সকলেই।

ধরিয়া লইলাম আমারই ভুল হইতেছে। তথাপি হিংসার অস্ত্র ছাড়া অন্য অস্ত্রপ্রয়োগের দাবীও তো আমি করিতে পারি।

প্রথম অস্ত্রের বিষয় আমি বিশদভাবে কিছু বলিব না। কারণ, ইহা আপনার আমার মতো বুদ্ধিজীবীদেরই বিশেষ অস্ত্র। অপরের কর্তব্যের কথা ভাবিবার পূর্বে মসিব্যবসায়ী আমাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন প্রথম শুরু করিতে হইবে। যুক্তিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে হইবে। ক্ষমতাধিষ্ঠিত শক্তির পক্ষে কাজটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া, বিচার করিয়া—সেই সম্পর্কে নির্দেশবাণী ঘোষণা করিতে হইবে।

ইউনিয়ন অব ডেমক্রেটিক কন্‌ট্রোল-এর আমাদের বীর বন্ধুগণ এই আত্মিক সংগ্রামই চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু এখানেই আমাদের থামিলে চলিবে না। ভল্‌তেয়র ও এন্‌সাইক্লোপিডিস্টদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদের হানিতে হইবে নিত্যই বিদ্রূপ, নিষ্ঠুর আঘাত ও তীব্র, তীক্ষ্ণ সমালোচনার শক্তি-শেল। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন তপ্তমস্তিষ্ক বিপ্লবী বাস্তিল দখল করিয়াছিল, রাজতন্ত্র পতনের জন্য তাহাদেরই চাইতে বেশি দায়ী ভল্‌তেয়র ও এন্‌সাইক্লোপিডিস্টগণ।

কিন্তু আরো শক্তিশালী অস্ত্রের সন্ধান আমি দিতে পারি। শুধু শক্তিশালী নহে—কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ সকলেই ইহাকে ব্যবহার করিতে পারে। অপর জাতি ইতিমধ্যেই ইহার উপযোগিতা প্রমাণ করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় আজ পর্যন্ত ফ্রান্সের কেহই এই অস্ত্রের কথা উল্লেখ করে নাই। এ্যাংলো-স্যাক্‌সনদের মধ্যে হাজার হাজার "বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধ বিরোধি-গণ" এই অস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন, এই মহাস্ত্র দিয়াই গান্ধী আজ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিতেছেন। গান্ধীর অস্ত্র—আইন অমান্য আন্দোলন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা আমি বলিতেছি না; কারণ; এই প্রতিরোধের চাইতে আর বড় প্রতিরোধ হয় না। পাপাসক্ত রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা অস্বীকারের মতো এত বড় বীরত্বের সংগ্রাম আধুনিককালে কেহ আর করে নাই। এই সংগ্রামে আপনাকে একাকী নিঃসঙ্গ দাঁড়াইতে হইবে বিশাল রাষ্ট্রের মুখোমুখি; অত্যন্ত সহজে, বিনা দ্বিধায় সেই রাষ্ট্র আপনাকে কারান্তরালে পঙ্গু করিয়া রাখিতে পারে। এই সংগ্রামে প্রয়োজন হইবে এমন শক্তি ও আত্মত্যাগের, এমন প্রেরণার, যাহা সকলের সাথে এক সঙ্গে মৃত্যুবরণের চাইতেও অনেক বেশি শক্তিশালী। এই নৈতিক শক্তির উৎস মানুষের হৃদয়—প্রত্যেক একক মানুষের। এই শক্তির উৎস সেই বিবেকের আগুন ও সেই সর্ব জীবে সংস্থিত

ব্রহ্মশক্তির ঐষী অনুভূতি, যাহা ইতিহাসের চরম ও পরম মুহূর্তে বৃহৎ জাতিগুলিকে মলিন মাটির বন্ধন হইতে তারকালোকের ঊর্ধ্বে উন্নীত করিয়াছে। কিন্তু এই জিনিসটি "আপনারা যথাযোগ্য বিবেচনা করিয়া দেখেন না।" (এই কথাগুলি আমি ব্যবহার করিতেছি কিছুটা বিদ্বেষের ভাব লইয়া; বিশ্বাস করুন বন্ধুভাবে ইহা করিতেছি; এই বিদ্বেষের সুর প্রথমে আপনার লেখাতেই পাই, আপনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে, আমাদের অন্তরের বিশ্বাসের প্রতি আপনাদের এই শ্রদ্ধার অভাব আমাকে এবং আমার অনেক সহকর্মীকে কতখানি আঘাত করিতে পারে।) সম্মিলিত শক্তির মোহ আপনাদের অতিরিক্ত মাত্রায় আচ্ছন্ন করিয়াছে; যদিও এই শক্তির ভীষণ আকর্ষণ সম্পর্কে আপনাদের কারো অপেক্ষা আমি কম সচেতন নহি। এই জন্যই সম্ভবত ব্যক্তিগত বিবেকের যথাযোগ্য মূল্য আপনারা দিতে চাহেন না, এবং মানিতে চাহেন না যে একান্তভাবে আত্মগত ব্যক্তিমানুষের মুক্ত দীপ্ত বিবেকই জগতের ভার ধারণ করিয়া আছে। এই বিবেকের শক্তির স্বরূপ স্পষ্টভাবে দেখিয়াছিলেন আপনাদের মধ্যে একজন—ইনি আপনার ও আমার উভয়েরই বন্ধু হতভাগ্য রেইমঁ-লেফেব্‌র্। বিপ্লবের বীর নায়কগণকে কেন্দ্র করিয়া ইনি এক ধরনের অতীন্দ্রিয়বাদী উপাসনাপদ্ধতি স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু একদিনে উহা হয় না। মানুষের মধ্যে গভীর পরিবর্তন আনিতে হইলে দুইটি মহান্ শক্তির আবশ্যক। প্রথমটি সম্পর্কে আমাদের মতভেদ নাই—ইহা আত্মদান। এবং এই আত্মদানের মধ্য দিয়াই একক মানুষের দ্বারা, আমাদের দ্বারা, পরিবর্তনের একটা রূপরেখা অঙ্কন সম্ভব হয়। পরিবর্তনের দ্বিতীয় শক্তি, সময়। বহু পুরুষের রক্ত ও যন্ত্রণা দিয়া মহাশিল্পী কাল মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনেন। কত পুরুষ ধরিয়া কত উজ্জ্বল, কত অজ্ঞাত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়াই না রোমের ভগ্নাবশেষের উপর নূতন খ্রীস্টান জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। আপনি কি মনে করেন যে, যে-বিপ্লবের লক্ষ কর্মীমানুষের

মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করা, সেই বিপ্লব সুসম্পন্ন হইতে আরো কম সময় লাগিবে ?

বন্ধুগণ, আপনাদের চেয়ে আমার বয়স বেশি বলিয়াই যেন আমার কথাগুলি অগ্রাহ্য না করেন। আমার অনুরোধ নিকট ভবিষ্যতের কীর্তিকে আপনারা এত বড় করিয়া দেখিবেন না। এই কীর্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা যেন একটি দিনও নষ্ট হইতে না পারে তজ্জন্য উৎকণ্ঠা আমার চেয়ে আপনাদের বেশি নহে। আমার সহকর্মিগণকে আমি যে-মনোভাব গ্রহণ করিতে বলি তাহা নিরাসক্তি ও বৈরাগ্যের মনোভাব নহে। ঠিক বিপরীত কথাই আমি বলি : "কখনও ঘুমাইয়া পড়িও না। কখনও আপোস করিও না। মিথ্যা ও অবিচারের সহিত কখনও রফা করিয়া ফেলিও না। এক এক করিয়া পুরানো দেবতাগুলিকে নিজ হাতে সরাইয়া দাও যাহাতে নূতন দেবতারা (ইহাদের মধ্যে মানবতাও রহিয়াছে) আসন গ্রহণ করিতে পারেন।" সাহস থাকে তো নিজেকে বলি দিন। স্বার্থত্যাগের সাহস কি আপনার আছে ? যদি থাকে তবে আত্মদানের জন্য প্রস্তুত হোন। আপনার দুঃখ যন্ত্রণা বৃথা হইবে না, এ-কথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। আগামী কয়েক শতাব্দীর জন্য আপনাকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে! লক্ষ্যের নিকটবর্তী হইতেছেন না বলিয়া কোনো অভিযোগ করা চলিবে না। আপনার জীবনী শেষ হইবার পরও অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত যে-কাজ চলিতে থাকিবে সেই কাজের একটা অংশ গ্রহণ করিয়া আপনি আনন্দ লাভ করুন। জীবিতকালে অমরত্ব লাভের ইহাই একমাত্র উপায়! ....বারবুস, আপনি যখন বলেন "ফ্রান্স আজ মরিতেছে—ও ইউরোপ বিপন্ন", আপনার কথায় আমার মন সাড়া দিয়া ওঠে। ফ্রান্স ও ইউরোপকে আপনি বাঁচান (আপনার কথার সঙ্গে সঙ্গে নিয়তির নির্মম কণ্ঠস্বরও আমার কানে আসে : "ইউরোপ প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ; ন্যায়ধর্ম আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেই।") মানুষ নিয়তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে তাহার শেষ সম্বলটুকু

খোয়াইয়া। অতএব বারব্যুস, থামিও না, তুমি যুদ্ধ করিয়া যাও। যাহা আমরা ন্যায় বলিয়া বুঝিব তাহার স্বপক্ষে ও যাহা অন্যায় বলিয়া জানিব তাহার বিরুদ্ধে, মুক্ত মানুষের মতো আমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে।

আপনার বিশ্বাসকে, আপনার সাহসকে, আপনার শৌর্যকে আমরা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনারা যাহা কিছু বিশ্বাস করেন তাহাই বিশ্বাস করিতে আমাদের বাধ্য করিবেন না; আপনারা যে-সকল কাজ করেন, সবকিছুই আমাদের দিয়া করাইতে চাহিবেন না। এই জোর করিয়া আদায় শুধু যে আমাদের কাছে অসহ্য হইবে তাহা নহে, একই লক্ষের অনুগামী প্রত্যেকের উপর একই কর্তব্য চাপাইয়া দিয়া আপনারা এক গুরুতর রাজনৈতিক ভুল করিবেন।

আর শেষ পর্যন্ত দেখিতে গেলে ইউরোপ ও ভবিষ্যতকে রক্ষা করিবার আজও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা। সকলেই যদি যুদ্ধ করে তবে শস্যভাণ্ডার পূর্ণ করিবে কাহারা? যে-সকল নূতন সামাজিক অন্ধবিশ্বাসের আজ আবির্ভাব হইয়াছে তাহাদের প্রভাবে সত্য ও সুন্দরের আদর্শকে এতটুকু ক্ষুণ্ন হইতে দেওয়া দূরে থাকুক, উহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করিয়া শিল্পী ও পণ্ডিতগণ যদি তাহাদের গবেষণা কার্য্য চালাইয়া না যাইতেন তবে আপনাদের বিপ্লবের গর্ভ হইতে যে-জগতের জন্ম হইতেছে সে-জগৎ কোন রূপ পরিগ্রহ করিত?

বারব্যুস, বিশ্বাস বেদনা ও সাময়িক সাফল্যের মধ্যে আজ যে-মানুষকে দেখিতেছি, সে তো মানুষের ক্ষণিকের খণ্ডিত রূপ: সে তো নিত্যকালের মানুষ নহে। আমার যে-সকল লেখকবন্ধু, বিশেষ করিয়া আপনি, যাহারা চিন্তাক্ষেত্রের অগ্রগামী সেনাবাহিনী বলিয়া নিজেদের প্রচার করেন, তাহাদের উদ্দেশে আমি এই কয়টি কথা বলিতে চাই:

আপনারা কি মনে করেন, ১৯১৪ সালের মতো ন্যায়ধর্মের সেনাবাহিনীতে এবং ১৯২২ সালের মতো সেনাবাহিনীতে যোগদান করা শিল্পী, বৈজ্ঞানিক

এবং চিন্তাজীবীদের বর্তমান কর্তব্য? আপনাদের কি মনে হয় না মানবতার, এমন কি, বিপ্লবের আদর্শের সেবার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা স্বাধীন চিন্তার অখণ্ড স্বাধীনতাকে রক্ষা করা? আপনারা কি মনে করেন না যে, বিপ্লব যদি ব্যক্তিস্বাধীনতার গভীর প্রয়োজনকে স্বীকার করিতে না চাহে তবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও ঐ স্বাধীনতা রক্ষা করা তাহাদের উচিত? কারণ এই প্রয়োজনকে বিপ্লব যদি স্বীকার করিতে না চাহে তবে বুঝিতে হইবে যে, নবজীবনের উৎসধারা তাহার শুকাইয়া গিয়াছে, বুঝিতে হইবে প্রতিক্রিয়ার সহস্র-মুখ দানব এক নূতন মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে।

রমঁ্যা রলাঁ

পুনশ্চ।—আপনার 'সামাজিক জ্যামিতি' সম্বন্ধে আরো দু-একটা কথা বলিব; আমার 'হাসি'তে আপনি বিরক্ত হইয়াছেন। সে-হাসির মধ্যে কোনো বিদ্বেষ ছিল না। আমি জানি, আপনার মতো এতবড় একজন শিল্পীকে কোনো বিশেষ নিয়ম-সূত্রের সংকীর্ণ নিগড় বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। যে নিয়মসূত্র আপনি ব্যবহার করিয়াছেন, আমি শুধু তাহারই বিপদ সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। নূতনভাবে যে ব্যাখ্যার আপনি আবার অবতারণা করিয়াছেন, বিপদের সম্ভাবনা তাহাতে বিশেষ কমে নাই।

আপনি লিখিয়াছেন: "অবাস্তব অনুমানগুলি যে ভঙ্গুর ও পরিবর্তনশীল সে-কথা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান স্বীকার করে, কিন্তু তাহাদের বাহিরে অভিব্যক্তি সমূহের মধ্যে যে শাশ্বত সম্পর্কগুলি বিজ্ঞান স্থাপন করে তাহা ভঙ্গুরও নহে এবং সহজে পরিবর্তিত হইবার জিনিসও নহে।" আপনার এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য।

আমাদের অনুভূতিগুলির কল্যাণে এই বাহিরের সম্পর্কগুলিকেই আমরা জানি, ইহাদেরই আমরা বলি ঘটনা। কারণ, বিশেষ কোনো একটি অখণ্ড বস্তুর ও তুলনার বিশেষ এক ভিত্তিকেই মাপকাঠি না করিয়া আমরা কিছু বিচার করিতে পারি না ও দেখিতে পারি না। এই অখণ্ড বস্তু ও তুলনার ভিত্তির রূপটি আমরা কোন স্তর হইতে জগৎ ও জীবনকে দেখিতেছি তাহার উপরেই নির্ভর করে। তাই বিজ্ঞান শুধু বাস্তব ঘটনারই সন্ধান রাখে এবং বিশেষ এক স্তরে জ্ঞানই সত্য।

কিন্তু আপনি বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিতে বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলীর সত্যতা আরোপ করিতেছেন। দুইটি পৃথক জিনিসকে আপনি এক করিয়া ফেলিতেছেন। যদি ঘটনা হইতে নিয়ম বাহির করা হয়, তবে তাহার অর্থ কতকগুলি মৌখিক অবাস্তব অনুমানের ভিত্তিতে গঠিত একটি বাস্তব-সংযোগহীন কাঠামোকে কতকগুলি ঘটনার উপর চাপাইয়া দেওয়া, বস্তুত কোনো একটি নিয়ম স্থাপন করিবার অর্থ কতকগুলি বিশেষ ঘটনাসমষ্টি হইতে কতকগুলি বিশেষ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া, যাহাতে বাকী সম্পর্কগুলিই শুধু গণনার মধ্যে আসিতে পারে। এই ছাঁটাই স্বেচ্ছাকৃত হইলেও অন্যায় নয় এবং বাস্তব জগতের সংযোগে আমাদের মস্তিষ্কই এই কার্য সমাধা করে।

অতএব এ-কথা বলা চলে না যে "স্থিতি, কাল ও বস্তুর মূল প্রকৃতি সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদ যাহাই হউক না কেন পদার্থবিষয়ক বা রাসায়নিক নিয়মের বাস্তবতা তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় না।" আইনস্টাইনের মতবাদের ফলে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ও পদার্থের তেজোশক্তির সমস্ত নিয়মই পরিবর্তিত হইয়াছে। আপনি কি বলিতে চান এই পরিবর্তন বাস্তবতাকে স্পর্শ করে নাই? নিয়মের বাস্তবতার অর্থ কী? প্রকৃতিতে কোনো নিয়ম নাই—সে শুধু আমাদের মধ্যেকার বিভিন্ন ঘটনার সম্পর্কের নির্দেশ দেয় মাত্র। আর আমরা, শুধু আমরাই, নিয়মের জন্ম দিই। আপনি যদি মনে করেন প্রকৃতির পুঁথির

মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলির বাস্তব অস্তিত্ব রহিয়াছে, তবে হে বারব্যুস, আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি একজন অতীন্দ্রিয়বাদী হইয়া উঠিয়াছেন।

কিন্তু ইহাই সবচেয়ে গুরুতর বিষয় নহে। এইমাত্র যাহা লইয়া আলোচনা করিলাম আপনার প্রবন্ধে সেই প্রসঙ্গেরই অব্যবহিত পরে নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিয়া আপনি আপনার যুক্তি শেষ করিয়াছেন।

"ইহার অতিরিক্ত আমি কিছুই বলি নাই, এবং এইটুকুই আমি আবার বলিতেছি। এবং শুধু তাহাই নহে, সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যে যে ঐক্যের সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা, সে ধারণাও আমার অটুট রহিল"।

এখানে আপনি এক পদবিক্ষেপে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হইতে ফলিত বিজ্ঞানে যাইতেছেন এবং অতিরিক্ত বিশ্বাসের বশে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে আপনি যে-সত্য আরোপ করিয়াছেন সেই সত্যকেই ফলিত বিজ্ঞানে আরোপ করিতেছেন।

ধরা যাক পদার্থ জগতের (সবচেয়ে নিখুঁত) নিয়মগুলি বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণরূপে খাপ খাইয়া যায়। উহাদের একটিকে যখন আমরা প্রয়োগ করি তখন আমাদের প্রয়োগক্ষেত্রে ঐ নিয়মের বহির্ভূত সর্বপ্রকারের ঘটনা ও আন্দোলনকে আমরা নগণ্য বিবেচনা করি।

অতএব আর একবার আমরা বাস্তবতা-সংযোগহীন একটি নিয়মকে গ্রহণ করি। এই গ্রহণ যুক্তিহীন নহে, কিন্তু ঐ নিয়ম বাস্তবক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে বিশেষ অবস্থায় উহাতে কিছু ভুল থাকিয়া যাইবেই (পরীক্ষাকালীন ভুলের কথা ছাড়িয়াই দিলাম)।

অতএব যখন হঠাৎ দ্বিতীয়বার আর এক লাফে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা হইতে সমাজবিজ্ঞানে গিয়া উপস্থিত হই, তখন আর কি বলিব। জীবন্ত প্রাণীকে বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার উপর পদার্থশাস্ত্র ও রসায়নের নিয়মগুলি প্রয়োগ করাই যখন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার তখন জীবন্ত প্রাণীদের

উপনিবেশগুলির উপর কেমন করিয়া ইহাদের প্রয়োগ চলিতে পারে? মনস্তাত্ত্বিক বিষয় সেখানে যে-বিরাট ভূমিকার অভিনয় করে তাহার স্বরূপ আজও আমরা জানিতে পারি নাই। পৌনঃপুনিকতার নিয়মগুলি (Laws of Frequency) অর্থাৎ মোটামুটি যতটা সম্ভব ভুল সংশোধন ব্যতীত সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা আর কিছু করিতে পারি না।

আর সম্ভাবনার নিয়মাবলী ছাড়া (Calculas of Probability) অন্ত কোনো গাণিতিক নিয়ম আমরা বর্তমানে সামাজিকক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারি না।

"সামাজিক জ্যামিতি" হইতে আমরা এখনও বহু দূরে রহিয়াছি।

প্রিয় বারব্যুস, আমার ধারণা এক অটল বিশ্বাস আপনার জীবনের মূল ভিত্তি। আমার মুখ-নিঃসৃত এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই সমালোচনা নহে। আমারও জীবনের ভিত্তি এক অটল বিশ্বাস। ভালোর জন্য হউক, কি মন্দের জন্য হউক, জানি না, আমার দেবতা ও আপনার দেবতা আজ গণতন্ত্রের রথের চাকায় বাধা। আপনার দেবতা সাম্য, আমার দেবতা স্বাধীনতা। রাসিনের সেই বৃদ্ধার মতো আমিও বলিঃ "এ-দুই দেবতাই শক্তিমান।" কিন্তু সব সময় তাহারা মনের মিল রাখিয়া চলে না। আসুন তাহাদের মধ্যে আমরা সঙ্গতি স্থাপন করি। আর আমার আপনার দেবতার মধ্যে যদি বিরোধের অবসান নাও হয়, তবু আসুন আমরা করমর্দন করি।

আর. আর

বিপ্লব ও বুদ্ধিজীবিগণ

কয়েকজন কমিউনিস্ট বন্ধুকে লিখিত পত্র

মার্চ, ১৯২২ সাল

ক্লার্তের শেষ সংখ্যায় বারব্যুস্ আমার দ্বিতীয় পত্রের জবাব দিয়াছেন। আমার পত্র লা'র লিব্‌র্-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই

সুদীর্ঘ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পত্রে বারব্যুস্ কোনো নূতন যুক্তির অবতারণা করেন নাই বলিয়া আমি তাহার কোনো জবাব দিই নাই। কারণ, উভয় পক্ষই যখন নিজ নিজ বিশ্বাসে অটল তখন অনন্তকাল এই বিতর্ক চালাইয়া যাইতে আমার ইচ্ছা নাই। মস্তিষ্কের এই সৌজন্যপূর্ণ সংগ্রাম বন্ধ করিয়া আজ আমি বারব্যুসের প্রতি সহকর্মীর সহানুভূতি জানাইতেছি। আমার দিক হইতে বলিতে পারি, মতবিরোধ সত্ত্বেও আমাদের বিতর্ক জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল; আর এ-মতবিরোধকে মুছিয়া ফেলা যাইবে না।

এখানে যাহা লিখিতেছি তাহা বারব্যুস্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা নহে; ইহা আমাদের কয়েকজন কমিউনিস্ট বন্ধুকে লেখা। লা'র লিব্‌র্ কর্তৃক পরিচালিত বিতর্কে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই বন্ধুগণ তিক্ত ও রুক্ষ বিদ্রূপের সুরে তাহাদের নিজেদের কাগজে এই বিতর্কের জবাব দিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে একজন আমার একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সহকর্মী।

পত্রিকার ২৫শে মার্চ সংখ্যায় 'বুদ্ধিজীবিগণ ও বিপ্লব' নামক প্রথম প্রবন্ধে তিনি এই বিতর্ক সূত্রপাত হইতে দেখিয়া তাহার নিকট আমি যে ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে স্মরণ রাখা ভালো ক্লার্তে-র (৩রা ডিসেম্বর ১৯২১ সাল) একটি প্রবন্ধ হইতে এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়। আমার তখনই মনে হইয়াছিল মুক্তচেতা ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের ও বিপ্লবী সাম্যবাদের মধ্যকার যে বিভেদ এতদিন গোপন ছিল, এই বিতর্কের অনিবার্য ফলস্বরূপ তাহা এবার প্রকাশ্য দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করিবেই। আমাদের সাম্যবাদী বন্ধুটি এই বিভেদ স্বীকার করেন; তথাপি যে সকল স্বাধীনচেতা চিন্তাজীবী কমিউনিস্ট মতবাদ সম্পর্কে স্পষ্টভাষায় ও মুক্তকণ্ঠে আপনাদের অভিমত

ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কে তিনি আজ লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাহার লেখার মধ্যে বিদ্বেষ ও আঘাত হানিবার মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট।

তাহার সম্পর্কে ঠিক এই মনোবৃত্তির ভয়ই আমি করিতেছিলাম। যখন দেখি অন্তরঙ্গ বন্ধুরা, বহু-দুর্দিনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ সঙ্গীরা ও শ্রদ্ধাস্পদ লেখকেরা কোনো এক বিশেষ স্থানে আসিয়া তাহাদের মত ও পথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন আমার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও বন্ধুত্বের কল্যাণকামনা লইয়া আমাকে কি করিতে হইবে? আমাকে সন্ধান করিতে হইবে বন্ধুদের নূতন অভিযানের পশ্চাতে কোন কোন গুরুতর কারণ রহিয়াছে; এবং সন্ধান করিয়া যদি দেখি সে কারণগুলি ভুল তথাপি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের মতের মধ্যে এমন কোনো সত্যের অংশ আছে কিনা যাহা গণনার মধ্যে গ্রহণ করিলে কল্যাণ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রতিবাদিগণ ঠিক বিপরীত পথ গ্রহণ করিলেন। আমাদের পক্ষে এই বিতর্কের যে কতখানি মর্মান্তিক গুরুত্ব রহিয়াছে তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তাহারা আমাদের উপর অভিসন্ধি আরোপ করিলেন।

কমিউনিস্ট বন্ধুগণ, আপনাদের বিপ্লবের সহিত আমাদের বিচ্ছেদের কারণ ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া আমরা খুব উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া কি আপনারা মনে করেন? আপনাদের বিপ্লব বলিতেছি কারণ সত্যকার বিপ্লব হইতে কোনো স্বাধীনচেতা মানুষই বিচ্ছিন্ন নহেন, সেখানে প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে বাঁচিবার সুযোগ রহিয়াছে। যে-বিপ্লবের প্রতিনিধিত্ব আপনারা করিতেছেন যদিও তাহার উপর অনেক ভরসা রাখি তথাপি বড় বেদনার সহিত তাহা হইতে আমাদের বিচ্ছেদকে স্বীকার না করিয়া পারি না। কিন্তু এত কথা কেন আপনারা আমাদের বলিতে বাধ্য করিতেছেন? প্রথম আঘাত তো আমরা হানি নাই, আমরা

আহূত হইয়াছি। আপনাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা চিন্তার স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতেছি মাত্র। আমরা চিন্তাজীবীরা এই প্রতি-আক্রমণ না করিয়া যদি কোনো রাজনৈতিক দলের পায়ে চিন্তার স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতাম তবে আত্মধিক্কারে আমরা আর মাথা তুলিতে পারিতাম না।

আমাদের বলা হইয়াছে, চিন্তার স্বাধীনতাকে যদি রক্ষা করিতে হয় তবে চিন্তার স্বাধীনতার পরিপন্থী সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবলম্বিত সব কিছুকেই আমাদের সমর্থন করিতে হইবে। ইহা কু-যুক্তি। স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা হরণকারী স্বেচ্ছাচারকে সমর্থন করিবার যুক্তি কু-যুক্তি ছাড়া আর কি হইতে পারে। Et propter vitam vivendi perdere causas.

আপনারা বলেন এ অত্যাচার অস্থায়ী। আজ যখন দেখিতেছি অবিচার ও অসহিষ্ণুতা বিপ্লবীদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তখন এ অস্থায়িত্বের কি প্রতিশ্রুতি আপনারা দিতে পারেন? কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব জয়লাভের পর তাহাদের চোখ খুলিবে! জয়লাভ কাহারো চোখ খুলিয়া দেয় না, অন্ধকে আরো অন্ধ করিয়া তোলে মাত্র।

অস্থায়ী মিথ্যার কথা যেন আমরা আর না বলি। চিন্তাজীবী মানুষের পক্ষে প্রশ্নটি এইরূপ দাঁড়ায়! সে যাহা চিন্তা করে তাহাই বলিবে, না মিথ্যাভাষণের আশ্রয় লইবে? (এই প্রবঞ্চনা মিথ্যাভাষণেরই নামান্তর)। যদি মিথ্যার আশ্রয়ই সে গ্রহণ করে তবে তাহার আর রহিল কি! পারি, রোম কি মস্কো—কারো নির্দেশই চিন্তার স্বাধীনতা মানিয়া চলে না। সাম্যবাদী বিপ্লব যদি বিশ্বাস করে যে, সে মানবতার স্বার্থের সেবা করিতেছে তবে চিন্তার স্বাধীনতাও বলিবে সেও তাহার মতো ওই একই কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সাবধান, এ-দুইয়ের মধ্যে যেন

সংঘর্ষ না বাধে। সংঘর্ষ যদি বাধে তবে ক্ষতি শুধু চিন্তার স্বাধীনতারই হইবে না।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মনাৎ ও মার্শেল মার্তিনে-র সঙ্গে বন্ধুভাবেই আমার কথা হইতেছিল। আমারা পরস্পরকে বুঝি না বলিয়াও আমার মনে হইল না। আমি তাহাদের দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম হিংসা ও চিন্তার স্বাধীনতার যুগল সমস্যা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব কেমন করিয়া তাহার আদর্শের ক্ষতি করিতেছে, মস্কোর বাস্তববাদিগণের বাস্তবতা কত অগভীর।

আমি জানি কি ভীষণ দায়িত্ব তাহাদের বহন করিতে হইতেছে। কি অদম্য শক্তি লইয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ পৃথিবীব্যাপী শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের সম্পদ রক্ষা করিতেছে। এই মর্মান্তিক দৃশ্যের মহিমা আমাদের চেয়ে বেশি আর কে বোঝে। তাহাদের সম্মুখে আজ চরম দুর্দিন—বহু সাংঘাতিক বিপর্যয়ের একত্রিত গুরুভারে তাহারা অবনত। প্রকৃতিও যোগ দিয়াছে শত্রুর সহিত, সেখানেও তাহাদের অমানুষিক সংগ্রাম। এ অবস্থায় যত বড় দৃঢ় শক্তিমান মানুষই হউক না কেন তাহার মনে হইবে সহনশীলতার শেষ সীমায় আসিয়া শক্তি তাহার ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। এই মানুষদের মধ্যে যদি মাঝে মাঝে সংযমের অভাব দেখি তবে তাহাদের দুঃসহ দুর্দিনের কথা স্মরণ করিয়া কে তাহাদের তিরস্কার করিবে? তাহাদের ভুল ভ্রান্তিতে ও হিংসাত্মক কার্যে কে বিস্মিত হইবে। আমরা তো অমানুষিক মানবতাপ্রেমিক নহি। যে-আদর্শের পূর্ণ চরিতার্থতা অসম্ভব, সে-আদর্শ তো আমরা কাহারও নিকট হইতে চাহি না। মানুষকে আমরা মানুষের মতোই দেখি। ত্রুটি বিচ্যুতিতে অসম্পূর্ণ মানুষই আমাদের চোখে সম্পূর্ণ মানুষ।

কিন্তু দোষকে যেন আমরা কোনো মতেই গুণ বলিয়া গ্রহণ না করি। আমরা শুধু এইটুকুই স্বীকার করিতে চাহি না যে, এই ত্রুটি বিচ্যুতির উপর

একটি নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে। অঘটনকে আমরা কীর্তি বলিয়া জাহির করিবার বিরোধী। আমরা এমন কিছুকে সমর্থন করিতে চাহি না যাহা হিংসাত্মক নীতির পথ প্রশস্ত করে; অথচ এই ধরনের সমর্থনই করিতেছেন আপনারা ও আপনাদের মস্কোর আদর্শ পুরুষেরা। জানি আপনাদের এই মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে কোনো কোনো আদর্শবাদীর বিবেক যে বিদ্রোহ করিয়াছে তাহাতে আপনাদের কোনো পরিবর্তন হইবে না, কিন্তু পরম "বাস্তববাদী" হইয়াও এ-কথা কি আপনারা বুঝিতেছেন না যে অতি-অনুভূতিশীল তাপমান যন্ত্রের মতোই ওই বিদ্রোহী বিবেকই পূর্ব হইতেই যুগের মানসিক অবস্থার নির্দেশ দিতেছে? আপনারা কি জানেন না যখন কোনো বিপদ্-সংকুল স্থান উত্তীর্ণ হইবার সময় আসে তখন ভবিষ্যত আবহাওয়া সম্পর্কে সচেতন হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ? সু-উচ্চ পর্বত আরোহণ করিতে গিয়া যদি কোনো অতল গহ্বরের মুখে আসিয়া কেহ দাঁড়ায় তখন বজ্রগর্ভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডগুলিকে উপেক্ষা করিলে মঙ্গল হয় না।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আপনারা ইউরোপের উদারনৈতিক ব্যক্তিদের মতবাদকে "পাশবিক হিংস্রতার" সহিত আক্রমণ করিয়া আসিতেছেন। ফল কি হইয়াছে? জেনোয়া সম্মেলনের পূর্বাহ্নে বিপ্লবী সোশালিস্টদের সম্প্রতি যে বিচার হইয়া গেল তাহাতে যে অট্টরোলের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কথা একবার ভাবুন। বিষয়টি কতখানি সমর্থনের যোগ্য সে বিষয়ে কোনো মত আমি ব্যক্ত করিতে চাহি না। সমস্ত দলেরই রাজনৈতিক সংবাদপত্রগুলির মধ্যে মিথ্যা এত গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, অভিযুক্তগণ দোষী কি নির্দোষ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার সাহস আর আমাদের নাই। আমাদের আছে বড় জোর সন্দেহ ও উদ্বেগ। এই উদ্বেগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মস্কোর শত্রুরা ইউরোপে এমন সুষ্ঠু ও সফল প্রচারকার্য চালাইয়াছে যে কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি সত্ত্বেও আনাতোল ফ্রাঁসের মতো বিজ্ঞ ব্যক্তি সোভিয়েট

গভর্ণমেণ্টকে তিরস্কার করিয়া মস্কোতে তারযোগে এক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিক-বিরোধীরা সেই বাণীটিকে শানিত অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছে।

এই কি আপনাদের হিংসাত্মক নীতির সময়োপযোগিতা? হিংসাত্মক নীতিকে যাহারা সময়োপযোগী বলিয়া প্রচার করেন, বিরুদ্ধ মতকে তাহারা "প্যাতি বুর্জোয়া ভাবালুতা" বলিয়া মনে করেন। নামে কি আসে যায়? ভাবালুতা যদি জগতের একটি সক্রিয় শক্তি হয় তবে তাহাকে উপেক্ষা করা বাস্তববাদিতার পরিচয় নহে। সত্য কথা বলিতে গেলে এই হিংসাত্মক নীতি এবং সর্বোপরি এই নীতির গুণকীর্তনের অক্ষম প্রচেষ্টার অনিবার্য ফলস্বরূপ বারট্রাণ্ড রাসেল, জর্জ ব্রাঁদ ও অতীতের আনাতোল ফ্রাঁস প্রমুখ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল চিন্তানায়কগণ রুশ-বিপ্লব হইতে সরিয়া গিয়াছেন; যেমন ফরাসী-বিপ্লবের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড দেখিয়া বিপ্লব হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরীজ ও শীলারের মতো লোক। এই সব ব্যক্তিকে আপনারা গণনার মধ্যে যদি নাও আনেন তথাপি ইহাদের সমর্থন হারানোর অর্থ এমন বিরাট নৈতিকশক্তির সমর্থন হারানো জনজীবনের উপর যাহাদের প্রভাব অপরিসীম। আমার মতে ফরাসী বিপ্লবের পতনের কারণগুলির মধ্যে ইহাও একটি। রুশ-বিপ্লবকে এ-বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। হৃদয়ের শক্তিকে যাহারা উপেক্ষা করে তাহাদের ভাগ্যে অশেষ দুঃখ রহিয়াছে।

মনের স্বাধীনতার প্রশ্নের সহিত আমি হিংসার প্রশ্ন অপেক্ষাও বেশি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এখানে আমি আমার নিজের মাটিতে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে পারি। আমি বলিতে চাই, এই আদিম সহজাত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া যে-কোনো শক্তির পক্ষেই গুরুতর ভুল। নয়া মার্কসবাদী বস্তুবাদের আবরণের দৃষ্টি একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেলেই

মানুষ আত্মার দাবীর মধ্যে বুর্জোয়া স্বার্থ ও স্বতন্ত্রবাদী স্বার্থপরতা ঢাকিবার বিপুল প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু দেখিতে পারে না। চিন্তার স্বাধীনতা মানবতার একটি মৌলিক শক্তি, ইহাকে জোর করিয়া কিছু করান যায় না। ইহাকে নির্যাতন করিলে অবশ্য আপনি ঝুঠা বুদ্ধিজীবীদের, সিদ্ধি-সর্বস্ব প্রতারকদের এবং কারবার-সর্বস্ব কাপুরুষদের বাহাবা পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নির্যাতনের মুখে বীরের মতো দাঁড়াইবেন, প্রয়োজন হইলে শহিদ হইবেন তাহারাই যাহারা প্রকৃতই চিন্তাজগতের মানুষ। কারণ, তাহাদের দলিত বিশ্বাসের মধ্য হইতে জ্বলিয়া উঠিবে এক নূতন বিশ্বাসের অগ্নিশিখা। অতএব ভাবিয়া দেখুন। আগুন লইয়া খেলা করিবেন না। এ আগুনে আপনি নিজে পুড়িবেন। একখানি মাত্র পুঁথির নির্দেশে চালিত হইয়া যিনি প্রকৃতির উপর আপনার অন্ধবিশ্বাসকে চাপাইয়া দিতে চান তিনি নিশ্চয়ই বিজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞ নহেন। প্রকৃতির মধ্যে বহু বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী যে সকল বস্তু রহিয়াছে তাহাদের আবিষ্কারের জন্য তাহাকে সচেষ্ট হইতে হইবে, বুঝিতে হইবে সে সকল বস্তুর প্রকৃতি, বিরোধিতার মধ্যেও মিলন ঘটাইতে হইবে তাহাদের।

আপনাদের দলের উগ্র নবদীক্ষিতদের অনেকেই মার্কসীয় নিয়মাবলীর শিলালিপি হইতে পাঠ গ্রহণ করিয়া আমাদের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করেন, বলেন এ-বিরোধিতা নাকি একেবারেই নেতিবাচক। তাহাদের ধারণা, তাহাদেরই সমাধানপদ্ধতি যখন একমাত্র ও সুগঠিত মতবাদ, তখন তাহার পায়ে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নাই। কিন্তু প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে চাই অরণ্যে পথ হারাইলে কেহ যদি আমাকে এমন পথের সন্ধান দেয় যে-পথ আমাকে এক জলাভূমির মধ্যে লইয়া যাইবে, তখন কি আমি অন্য কোনো পথের সন্ধান জানা নাই বলিয়া সেই পথেই চলিব? বিপথ বলিয়া এই পথটিকে চিনি বলিয়াই এ-পথে চলিতে

আমি চাহি না, সহিষ্ণুতার সহিত অন্য পথের সন্ধান করিতে চাহি।

এই অন্য পথের সন্ধান আমরা আজও পাই নাই বটে কিন্তু কোনদিকে ইহার সন্ধান করিতে হইবে তাহা আমরা জানি। আমাদের সংগ্রাম যে শুধু নেতিবাচক এ-কথা সত্য নহে। এই সংগ্রামের ফলে আমরা এমন একটি বিপুল সত্যের সন্ধান পাইয়াছি যে-সত্যকে আপনাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা উপেক্ষা করে: মানুষের প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে যে একাধিক বিভিন্ন ব্যবস্থা একত্রে রহিয়াছে এ-কথা আমরা জানিয়াছি। "সামাজিক সমস্যার তিনটি দিক" নামক কৌতূহলোদ্দীপক পত্রিকায় রুডল্‌ফ্‌ শ্‌টাইনের দেখাইয়াছেন তিনটি ব্যবস্থা (মস্তিষ্ক, শ্বাসপ্রশ্বাস ও পরিপাক) লইয়া মানুষের দেহ গঠিত, এই ব্যবস্থা তিনটি পাশাপাশি থাকিয়া কাজ করে বটে কিন্তু কেহ কাহারো অধীন নহে। সমাজদেহকেও তিনি এমন তিনটি ভাগে ভাগ করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন যে-তিনটি ভাগ অনায়াসে পরস্পরের সহিত সহায়তা করিবে! অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন (ইহার পরিচালনাভার বিশেষভাবে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকিবে) এবং পরিশেষে চিন্তার জীবন। শেষোক্তটির মধ্যে থাকিবে ব্যক্তি-মানুষের দেহ ও মনের স্বাভাবিক গতি যেদিকে সেই দিকের আলোচনা এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজদেহের সর্বপ্রকার সম্পর্কের বিষয়।

এই ব্যবস্থাকে এখানে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। ব্যবস্থা বলিয়াই ইহার মধ্যে ত্রুটি রহিয়াছে এবং যে-ব্যবস্থার পরিবর্তে ইহাকে প্রবর্তন করিবার কথা উঠিয়াছে তাহার মতোই ইহা অসম্পূর্ণ। এ-ব্যবস্থায় আমি খুশি নই, কিন্তু ইহার একটা ভালো দিক হইতেছে এই যে, মার্কস্‌বাদী গোঁড়ামীর সংকীর্ণতাকে ইহা প্রসারিত করিতে পারে এবং সমাজ নির্মাণকারীদের মতবাদের মধ্যে কিছুটা জীবনের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য

প্রবেশ করাইতে পারে। এই বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিপ্লবী মতবাদ আজ যথেষ্ট সচেতন নহে। অর্থনৈতিক বস্তুবাদে ইহার দিগন্ত বড় বেশি সীমাবদ্ধ। যান্ত্রিক পদ্ধতি ও ধনতন্ত্রের বিপুল গতিবেগ সমন্বিত বিবর্তন তাহাদের সমস্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মানুষের মনের মহাবিবর্তনকে তাহারা দেখিতে পায় নাই।

এনসাইক্লোপিডিস্টদের আত্মতুষ্ট যুক্তিবাদ, এমন কি, ওগুাস্ত কঁৎ-এর পজি-টিভিজ্‌ম্‌কেও আমরা ছাড়াইয়া আসিয়াছি। মন আজ প্রকৃতির শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমাদের বিপ্লবীরা ইহা লইয়া বেশি মাথা ঘামান না। তাহাদের ঘড়ি ও আমাদের ঘড়ির কাঁটা এক স্থানে নহে। তাহারা চাহিতেছেন এমন এক ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক একক ব্যবস্থা যাহা অন্য সমস্ত দেহাংশকে গ্রাস করিবে অথচ উহাদের ছাড়া সমাজ-দেহের সমস্ত গতিই থামিয়া যাইবে। এই সমস্ত দেহাংশের সব চেয়ে মূল্যবান অংশ, মানুষের অগ্রগতির সব চেয়ে বড় হইতেছে মন। মন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ। ইহা নিজের নিয়মে চলে। মানুষের সাধারণ জীবনের সহিত সহযোগিতা করিয়াও ইহা আপনার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সব সময়ে রক্ষা করিয়া চলে। সহকারী শক্তিগুলির স্বাধীন বিকাশের মধ্যেই ভবিষ্যতের বিপ্লবের পথ খুঁজিতে হইবে। কিন্তু যদি তুমি উহাদের প্রত্যেককে তাহার স্ব স্ব স্থান ছাড়িয়া না দাও তবে আহত প্রকৃতি তোমার বিরাট অথচ ভঙ্গুর নির্মাণকার্যকে ধ্বংস করিয়া আপনার অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলিবে।

পারি,

মার্চ, ১৯২২

ফ্রান্স ও জার্মানির মিলনের উদ্দেশ্যে

লণ্ডনের পি. ই. এন ক্লাবের উদ্দেশ্যে (আন্তর্জাতিক লেখক সঙ্ঘের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য)

১লা মে, ১৯২৩

একটি অপ্রীতিকর ঘটনা এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের গুরুত্ব কমাইয়া দিয়াছে এবং ইহার রূপও বিকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মহাদেশস্থিত একটি বিশেষ দল, সি ই বি, (বেলজিয়ান লেখক সঙ্ঘ) বিশেষ ক্ষমতাবলে জার্মান শাসনকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে।

ফ্রান্সের পক্ষ হইতে, পি. ই. এন-এর কেন্দ্রীয়শাখার পক্ষ হইতে আমি জানিতে চাই সকলপ্রকার রাজনৈতিক সংকীর্ণতার বাহিরে ও উর্ধ্বে চিন্তাজগতের সার্বজনীনতা রক্ষা করাই পি. ই. এন-এর উদ্দেশ্য কিনা। ইহা কি স্পষ্টত, প্রকাশতঃ এবং সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক কথাটি এখানে "আন্তঃ মিত্রশক্তি" অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছে? যদি ওই অর্থেই ব্যবহার করা হইয়া থাকে, মস্তিষ্কজীবীদের বিশ্বসঙ্ঘের এই ধরনের কোনো সীমা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে আমি উহার মধ্যে থাকিতে চাহি না। রাজনীতির উন্মাদ স্বেচ্ছাচারের পায়ে আমি আমার চিন্তার স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে পারি না।

আপনারা হয় তো বলিবেন কোনো জাতিকেও বাদ দেওয়া হয় নাই, বাদ দেওয়া হইয়াছে ওই জাতির কয়েকজন প্রতিনিধিকে। বাদ দেওয়া হইয়াছে কাহাকে? গেরহার্ড হাউপ্ট্মান। তাহার অযোগ্যতার কারণ কি?

৯৩ জনের ইস্তাহার! এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর দানের জন্য তিনি নাকি আজও অনুশোচনা করেন না!

হাউপ্ট্‌মান ও এই ৯৩ জন স্বাক্ষরকারীদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য ১৯১৪ সালের আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছিলাম। আমি প্রকাশ্যে আন্তর্জাতিকতার শপথ গ্রহণ করিয়াছি; জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের নামে যুদ্ধের নূতন ধর্মের চোখে আমি বিধর্মী, কারণ আমার বিশ্বাসের বিশ্বজনীনতাকে আমি কোনোদিন বিসর্জন দিই নাই। রাষ্ট্র বা জনমতের স্বেচ্ছাচারের সম্মুখে নতজানু হইবার মতো বিদ্রোহী আমি নই। যে ৯৩ জন জার্মান বুদ্ধিজীবী উদাত্ত অথচ অর্থহীন কণ্ঠে "Es ist nicht wahr" এই বাণী ঘোষণা করিয়াছিল তাহাদের সম্পর্কে কঠোর কিছু বলিবার ও করিবার অধিকার আমারই আছে।

কিন্তু মিত্রদেশগুলির স্বদেশপ্রেমিক আপনারা, আপনাদের এ-অধিকার কোথা হইতে জন্মিল? আপনারা নিজেরা কি গত নয় বৎসর ধরিয়া নিজ নিজ গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারকে চোখ বুজিয়া সহ্য করেন নাই? নিজ নিজ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের উদ্ধত উপদেশের সুরে সুর মিলাইয়া আপনারা কি এক অপূর্ব ঐকতান সৃষ্টি করেন নাই? বিজিত দেশ সমূহের নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদকে এই ঐকতানে আপনারা কি চাপা দিতে চান নাই? আমার চোখে এ সাংঘাতিক অপরাধ। কিন্তু এ অপরাধ স্বীকার না করিয়া হাউপ্ট্‌মান কি একজন "সাঁচ্চা দেশ-প্রেমিকের" কাজই করিতেছেন না? নিজের দেশের ভুল স্বীকার করিতে অস্বীকার করিয়া তিনি কি মিত্রদেশগুলির দেশপ্রেমিকদিগের পদাঙ্কই অনুসরণ করিতেছেন না? মিত্র রাষ্ট্রগুলির অপরাধ ও দায়িত্ব সম্পর্কে ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে ও রাশিয়ায় যে রাশি রাশি নজির ও দলিল প্রকাশিত

হইয়াছে ১৯২৩ সালেও সে-সবগুলিকে আপনারা কি উপেক্ষা করিয়া যাইতেছেন না?

ইউরোপীয় সভ্যতার জাগরণের অন্তরালে অপরাধ ও নির্বুদ্ধিতার যে পর্বতপ্রমাণ স্তূপ এতদিন ঢাকা পড়িয়াছিল গত দশ বৎসরে তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এ-অপরাধের দায়িত্ব প্রত্যেক জাতেরই রহিয়াছে, রাগ করিয়া লাভ নাই। নিজেদের দিকে তাকাইয়া দেখুন, আর কিছু না করুন বিচারকের আসনে বসিবেন না। ইউরোপে আজ সাম্য বলিয়া কোনো পদার্থ নাই। পাপের চেয়ে পুণ্যের ভণিতা সেখানে বেশি। এখানে বসিয়া বিচারের কথা যেন আমরা না বলি। মৃত্যুই এখানে একমাত্র সুবিচার, একমাত্র মৃত্যুই আনিবে সাম্য।

আজ আর ভাবিবেন না যে পরস্পর পরস্পরকে দূরে রাখিবার নীতি দ্বারা আপনারা লোককে বিভ্রান্ত করিতে পারিবেন। ক্ষমাশীল হইবার চেষ্টা করুন। ক্ষমা যদি করিতে না পারেন ভুলিতে চেষ্টা করুন, কারণ, ক্ষমা করার চেয়ে ভুলিতে পারাটা সাধারণ মানুষের আয়ত্তাধীন বেশি। বিস্মৃতির পরম কল্যাণকর যাদুস্পর্শে শোক ও লজ্জা মুছিয়া যায়, পরকে সহ্য করিবার, এমনকি নিজেকে বহন করিবার, ক্ষমতাও জন্মে! ভুলিয়া যান! বিশ্বাস করুন এ ভুলিয়া যাওয়ায় লাভবান হইব আমরা সকলেই কারণ যদি প্রত্যেক অপরাধেরই প্রতিশোধ লইতে হয় তবে আগামী এক শতাব্দীর মধ্যে আমাদের এই ইউরোপে একটি পাথরও খাড়া থাকিবে না।

(১৯২৩ সালের ৫ই জুন, "আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন" নামে ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত)

রুর অধিকার সম্পর্কে

জুলাই, ১৯২৩

রুরসম্পর্কে বিজয়ীদের নীতির আশু পরিণাম যাহাই হউক না কেন উহার ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। কবে জানি না, তবে একদিন না একদিন এই নীতির ফলে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধিবেই এবং সে যুদ্ধে চতুর্গুণ ঘৃণার আগুনে দুইটি দেশই পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইবে। বিজয়ী ও বিজিত উভয়কেই আমি অনুকম্পা করি। কৃষ্ণ ও শ্বেত জাতিগুলির যে বিপুল সংঘর্ষের অগ্নিশিখায় আজ দিগন্ত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে তাহারই মতো কোনো সামাজিক বা জাতিগত আলোড়নই একমাত্র এই ভবিতব্যকে অন্য লক্ষে চালিত করিতে পারে।

যে রাষ্ট্রনায়কগণ এই শোচনীয় নীতি পরিচালনা করিতেছেন আমাদের উত্তরপুরুষেরা তাহাদের নাম ঘৃণার সহিত উচ্চারণ করিবে। একান্ত অনাসক্তভাবে আমি এই কথা উচ্চারণ করিতেছি, দুঃখবোধও পর্যন্ত করিতেছি না। মঁঃ পোয়্যাঁকারে-র বিরুদ্ধে আমার কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই। আমি তাহাকে একজন গভীর দেশপ্রেমিক ও নির্মলচরিত্রের রাষ্ট্রনেতা বলিয়াই জানি। জানি কতবড় দায়িত্ব তাহার মাথায়, কি বিরাট সমস্যাবলীর সম্মুখে তাহাকে দাঁড়াইতে হইতেছে। কিন্তু এক অন্ধ ও সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া তিনি যে ভুল করিয়াছেন তাহা, যে-দেশকে তিনি ঘৃণা করেন তার চেয়ে যে-দেশকে ভালোবাসেন তার পক্ষেই, মারাত্মক হইবে বেশি।

(কাউণ্ট লুচিদি সম্পাদিত রাসেনা ইন্তেরনাৎসিওনালে-র জন্য লিখিত)

জার্মানির দুর্গতদের সাহায্যের জন্য ফরাসীদের নিকট আবেদন

৩রা ডিসেম্বর, ১৯২৩

লোকের সম্মুখে বিজয়ী বা বিজিত উভয়েই সমান।

শবাযাত্রা দেখিলেই মৃতের জীবন যাহাই হউক না কেন মস্তকাবরণ খুলিয়া তাহাকে সন্মান দেখানো আমাদের জাতির পবিত্রতম প্রাচীন প্রথা গুলির একটি। চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী ও সেবাব্রতিনীদের অর্থাৎ মানুষের দুঃখমোচনের কাজে যাহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার পথ তাহাদেরই মত ঐকান্তিকতা লইয়া দুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

ফ্রান্সের রহিয়াছে এই সহজাত প্রবৃত্তি পরিপূর্ণভাবে। তাই ফ্রান্সের নিকট আমাদের আবেদন :

জার্মান জাতি না খাইয়া মরিতেছে। যুদ্ধরূপ মহামারীর দণ্ড দিতেছে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ। তাহাদের শাসকশ্রেণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোভ ও স্বার্থপরতার জন্য তাহারা যদি দায়ী হয় তবে মহামারীর জন্যও তাহাদের দায়িত্ব রহিয়াছে। অক্টোবরের শেষে বার্লিনে লাইপৎসিগ ফ্রিবুর্গ-এ রোজকার রুটির দাম ৭ হইতে ১০ মিলিয়ড মার্ক পর্যন্ত ওঠে। এই দামের দশ ভাগের এক ভাগেরও কম বুদ্ধিজীবী কর্মীর মাসিক মাহিনা। শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল ও ইঞ্জিনিয়ার সকলেই রুটি কিনিবার জন্য বই ও অন্যান্য সরঞ্জাম বিক্রয় করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পল্লী অঞ্চলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। বার্লিনে শতকরা ৭০টি ছেলেমেয়ে কিছু না খাইয়াই স্কুলে যাইতেছে। ইহাদের অনেকেরই ভাগ্যে গরম স্যুপ জোটে দুইদিনে মাত্র একবার। হাজার হাজার পরিবার উপবাসে জীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিয়াছে, তারপর ক্ষুধার কষ্টের সহিত মিশিয়াছে ঠাণ্ডা। শীতকাল শুরু হইয়াছে সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ মহামারী লইয়া। যে-ফ্রান্সের শেষ শক্তিমান প্রতিনিধি ছিলেন ভিক্টর য়্যুগো, পুরাতন যুগের সেই

ফ্রান্স ও জার্মানির মিলনের উদ্দেশ্যে

মহানুভব ফ্রান্স একদিন রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া নির্জীব শত্রুর দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিত, সযত্নে বাঁধিয়া দিত ক্ষতস্থান। আজ চার বৎসর যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। শুনিতে পাই নূতন জীবনের শ্যামল ফসলে রণক্ষেত্র-গুলি ভরিয়া উঠিতেছে, কিন্তু পরাজিতের দুর্দশা আজও শেষ হইল না। আজ সে মরিতেছে, তাহাকে দেখিবার কেহ নাই। দল ও মত নির্বিশেষে সমস্ত জাতির নিকট আমাদের এই আবেদন। নানা উন্মাদনায় আজ ফরাসী জাতির ঐক্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরস্পরের প্রতি তো আমরা সুবিচার করিতে পারি। মিলিতে পারি আমরা সেইখানেই যেখানে দাঁড়াইয়া সকলেই আমরা ফ্রান্সকে শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি তার নৈতিক মহত্ত্বকে, স্বীকার করি সে নৈতিক মহত্ত্বের রক্ষার প্রয়োজনকে। আসুন, এ ঐক্যের প্রমাণ আজ আমরা জগতকে দেখাই। জগত জানুক ফরাসীদের হৃদয়হীন ঘৃণার স্থান নাই, স্থান নাই অপরের দুর্দশার প্রতি ঔদাসীন্যের; বিজয়ী ফ্রান্স আজও করুণার দেশ।

হৃদয়ের মহত্ত্বই জয়লাভের একমাত্র প্রমাণ। করুণার মতো এতবড় শক্তি আর পৃথিবীতে নাই।

একদিন সে যাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল আজ তাহারই প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিয়া দিবার জন্য ফরাসী জাতিকে আজ আমরা আমন্ত্রণ জানাইতেছি। জার্মানির দুর্ভাগা জনসাধারণের জন্য আমরা একটি সাহায্যভাণ্ডার খুলিয়াছি। এবং চাঁদার তালিকায় স্বাক্ষর করিয়াছি।

লেনিনের মৃত্যু

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪

লেনিনের ও রুশ বলশেভিকবাদের মতবাদ আমি স্বীকার করি নাই। কিন্তু আমি এতখানি স্বতন্ত্রবাদী ও আদর্শবাদী যে মার্কসবাদী বস্তুতান্ত্রিক অদৃষ্টবাদ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু আমার এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসই আমাকে বিরাট ব্যক্তি-পুরুষদিগের ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া গণ্য করিতে শিখাইয়াছে; তাই লেনিনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রহিয়াছে। এ-শতাব্দীর ইউরোপে লেনিনের চেয়ে শক্তিমান পুরুষ জন্মিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। গলিত মানবতার ক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে তাহার ইচ্ছাশক্তির অর্ণবপোত যে গভীর পথ রাখিয়া গেল তরঙ্গাভিঘাতে তাহা মুছিয়া যাইতে দীর্ঘদিন লাগিবে। জাহাজখানি আজ সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে নূতন জগতের পানে।

এতখানি ইস্পাত-কঠিন ইচ্ছাশক্তি লইয়া নেপোলিয়ঁর পরে ইউরোপের ইতিহাসে আর কেহ আসেন নাই। প্রাচীন যুগের পর ইউরোপের বিভিন্ন ধর্মান্দোলনের মধ্যে বিশ্বাসের এই অটলতা আর দেখা যায় নাই। সর্বোপরি মানুষের উপর মানুষের এতখানি প্রভুত্ব, নিঃস্বার্থ প্রভুত্বও চোখে পড়ে নাই। জীবন দিয়া কালের বুকে যে নৈতিক প্রতিমূর্তি তিনি স্থাপন করিয়া গেলেন তাহা কোনোদিন ম্লান হইবে না।

ইতালীয় ফাশিজমের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ ও যুদ্ধের প্ররোচনাকারীদের বিরুদ্ধে

ফরাসী লীগ অফ দি রাইটস অফ দি ম্যান-এর সম্মুখে প্রদত্ত বক্তৃতা। ত্রিপোলিতে মুসোলিনীর সামরিক শোভাযাত্রার পরদিন লিখিত

১৯শে এপ্রিল, ১৯২৬

আর একবার যুদ্ধ হইলে ইউরোপ যে ধ্বংস হইয়া যাইবে এ বিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় যুদ্ধের আঘাত সে কিছুতেই সামলাইতে পারিবে না। সমগ্র পশ্চিম মহাদেশ ব্যাপিয়া নামিয়া আসিবে অন্ধকার।

অতএব যুদ্ধের প্ররোচনা দান অথবা যুদ্ধ বন্ধের জন্য করণীয় সব কিছু না-করা, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে, সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে, ইউরোপের মর্মবাণীর বিরুদ্ধে অমার্জনীয় অপরাধ। আজ প্রকাশ্যে প্রবলকণ্ঠে এ-কথা ঘোষণা করিবার দিন আসিয়াছে যে, এই পাপেরই আয়োজন চলিয়াছে, এই পাপেরই স্বপ্ন দেখা হইতেছে। পাপীর অভাব নাই, ইউরোপের প্রত্যেক দেশের নাগরিকদের মধ্যেই তাহারা বর্তমান। এই পাপীদেরই একজন আমাদের এক বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শীর্ষদেশে বসিয়া প্রকাশ্যেই শান্তিকে বিদ্রূপ করিতেছেন এবং এই শান্তিকে ভঙ্গ করিবার বাসনা দম্ভভরে ঘোষণা করিতেছেন। সারা দেশব্যাপী অতি-উত্তেজিত তরুণ তরুণীর দল উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিয়া আছে। এই ইঙ্গিত

পাইবা মাত্রই তাহারা সংহারের সিংহদ্বার খুলিয়া দিবে, পাপকে ছাড়িয়া দিবে পৃথিবীতে স্বেচ্ছা-বিচরণের জন্য।

ইউরোপের দুর্ভাগ্য একের নির্বুদ্ধিতায় সকলেরই ভবিতব্য দুলিয়া ওঠে। তাই ইউরোপকে শ্যেন-দৃষ্টি লইয়া শান্তিকে পাহারা দিতে হইবে। এ তাহার বড় ভঙ্গুর সম্পদ। কিন্তু এ তাহার সবচেয়ে বড় সম্পদ, এ তাহার জীবন। ইহাকে যে নষ্ট করিতে চায় সে মানুষই হউক কি জগতই হউক—সে যেন নিজে ধ্বংস হইয়া যায়।

2. Vita Sine Libertate, Nihil.

২৩শে এপ্রিল, ১৯২৬

ইতালীয় ফাশিজমের নীতির উপর যে-শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি সে-শাসন ব্যবস্থা মানুষের বিবেকের নিকট অপমানজনক। মানুষের ভয়ের প্রবৃত্তির সুযোগ লইয়া তাহাকে মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত করিয়া মানুষের পবিত্রতম ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়া এই শাসনব্যবস্থা আপনার অস্তিত্বকে কায়েম রাখে।

ফ্রান্সে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রত্যেক প্রয়াসই একটি অপরাধ। এ অপরাধ স্বাধীন যুক্তির দেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। যে স্বাধীন জাতি একদিন বিপ্লব আনিয়াছিল এ-অপরাধ তাহারই বিরুদ্ধে; এ-অপরাধ স্বাধীন আত্মার বিরুদ্ধে।

কোনো হত্যাকেই আমি ক্ষমা করি না। সব হত্যারই আমি প্রতিবাদ করি। কিন্তু যে স্বাধীনতাকে হত্যা করে সে হত্যাকারীর পাপের তুলনা নাই।

Vita Sine Libertate, Nihil

(ফরাসী ফাশিস্ট ও কমিউনিস্টদের মধ্যে
সংঘর্ষ সম্পর্কে আঁরি তরেস্‌কে লিখিত পত্র)

৩। ফিলিপ্পো তুরাতিকে লিখিত পত্র

১১ই মে, ১৯২৭

প্রিয় ফিলিপ্পো তুরাতি,

আপনাকে ও আপনার বন্ধুদের অভিনন্দিত করিয়া আমি আমাদের পরম প্রিয় বৃহত্তর স্বাধীন ইতালির বিশ্বস্ত ও নির্যাতিত প্রতিনিধিদেরই অভিনন্দন জানাইতেছি, আর অভিনন্দন জানাইতেছি দুর্ভাগা ইতালিকে, শহিদের দেশ ইতালিকে। শাশ্বত ন্যায় ও মানুষের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিতে গিয়া যাহারা জীবনে চরম যন্ত্রণা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহাদের কত রক্ত, কত অশ্রুজলই না সে পান করিয়াছে। এমন কোনো বিদেশী শাসন নাই, যাহা তাহাকে ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু আজ যখন সমস্ত বিদেশী শৃঙ্খল সে ছিড়িয়া ফেলিল তখন দেখিল সব চেয়ে কঠিন শৃঙ্খল কোথায় যেন তাহার জন্য জমা ছিল। স্বদেশের এক স্বেচ্ছাচারীর লৌহ শৃঙ্খলের অসম্মান আজ তাহার উপর চাপিয়া বসিয়াছে। আভ্যন্তরীন আলোড়ন ও আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণে আপনাদের শ্রমশীল উত্তর দেশ এইভাবেই তো যুগে যুগে অভিভূত হইয়া আসিতেছে।

আদিম মৃত্যুশক্তির বিরুদ্ধে আসুন আবার আমরা যুক্তির সংগ্রাম শুরু করি। যে-সংগ্রাম আজ আপনারা চালনা করিতেছেন সে-সংগ্রাম শুধু কোনো বিশেষ একটি নির্যাতিত অপমানিত ও নিষ্পেষিত মহান জাতির মুক্তিযুদ্ধ নহে, এ-যুদ্ধ সমগ্র জগতের মুক্তিযুদ্ধ। আজ প্রশ্ন, কে জিতিবে? যে পশু-শক্তি মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করে, সে? না—যে মমনশক্তি মানুষের চিত্তাকাশকে আলোকিত করিয়া সমস্ত শৃঙ্খলকে পুড়াইয়া দেয়, সে?

(সোশালিস্ট ডেপুটি ফিলিপ্পো তুরাতি লিপারি দ্বীপপুঞ্জ হইতে পালাইয়া যখন পারি-তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন ঠিক সেই সময়ে চিঠিখানি

লিখিত। ১৯২৭ সালের ১৯শে এপ্রিল তুরাতি রলাঁর নিকট পারি-র নির্বাসিত ইতালিয়ানদের মুখপত্র লা লিবেরতা-য় প্রকাশের জন্য একটি বাণী চাহিয়া পাঠান, উপরের চিঠিখানি সেই বাণী।)

ফ্রান্সে ইন্দোচীনের ছাত্র ও মজুরদের প্রতি

১৭ই মে, ১৯২৬

ফ্রান্সে ইন্দোচীনের ছাত্র ও শ্রমিকগণ! আপনারা আমার সৌভ্রাত্রমূলক সহানুভূতি গ্রহণ করুন। আমি আপনাদের সহিত গুয়েন-আন-নিন্‌এর মুক্তি দাবী করি।

স্বদেশবাসীর অধিকার রক্ষা করিতে গিয়া তিনি নিজের কর্তব্যই সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ব্যভিচারকে আক্রমণ করিয়া তিনি শুধু ইন্দোচীনেরই কল্যাণ করেন নাই। ফ্রান্স ইহাতে উপকৃত হইয়াছে।

কারণ, সত্যকে জানা ফ্রান্সেরও নিজের স্বার্থ। কী ভুল ও কী অন্যায় যে করিতেছে সে-সম্পর্কে সচেতন থাকা তাহার পক্ষেই মঙ্গলকর। ক্ষমতার যে অপব্যবহারের ফলে তাহার নাম কলঙ্কিত হইতেছে, তাহার সম্মুখেই সে অপব্যবহারের তীব্র নিন্দা করাতেও ফ্রান্সই উপকৃত হইবে। ইন্দোচীন ও ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে যদি সহযোগিতার বন্ধন স্থাপিত হয় তবে তাহাতে ফ্রান্সেরই স্বার্থ রক্ষা হইবে।

ইন্দোচীনের ছাত্র ও শ্রমিকগণ, আপনাদের নিকট আমাদের আবেদন এই সহযোগিতা স্থাপনের প্রচেষ্টায় আমাদের সহিত আপনারা যোগ দিন। দাম্ভিক জাতিপ্রেমের যে নির্বোধ কুসংস্কার ইউরোপ ও এশিয়ার জাতিগুলিকে

ফ্রান্সে ইন্দোচীনের ছাত্র ও শ্রমিকদের মুখপত্র পারি হইতে প্রকাশিত ভিয়েটনাম হোন নামক মাসিক পত্রিকার অনুরোধে এই পত্রখানি লিখিত। ইন্দোচীনে ফ্রান্স নামক পুস্তকের লেখক ইন্দোচীনের নেতা গুয়েন-আন-নিনকে কোচিন চীনের গভর্ণমেণ্ট তখন রাজদ্রোহের অপরাধে দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্বমানবের সমবেত কর্মপ্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে, আসুন আমরা তাহার বিরুদ্ধে একত্র সংগ্রাম করি। এই ধ্বংসাত্মক জাতি-বিদ্বেষের জন্য বিজেতা ইউরোপীয়গণই প্রধানত দায়ী। কিন্তু এশিয়াবাসী-দিগকেও একেবারে নির্দোষ বলা চলে না। আজ চোখের উপর এশিয়ার বহু দেশকে দেখিতেছি, যেখানকার জনসাধারণ নিজেরা দীর্ঘদিন নির্যাতিত হইয়াও যে মুহূর্তে স্বাধীনতালাভের মুখে আসিয়া দাড়াইতেছে, সেই মুহূর্তেই জাত্যভিমান, জাতি-বিদ্বেষ ও দাম্ভিকতার কুসংস্কার তাহাদের পাইয়া বসিতেছে। নির্যাতনকারীদের কুসংস্কারের চেয়ে এ-কুসংস্কার কম নহে। মনুষ্যজাতির এ একটা ব্যাধি। মানুষকে ব্যাধি হইতে মুক্ত করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের জাতি ও জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট কাজ করিতে হইবে।

দুঃসাহসিক অভিযানের নেশা, অজানাকে জানিবার কৌতূহল, দিগ্বিজয় ও সম্পদ আহরণের লোভ, সাম্রাজ্য লিপ্সা—যে কারণেই ইউরোপীয়রা এশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকুক না কেন, অকল্যাণ হইতে কল্যাণ আসিতে পারে; এবং কল্যাণের একটা সুস্পষ্ট সম্ভাবনা মানুষের সামনে ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির দুইটি শক্তিশালী সভ্যতার সম্মেলন হইয়াছে। স্বেচ্ছায়ই হউক বা অনিচ্ছাতেই হউক, পরস্পরকে তাহাদের জানিতে হইবেই। তাহারা যেন একে অন্যের গভীরে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করিতে পারে।

বিচ্ছিন্ন সভ্যতার যুগ শেষ হইয়াছে। সৌন্দর্যের অসামান্য বিকাশ এই যুগে সম্ভব হইয়াছিল। ইহার পবিত্র স্মৃতি আমরা রক্ষা করিব। কিন্তু অতীতকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা যেন আমরা না করি। এ চেষ্টা পণ্ডশ্রম হইবে। আমাদের সম্মুখে আজ অন্য কাজ, অনেক বড় কাজ আমাদের রহিয়াছে। আসুন আমরা একত্রে কাজ করি। এই কাজে আমাদের

সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত সম্পদ নিয়োগ করিতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াও আমরা শান্তভাবে নিষ্ঠার সহিত আমাদের উভয়েরই মঙ্গলকর একক কর্তব্য আমরা যেন করিয়া যাইতে পারি।

কিন্তু অধিকার ও কর্তব্যের সাম্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িবার চেষ্টা না করিলে শক্ত স্থায়ী কিছুই গড়িয়া তোলা যায় না। আমি সর্বপ্রধান অধিকারগুলির মধ্যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং যাহা সত্য বলিয়া জানি ও বিশ্বাস করি তাহা লিখিবার অধিকার দাবী করি। এ দাবী আমি করিতেছি ফ্রান্সের নামে। এ দাবী আমি জানাইতেছি সুবিচার ও শুভবুদ্ধির নামে। বাক্যের স্বাধীনতাকে যে-শক্তি কণ্ঠরোধ করিতে চাহে, সে-শক্তি আপনার নির্বুদ্ধিতা ও পক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয় মাত্র। যাহারা বুদ্ধিমান্ তাহারা শত্রুপক্ষের সমালোচনা ও নিন্দা হইতেও কি করিয়া লাভবান হওয়া যায় তাহা জানেন। কারণ, আজিকার শত্রু আগামীকাল সহযোগী হইয়া দাঁড়াইবে।

আনামের ছাত্র ও শ্রমিকগণ, আপনাদের দিকে আমি হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছি; আমাদের উভয়েরই শত্রু এক। এ শত্রু সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও তাহারই অন্তরালে আত্মগোপনকারী হীন স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নহে। "বৃহত্তর ইউরোপ ও বৃহত্তর এশিয়া আমাদের সহযোগিতা কামনা করিতেছে।"

আপনাদের বন্ধু ও ভ্রাতা,

আর. আর

আমেরিকার প্রতি

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ একটি বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে রহিয়াছে। বিরাট অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং যুদ্ধের জন্য দেশে দেশে যে বিপুল ধ্বংস তাহাই তাহার কারণ। নিঃস্ব ইউরোপের সর্বাঙ্গ হইতে আজ অবিশ্রাম রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর তাই আজ শ্বেতসভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ইচ্ছা না থাকিলেও সে আজ মানবসমাজের একটি অংশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য। এই প্রবেশের অধিকার যেমন তাহার জন্মিয়াছে তেমনি জন্মিয়াছে অধিকারের চেয়েও বড় জিনিস—কর্তব্য। এই কর্তব্যের আহ্বানে তাহার মন বিবেক, ও বুদ্ধি কী ভাবে সাড়া দিবে, তাহার উপর পৃথিবীর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। আমেরিকার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাহার চরিত্রগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখিয়া যে ভয় আমার মনে জাগিয়াছে, বিদেশীয় দুঃসাহস লইয়া তাহা আমাকে বলিতেই হইবে।

আমেরিকার গর্বিত বলিষ্ঠ মানব প্রকৃতির মধ্যে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্বের স্থান নাই। যাহা তাহার ভালো লাগে তাহার সবটুকুই ভালো লাগে; যাহা সে বিশ্বাস করে তাহা সর্বান্তকরণেই বিশ্বাস করে। তাহার প্রতিশ্রুতির মধ্যে যেমন কোনো ফাঁকি নাই, তেমনি একবার বাঁকিয়া বসিলে তাহাকে ফিরানো অসম্ভব। অন্য জাতির মানসপ্রকৃতিকে বুঝিবার ক্ষমতা তাহার একেবারেই নাই। অন্য জাতির মনস্তত্ত্ব তাহার নিকট দুর্বোধ্য। তাহাদের

মন, তাহাদের সুখ দুঃখ, তাহাদের চাওয়া পাওয়ার স্বরূপ সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাহার নিজের পক্ষে যাহা সত্য, যাহা কল্যাণের, পৃথিবীর অপরাপর জাতির পক্ষেও তাহা সত্য ও কল্যাণের, এই ধারণাই তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছে। যদি অন্য জাতিগুলি তাহার চোখে জগৎ দেখিতে না পারে তবে সে দোষ তাহাদেরই এবং নিজেদের পৃথিবীর স্বার্থে তাহা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার অধিকার তাহার আছে। এই ধরনের চিন্তার মধ্য দিয়াই মানুষের মধ্যে পৃথিবী জয়ের বাসনা জাগিয়া ওঠে। লোভ ও প্রভুত্বের সহজাত প্রবৃত্তির সহিত সংকীর্ণ নীতিবাদ মিলিয়া যে ছদ্ম আবরণ রচনা করে, তাহাই আড়াল করিয়া বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন গড়িয়া ওঠে।

ইহার চেয়ে বিপদজনক আর কিছু হইতে পারে না। জগতে যুক্তরাষ্ট্রের যত বেশি কাজ করিবার আহ্বান আসিবে তত বেশি করিয়াই তাহাকে জগতের অন্যান্য জাতির সত্যকারের প্রকৃতি, প্রয়োজন ও ভাবাদর্শের সহিত পরিচিত হইবার দায়িত্ব বাড়িবে; কারণ, দুর্বলকে তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে যাইতে বলপূর্বক বাধ্য না করিয়া তাহাকে আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলাই শক্তিমানের কর্তব্য। যদি একটি জাতি বা একটি রাষ্ট্র, সে যত সহজে হউক না কেন, এই বিচিত্র সুন্দর পৃথিবীর উপর তাহার নিজের ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যহীন সাম্যের রূপ চাপাইয়া দেয় তবে সর্বমানবের পক্ষে তাহা এক দারুণ বিপর্যয়ের কথা। এ-বিপর্যয়ের হাত হইতে ঐ জাতি ও ঐ রাষ্ট্র নিজেও অব্যাহতি পাইবে না। কারণ, নির্যাতিতের মধ্যকার দুর্দমনীয় শক্তি একদিন প্রভুজাতির উপর প্রতিশোধ লইবেই। ইতিহাসের বর্তমান মুহূর্তে আমেরিকার বাহিরে নহে, আমেরিকার অভ্যন্তরেই আজ নির্ভীক ও দূরদৃষ্টিবান এমন নাগরিকের প্রয়োজন যাহারা জাতির চোখে

আদর্শ পুরুষরূপে প্রতিভাত হইয়া জাতিকে তাহার স্বরূপ চিনাইতে পারেন, দেখাইতে পারেন কোথায় তাহার মহত্ত্ব, কোথায় তাহার দুর্বলতা, কোথায় তাহার উৎকর্ষ, কোথায়ই বা বিচ্যুতি; কী তাহাদের নাই, আছে অন্য জাতির, যাহা গ্রহণ করিয়া সে নিজে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

আইনের অস্ত্রে সাক্কো ও ভানৎসেত্তির হত্যা সম্পর্কে মার্কিন বন্ধুকে লিখিত পত্র

২৪শে আগস্ট, ১৯২৭

আইনের ফাঁস পরাইয়া সাক্কো ও ভান্‌ৎসেত্তিকে যে-ভাবে হত্যা করা হইয়াছে তাহাতে অভিভূত হইয়া আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। আপনিও যে আমার মতোই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তথাপি আমার মনের কথা এই ভাবিয়াই আজ জানাইতে চাই যে আপনার নিজের দেশে হয়তো তাহা কিছু কাজে আসিতে পারে। আমার কথার কিছু মূল্য হয়তো থাকিতে পারে; কারণ, রাজনৈতিক দলগুলি হইতে দীর্ঘদিন নিজেকে দূরে রাখিয়া আমি বর্তমানের সাময়িক উন্মাদনার প্রভাব হইতে মনকে মুক্ত রাখিয়া চিন্তা করিবার অভ্যাস অর্জন করিয়াছি।

আইনের তকমা-আঁটা হত্যাকারীরা দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধরিয়া নিঃশব্দ মন্থর নির্যাতনে বিন্দু বিন্দু করিয়া রক্ত শোষণ করিয়া যে দুই হতভাগ্যের জীবনাবসান ঘটাইল গত সন্ধ্যায় তাহাদের মৃত্যুই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সবচেয়ে সাংঘাতিক দিক নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বহির্বিশ্বের জনগণের মধ্যে এই মহাপাপ আজ যে অতলস্পর্শ গহ্বরের সৃষ্টি করিল সমস্ত ট্রাজেডির সেইটাই সবচেয়ে দারুণ দুর্ঘটনা।

এই দুই অপরাধীর অপরাধহীনতা যদি কোনোদিন প্রমাণিত ও প্রচারিত হয় তবে সেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সরকারী সম্মান ধূলায়

লুণ্ঠিত হইবে সন্দেহ নাই ; তথাপি সাক্কো ও ভান্‌ৎসেত্তির অপরাধের প্রশ্ন আজ গৌণ হইয়া গিয়াছে। তাহারা অপরাধী কি নিরপরাধ এ প্রশ্ন আজ লোকের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। লোকের চোখে আজ তাহারা এমন দুটি দুর্ভাগা মানুষ যাহারা বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এমন এক অতি সূক্ষ্ম, অতি সভ্য নিষ্ঠুরতার নিপীড়ন সহ্য করিয়াছে যাহা জগতের সবচেয়ে বর্বর জাতির চোখেও কাপুরুষতা ও অমানুষিকতার চরম অভিব্যক্তি। একটি সহজ সমাধানের দাবী জানান হইয়াছিল—করুণা। মানুষের সহনশীলতার শেষ সীমা পর্যন্ত নিপীড়ন সহ্য করিয়া তাহারা তাহাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। এই দুই হতভাগ্যের ভগ্ন পঞ্জরের মধ্য হইতে শেষ নিশ্বাসটুকু টানিয়া বাহির করা পর্যন্ত যাহাদের শান্তি হয় নাই তাহাদের বর্বরতার পরিমাপ করিব কি দিয়া।

কিন্তু মানুষের মধ্যে যে এত বর্বর থাকিতে পারে তাহা আমি জানিতাম, এবং জানিতাম বলিয়াই এই বর্বরতায় মোটেই বিস্মিত হই নাই। আমরা এ-দেশে দ্রেইফ্যুস্ কলঙ্কের মধ্যে এই একই বর্বরতার প্রমাণ পাইয়াছি। সামরিক কি অসামরিক মহা মহা বিচারকেরা সকলেই এই দলের। একবার বিচারের বাণী উচ্চারিত হইবার পর সমস্ত জগত ধ্বংস হইয়া গেলেও তাহারা কিছুতেই ভুল স্বীকার করেন না। এক নিষ্ঠুর, নির্বোধ, নিশ্চল দানবীয় দম্ভে চোয়ালে চোয়াল চাপিয়া নিজেদের ভুল তাহারা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন। যদি নরক বলিয়া কিছু থাকে তবে সেখানকার সবচেয়ে উঁচু আসন যেন এই দাম্ভিকদের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হয়।

কিন্তু যে-পাপ ইহারা করিতেছে সে-পাপ ইহাদেরই। তাহাদের জাতি ও সম্প্রদায় এই পাপে সংশ্লিষ্ট নহে। জাতির কর্তব্য এই পাপ হইতে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত রাখা। দ্রেইফ্যুস্ কলঙ্ক হইতে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ অংশ এইভাবেই নিজেকে বাঁচাইয়াছিল। বহু বৎসরের সংগ্রাম ও দুঃখভোগের পর অত্যাচারীর

কবল হইতে এই ফ্রান্সই অত্যাচারিতদের ছিনাইয়া লইয়াছিল। সাক্কো ও ভান্‌ৎসেত্তির মুক্তি ও প্রাণরক্ষার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সেই কাজই তাহারা করিয়াছে। সফল হইতে তাহারা পারে নাই বটে, কিন্তু কৃতিত্ব তাহাদের কম নহে।

কিন্তু মার্কিন গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারেন এমন একজন পদস্থ সরকারী ব্যক্তিও মানবতার নামে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন না : জগতের চোখে এই কলঙ্কময় নাটকের ইহাই সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা। সাক্কো ও ভান্‌ৎসেত্তিকে যখন হত্যা করা হইতেছিল ঠিক সেই সময়টাই কুলিজ তাহার এক সপ্তাহের বাৎসরিক ছুটি লওয়ার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিলেন (তাহাকে বিরক্ত করিবার চিন্তাও যেন কাহারও মনে না আসে!) যে দুটি লোককে শুধু মাত্র হত্যা করা হইতেছিল টাফ্‌ট তাহাদের জন্য কষ্ট করিয়া আর ক্যানাডা হইতে ফিরিতে চাহিলেন না। বোরার চরিত্রবলের কথা বহুদিনই শুনিয়া আসিতেছিলাম। তিনি বলিলেন (যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি সত্য হয়) এই দুইটি লোক সম্পর্কে যে সমস্যা তাহা সুবিচারের সমস্যা নহে, বিদেশ হইতে যে উদ্ধত চীৎকার আসিতেছে তাহার জবাব দেওয়াই আসল সমস্যা।

এইভাবে জাতীয় দম্ভের অশ্লীল প্রকৃতি মানবতাকে পদদলিত করিল।

আমরা জানি বিদেশীদের মুখ হইতে উপদেশ ও বক্তৃতা শুনিতে কোনো জাতিরই ভালো লাগে না। আমরা ইহাও জানি—শুধু জানি না ইহার জন্য দুঃখিতও যে, বহুস্থানে জনসাধারণের ক্ষোভ ও বেদনা বিদেশে হিংসাত্মক কার্য্য এবং ভীতি ও অসম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু মার্কিনবাসী আপনারা এ-কথা সকলেই ভালোভাবে জানেন যে আইনের ছদ্মবেশে আমেরিকা আজ যে অপরাধ করিল তাহাতে ইউরোপে যাহারা সবচেয়ে ব্যথিত হইয়াছেন তাহারা হিংসা-পথের পথিক নহেন। তাহারা

মধ্যপন্থী, তাহাদের মধ্যে লিবারেলরা আছেন, ক্রিশ্চিয়ানরা আছেন, আছেন ইউরোপের ধীর, শান্ত, সুবিবেচক সকলেই। যে-সকল প্রতিবাদ আপনাদের কাছে আসিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই আসিয়াছে আমেরিকার ঐকান্তিক সুহৃদদের নিকট হইতে। যে মহান জাতিকে এতদিন তাহারা ভালোবাসিয়া আসিয়াছেন, যখন দেখিলেন তাহার সুনাম এতবড় এক অপরাধ কলঙ্কিত করিতে বসিয়াছে, যখন দেখিলেন যে-জাতিকে লইয়া একদা তাহারা মনো-মন্দিরে এক বিরাট আদর্শের প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ধূলিসাৎ হইতে বসিয়াছে, তখন বেদনাবিদীর্ণ কণ্ঠে তাহারা আপনাদের নিকট আর্ত প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

যে গভর্নমেণ্টের শক্তি আছে, হৃদয় আছে, মহানুভবতা আছে সে নিজের ও জগতের কল্যাণে বাহিরের ভীতিপ্রদর্শনে কর্ণপাত করে না; কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের অনুরোধ ও উপদেশকে উপেক্ষা করিতে পারে না। বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া নিজের উদ্যোগেই এই দুই দুর্ভাগাকে তাহার মুক্তি দেওয়া, অন্তত প্রাণদণ্ডের স্থানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা, উচিত ছিল। যদি সে ইহা করিত তবেই জাতীয় দুর্ঘটনার পর্যায়ের একটা সাংঘাতিক ভুলের বিপদ হইতে আত্মরক্ষার সংস্থান করিতে পারিত।

মার্কিন গভর্নমেণ্টের পদস্থ অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের এই চরম হৃদয়হীনতায় সমগ্র জগত ঘৃণায় সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছে। যে প্রশ্নটিকে তাহারা এইভাবে উপেক্ষা করিল সে প্রশ্ন তো সুবিচারের প্রশ্ন নহে। সে প্রশ্ন সহজ সাধারণ মানবতার প্রশ্ন। ইহাই যে আমেরিকার প্রকৃত রূপ—গত দশ বৎসর ধরিয়া এইরূপ একটি ধারণা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে; আমেরিকার উপর একটা গভীর বিদ্বেষ সমস্ত জাতির মনে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। এই তরঙ্গের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করিয়াছি, আমরা জানিতাম আমাদের মতো

আপনাদের মধ্যেও রহিয়াছে দুইটি প্রকৃতি, দুইটি আমেরিকা। আমরা মহত্তর আমেরিকার উপরই ভরসা রাখিয়াছিলাম।

ড্রেইফ্যুস্ কলঙ্ক যেমন শুধু ফ্রান্সের কলঙ্ক নহে, আপনাদের এ-কলঙ্কও তেমনি শুধু আমেরিকার নহে; এ কলঙ্ক, এ ট্রাজেডি সমস্ত জগতের। দেখা গেল আমেরিকার যে-অংশ নিকৃষ্ট ও নিষ্ঠুর তাহার প্রবলতা অপরাজেয়, তাহার আধিপত্য সর্বগ্রাসী, দূর হইতে মনে হয় তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পর্যন্ত নাই। এই আমেরিকার হৃদয় নাই, মানবতার আবেদনের কোনো সাড়া তাহার মধ্যে জাগে না। সে শুধু জানে আইন, বর্বর দানবীয় আইন, এ-আইনের শাসনে দণ্ডদাতা প্রথম বিচারকের উপরেই পুনর্বিচারের ভার পড়ে, কপটতার সহিত হৃদয়হীনতাকে সংযুক্ত করিয়া এ-আইন বিচারকে প্রহসনে পরিণত করে।

কিন্তু আজ কর্তব্য কি? ব্যবধানের প্রাচীর উঠিয়াছে। ইউরোপের জাতিসমূহের প্রকৃতি আমি ভালোভাবেই জানি; যে-যন্ত্রণায় আজ তাহাদের বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে তাহার সন্ধানও আমি রাখি। দেখিতেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহাদের আজ হইতে এক নৈতিক সংগ্রাম শুরু হইল। ছয় বৎসরই হোক, বিশ বৎসরই হোক, পঞ্চাশ বৎসর অথবা এক শতাব্দীই হোক, বাস্তব অবস্থার মধ্যে এ-সংগ্রাম একদিন রূপ পরিগ্রহ করিবেই। কারণ বিশ্বের বিবেকে আজ আঘাত লাগিয়াছে। আর যতদিন পর্যন্ত এ-আঘাতের প্রায়শ্চিত্ত না হয় ততদিন বিশ্বের বিবেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি আঘাতের কথা লেখা থাকে ইতিহাসের খাতায়।

এই হত্যার ফলে নিঃস্ব নগণ্য দুইজন ইতালীয়ানের * সভ্যজগতের

* ইহারা নগণ্য নহে। আমি ইহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এই চিঠি যখন লিখি তখন তাহাদের নৈতিকশক্তির কথা আমি বেশি জানিতাম না। পরে তাহাদের চমৎকার পত্রাবলী প্রকাশিত হওয়ায় উহা জানিতে পারিয়াছি।

আর. আর

শহীদের মধ্যে আসন পাকা হইয়া গেল। কালাস ও সির্‌ভেনের নামের মতো সাকো ও ভান্‌ৎসেত্তির নামও লোকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া উচ্চারণ করিবে। কিন্তু সাকো ও ভান্‌ৎসেত্তির জন্য আমেরিকার কোনো ভল্‌তেয়ের দেখা দিল না।

আমি আমেরিকান নই, কিন্তু আমেরিকাকে আমি ভালোবাসি। আইনের নিরাপদ আশ্রয়ে অপরাধ করিয়া পৃথিবীর চোখে আমেরিকাকে যাহারা হেয় করিয়াছে, আমেরিকার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে আমি তাহাদের অভিযুক্ত করিতেছি। বিচারের জঘন্য প্রহসনের দ্বারা মানুষের পবিত্রতম অধিকারকে তাহারা ধ্বংস করিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থনে

বালমঁ! বুনিন! আপনাদের বেদনা, তোমাদের তিক্ততা আমি বুঝি, অনুভব করি। যে-জগতকে মানুষ ভালোবাসিয়াছে যখন দেখে সে-জগত চিরদিনের মতো ধুলায় মিশিয়া যাইতেছে, নিরানন্দ নির্বান্ধব নির্বাসনে যখন চারিপাশে স্বার্থপর ঔদাসীন্য অথবা অনাত্মীয়ের অনুভূতিহীন করুণা ছাড়া আর কিছুই তাহার চোখে পড়ে না, যখন দেখে তাহার দুঃখের কাহিনীতে বিরক্ত হইয়া সকলেই মুখ ফিরাইয়া আবার নিজের কাজে মন দিতেছে, তখনকার চেয়ে বড় দুঃখ তার আর কি হইতে পারে? গত অক্টোবর মাসে বিপ্লবের বার্ষিকী উপলক্ষে রুশজনগণের উদ্দেশ্যে আমি এক বাণী প্রেরণ করি। এই উৎসব আপনাদের কাছে এক বিগত যুগের মৃত্যুর ঘোষণার মতো। তাই আমার এ-বাণীতে আপনারা ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছেন। এই বাণীতে আপনাদের মনে আমার প্রতি যদি ঘৃণাও জাগিয়া থাকে তাহাতেও বিস্মিত হইব না; আর যদি কোনো বিদ্বেষের ভাব আপনাদের চিঠিতে ফুটিয়া না উঠিয়া থাকে তবে সত্যই আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব ও বুঝিব এ-মহানুভবতার মূলে রহিয়াছে আপনাদের অটুট মনোবল; আপনাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বাড়িয়া যাইবে। আমার জবাব আপনাদের আঘাত করিতে পারে জানিয়াও, আশা করি, এই মনোবল লইয়াই ধীর চিত্তে আপনারা আজ আমার কথাগুলি শুনিবেন। না, আমি কখনও ভুলি নাই যে বিপ্লবের দশটি বৎসরে রাশিয়া অনেক কিছু খোয়াইয়াছে। তার পর্বতপ্রমাণ দুর্গতির পরিমাণ আমি জানি। এ

সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থনে

ক্ষতির কথা ভাবিতে বসিলে প্রায়ই আমি অভিভূত হইয়া পড়ি। কিন্তু বিপ্লবের রাশিয়ার সহিত পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির যে দ্বৈরথ-সংঘর্ষ আজ শুরু হইয়াছে তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি আর ইতস্তত করিতে পারি না। বালমঁ, বুনিন, নির্বাসিত রুশসম্প্রদায়ের মধ্যমণিদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আপনারা মানব মহত্তের যে প্রতীকই হউক না কেন আপনাদের স্বচ্ছ মোহমুক্ত দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই আপনারা দেখিতে পাইতেছেন ইউরোপ হইতে যাহারা আসিয়া আপনাদের সহিত হাত মিলাইতেছে তাহাদের আদর্শ ও আপনাদের আদর্শ এক নহে। আপনাদের নূতন বন্ধুর দল আসিতেছে বুর্জোয়া নৈতিক ব্যবস্থার ও বণিক সাম্রাজ্যবাদের নিকৃষ্টতম প্রতিক্রিয়ার স্তর হইতে। আপনারা তাহাদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। আপনারা ভালোভাবেই জানেন যে, যে রাশিয়াকে আনপারা ভালোবাসেন তাহার হাতে পায়ে আবার দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া জগতের অন্যান্য দুর্বল ও প্রতিরোধ অক্ষম জাতিগুলির মতো তাহাকে শোষণ করাই ইহাদের সোভিয়েট বিদ্বেষের একমাত্র লক্ষ। নূতন ও পুরাতন মহাদেশের যে সকল রাজনৈতিক তস্কর শাশ্বত নীতি ও আদর্শের নামে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অথবা গোপন চুক্তির বৈঠকে পৃথিবী লুণ্ঠনের বাঁটোয়ারা লইয়া আলোচনা বা কলহ করিতেছে তাহাদের প্রচারিত আদর্শবাদের পশ্চাতে যে কী গূঢ় অভিসন্ধি রহিয়াছে তাহা বুঝিতে আমাদের ও আপনাদের কাহারও তো বাকী নাই। আর ওদিকে রাশিয়ায় দেখিতেছি অবর্ণনীয় দুঃখ ও দুর্গতির মধ্যে দাড়াইয়া একটা জাতি কীভাবে এক নূতন ব্যবস্থার জন্ম দিতেছে। মাতৃগর্ভ হইতে সদ্যবিচ্ছিন্ন মানবশিশুর মতোই এই নূতন ব্যবস্থার সর্বাঙ্গে রক্ত ও ক্লেদ। বিরক্তিতে মন ভরিয়া যায়, ভয়ে শিহরিয়া উঠি, গভীর বিচ্যুতি ও ভীষণ অপরাধ দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি—তথাপি থাকিতে পারি না। ছুটিয়া যাই সেই নবজাতকের পাশে। দুহাতে তুলিয়া লই তাহাকে বুকের কাছে। সে যে আশা, সে যে মানুষের ভবিষ্যতের বড় দীন

বড় দুর্বল আশা। বালম, বুনিন! এ শিশু তোমাদেরই। তোমরা দূরে ঠেলিয়া দিলেও ইহার মধ্যে তোমাদেরই রক্ত রহিয়াছে। তোমরা অস্বীকার করিলেও এই শিশুই বড় হইয়া একদিন নিজের মধ্যে তোমাদেরই প্রতিচ্ছবি দেখিবে। কিন্তু আজ তোমাদের ও তাহার মধ্যে একটা রক্তের পরিখার, একটা অতলস্পর্শ গহ্বরের ব্যবধান। সে ও তোমরা আজ পরস্পরকে অস্বীকার করিতেছ। এই নূতন ব্যবস্থার কিছুই তোমরা জানিতে চাহ না। যে পরিবেশের মধ্যে তোমরা আবদ্ধ সেখান হইতে এ দেখা ও জানা সম্ভব নহে। আপনারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এ-ব্যবস্থার আমি কী জানি ও কেমন করিয়া জানি। আমি যাহা জানিয়াছি—তাহা সংবাদপত্র পড়িয়া নহে। কাগজ যে দলেরই হউক না কেন—সকলের সংবাদই পক্ষপাতদুষ্ট। আমি কোনো দলে নই। আপনারা কি জানেন না যে রাশিয়া বহির্জগতের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু পর্যটকদের আনাগোনার আর বিরাম নাই? যদিও আমার ছোট বাড়িটি যেখানে অবস্থিত সেখানে যাতায়াতের খুবই অসুবিধা তথাপি এমন একটি মাস যায় না যে মাসে বিনা আমন্ত্রণেই এই প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন না একজন আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে ফরাসী আছেন, ইংরাজ আছেন, জার্মান আছেন, আমেরিকান আছেন। সমস্ত জাতি ও মতবাদেরই লোক আছেন; আছেন অধ্যাপক, লেখক, চিকিৎসক প্রভৃতি সমস্ত ব্যবসায়েরই লোক। ইহাদের তিনভাগের দুইভাগ লোকেরই কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি কোনো অনুরক্তি নাই। অন্য সকলের মতো তাহারাও নিজেদের দ্বারা অথবা অন্যের দ্বারা প্রতারিত হইতে পারেন না। কিন্তু তাহারা সকলেই কপটতা, কুসংস্কার হইতে মুক্ত। কাহারও আছে উচ্চ আদর্শ ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি। যেমন, দ্যুয়ামেল, দ্যুরতাঁ, ইস্টমান, স্কটনিয়ারিং, গুইজো মিল্লিওলি, হায়া দেল্লা তোরে। যতই স্বাধীন ভাবে তাহারা বিচার ও সমালোচনা করুন না কেন তাহাদের মধ্যে

এমন একজনও নাই যিনি প্রাথমিক পুনর্গঠন ও প্রবল নবজাগরণের রূপ ও প্রকৃতি দেখিয়া বিস্মিত হন নাই। তাহাদের কথা আমি শুনি, লিখিয়া লই, তুলনা করি। তুলমুল বিচার করিয়া দেখি। যে সকল ভ্রমণকারী দুদিন ঘুরিয়াই ফিরিয়া আসেন, রাস্তার ঘটনা ও দৃশ্যের বাহিরে তলাইয়া দেখিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, সাধারণত তাহাদের ধারণাকে আমি গণনার মধ্যে আনি না। অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক শিক্ষাব্রতী প্রমুখ যে সকল ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞ প্রতীকচিহ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ পড়িতে অভ্যস্ত তাহাদের কথাই আমি বেশি করিয়া শুনি, সর্বশ্রেণীর ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞদের এই মিলনের ফলেই দেশের ব্যবধান উপেক্ষা করিয়া মাত্র আধখানা কথার মধ্যে দিয়াই তাহারা পরস্পরকে বুঝিতে পারে। বালমঁ, বুনিন! এই প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে আপনাদের স্বদেশবাসীও আছেন। তাহারা দেশ ছাড়েন নাই এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে আপনাদের ভক্ত। আপনারা কি জানেন না যে, বলশেভিকদের সহিত মতবিরোধ সত্ত্বেও বহু রুশপণ্ডিত মস্কো ও লেনিনগ্রাদের হাসপাতালে ও গবেষণাগারে কাজ করিয়া যাইতেছেন। এই মতবিরোধের কথা সকলেই জানে। তাহারাও অস্বীকার করেন না। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ দৈবাৎ কখনো কোনো বৈজ্ঞানিক কাজে পশ্চিমে আসেন, তিনি রাশিয়ায় ফিরিবার জন্য অধীর হইয়া উঠেন; বলেন তাহাদের কাজের সুবিধা সেইখানেই সব চেয়ে বেশি। 'ইউরোপ' পত্রিকায় সম্প্রতি ল্যুক দ্যুরতঁ্যা-র কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, দ্যুরতঁ্যা-র বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর কোনো দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে। এই প্রবন্ধগুলি পড়িলেই জানিতে পারিবেন যে ফ্রান্সের বিজ্ঞান সাধকেরা যখন সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে নৈরাশ্য ও অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন তখন রাশিয়ার ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে কর্মোন্মাদনার কী প্রবল জোয়ারই না আসিয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রই বা কতভাবেই না তাহাদের গবেষণা

কার্যে সাহায্য করিতেছে! আপনারা কি জানেন না বিজ্ঞান সেখানকার নূতন দেবতা? মার্শেলিন বার্থেল-এর যন্ত্রগুলিকে কেন্দ্র করিয়া একদিন আমাদের যে অসীম আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল সেই আশাই বিজ্ঞানপূজারী রাশিয়ার বুকে। জানি অন্য সকল দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক মতবাদ সম্পর্কে একথা খাটে না। তথাপি অনভিজ্ঞ হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও সেখানে এক প্রতিভাশালী তরুণ লেখকদলের সৃষ্টি হইয়াছে, আজ সেখানে তাহাদের অধ্যয়ন ও রচনার পরিমাণ ফ্রান্সকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। জানি সেখানে সেন্সর-ব্যবস্থা স্বাধীন রচনাকে পদে পদে ব্যাহত করে। এবং একবার নহে দশবার আমি ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। ইউরোপ পত্রিকার ১৫ই অক্টোবরের সংখ্যা যদি আপনারা খুলিয়া দেখেন তবে দেখিবেন লিবেরতেয়র পত্রিকায় লিখিত এক পত্রে ও লুনাচারস্কির নিকট লিখিত আরেকখানি পত্রে আমি লাল, সাদা ও কালো সর্বপ্রকার অত্যাচারীর বিরুদ্ধে চিন্তা ও আলোচনার স্বাধীনতাকে কি অটল দৃঢ়তায় সমর্থন করিয়াছি। কণ্ঠরোধকারীদের বর্ণবিচার আমি করি না। কিন্তু বালর্ম! আমাদের কাছে সেন্সর-প্রথার কথা বলা মার নিকট মাসিমার গল্প বলা। ব্যক্তিগতভাবে বলিতে গেলে নিজ দেশে আমায় বন্ধ করিয়াই এই প্রথা ক্ষান্ত হয় নাই। আমার বন্ধুদের নিকট হইতে আমার পক্ষসমর্থনের অধিকার হরণ করিয়া আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার অবাধ সুবিধা এই প্রথাই করিয়াছিল। পশ্চিম ইউরোপে আজ দুদিনের জন্য হয় তো সে একটু অবসর লইয়াছে, কিন্তু অধীর হইবেন না, সে আবার ফিরিয়া আসিবে। সেন্সর প্রথায় সোভিয়েট রাশিয়ার একচ্ছত্র অধিকার নহে। রাশিয়ার পক্ষ হইতে এ ধরনের দাবী করিলে হয়তো নিস্তব্ধ ইতালীর বুকে প্রহরায় দণ্ডায়মান ডুচে-র আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।......এই নিষ্ফল আলোচনা এখানেই শেষ হোক। আজ সর্বত্রই চিন্তার স্বাধীনতা বিপন্ন; যে পারিতেছে সেই তাহার টুঁটি চাপিয়া

ধরিতেছে। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে যে যুদ্ধের আয়োজন চলিয়াছে, তাহার প্রথম আঘাত নামিবে স্বাধীন চিন্তাজীবী আমাদেরই উপর। আমাদের রুশ সহযাত্রীরা যে আজ সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই চলিয়াছেন বলিয়া আমরা তাহাদের ভাগ্যে বিস্মিত হই নাই। সাহিত্যিক সহকর্মীদের পক্ষ সমর্থন আমরা করিব বটে কিন্তু সেই সাথে এই মিথ্যা দম্ভও আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে যে, আমাদের নিজেদের স্বার্থ ও সমগ্র সমাজের স্বার্থ এক নহে। আপনাদের রাশিয়ার জনসাধারণের শতকরা নব্বুই জন কৃষক মজুর। বুনিন আপনি নিজে এবং আপনার পূর্বে অনেক রুশ লেখকই তো আমাদের চোখের সম্মুখে রুশজীবনের প্রকৃত রূপ খুলিয়া ধরিয়াছেন। আপনাদের আঁকা ছবিতেও দেখিয়াছি : রাশিয়ার জনসাধারণের জীবন বিষবাষ্পাচ্ছন্ন বদ্ধজলার মতো—দেহে-মনে মন্থর মৃত্যুর অভিশাপ বহন করিয়া সে যেন দুর্দিনের শেষ ধাপটি কোনোমতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। কিন্তু আপনাদের বেদনার্ত হৃদয়ের এই করুণায় তাহাদের মুক্তির পথ এতটুকুও তো সুগম হয় নাই। আজ হয় তো জানিয়া থাকিবেন আপনার সেই বদ্ধজলার এখন কি অবস্থা। গুইদো মিল্লিওলি লিখিত 'সোভিয়েট গ্রাম' নামক পুস্তকখানি পড়ুন। এ বই এমন একজন লোকের পাকা দলিলের সাক্ষ্য যাহার রাশিয়ার ও কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরক্তি নাই। ইনি ইতালীর প্রতিনিধি পরিষদের একজন সভ্য। ক্যাথলিক ও উদারনৈতিক সাম্যবাদের বিপরীত প্রান্তে তাহার স্থান ; কিন্তু কৃষককুলে তাহার জন্ম। শৈশবকাল হইতেই কৃষকদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সহিত পরিচিত বলিয়াই তিনি রুশ কৃষকদের অবস্থা জানিবার জন্য রাশিয়ায় যান। তিনি দুইবার রাশিয়ায় যান এবং এক বছর থাকিয়া ইউরোপীয় রাশিয়ার প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন। এই অনুসন্ধানের ফল আপনাদের চোখের সম্মুখেই, তাহার সহিত বোঝাপড়া করুন।

তাহার কথা যদি সত্য হয়, যদি সত্যই রাশিয়ায় এমন এক নূতন কৃষকশ্রেণী দেখা দিয়া থাকে যে বহু যুগ সঞ্চিত জড়তার নাগপাশ ছিন্ন করিয়াছে, যে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মোহ কাটাইয়া উঠিয়াছে, বিজ্ঞানের শিক্ষাকে যে কাজে লাগাইতে শিখাইয়াছে এবং যে নিজের সহিত জাগাইয়া তুলিয়াছে রাশিয়ার মাটিকে—যদি সত্যই এমন এক নূতন ধরনের কৃষক সংগঠন সেখানে গড়িয়া উঠিয়া থাকে, সমষ্টিকল্যাণের প্রবল বাসনা ও আত্মশক্তি সম্পর্কে যথাযথ চেতনাই যাহার প্রেরণার উৎস, তবে বিপ্লবের পায়ে সাময়িকভাবে উৎসৃষ্ট বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দুর্দশা বিপ্লবের এমন কিছুই বেশি মূল্য নহে। একা মিল্লিওলি-ই ইহা দেখেন নাই। গত অক্টোবর মাসে মস্কোতে যে নিখিল রুশ কৃষক সম্মেলন হয় তাহাতে সমস্ত দলের বৈদেশিক দর্শকদের মধ্যেই যে কি উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাহা আপনি ধারণা করিতে পারিবেন না। বিশাল সোভিয়েট গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অঞ্চল হইতে, সুদূর প্রাচ্য ও মুসলমান অঞ্চল হইতে, হাজার হাজার নারী এই সম্মেলনে যোগ দেন। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে জাতির মানসক্ষেত্রে ও সঙ্ঘবদ্ধ কর্মক্ষেত্রে কী প্রচণ্ড প্রগতি সাধিত হইয়াছে এই সম্মেলন হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। আপনাদের জাতির মধ্যে এ সকল জাতি সুস্থ ছিল। ইহারা সোভিয়েটগুলির সৃষ্টি নহে, সোভিয়েটগুলির প্রেরণাতেই ইহারা বিপুল প্রাণাবেগে জাগিয়াছে। আপনাদের ভলগার মতোই প্রচণ্ড ও বিশাল প্রাণধারা—যে-ধারার একটি স্রোত আপনার প্রতিভা—সেই প্রাণধারার সম্মুখে শ্রদ্ধায় মাথা নত করিতে কি আপনার অপমান বোধ হয়? আপনারা শিশুদের সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা জারশাসনের উত্তরাধিকার এবং প্রায় সাত বৎসরব্যাপী বিদেশী যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পরিণাম। এই যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শুধু গ্রামের পর গ্রাম নহে, জেলার পর জেলা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

অপনাদের চোখে পড়িয়াছে শুধু সেই গৃহহীন শিশুর পাল, বিপ্লবের পূর্বে দেশের নানা বিপর্যয় যাহাদের উপর দিয়া গিয়াছে এবং বিপ্লবের কয়েক বৎসরের মারাত্মক সঙ্কটও যাহাদের পিষিয়া গিয়াছে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য যে সকল প্রয়াস সেখানে শুরু হইয়াছে—জার্মানির, সুইজারল্যাণ্ডের, এমন কি, যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতিগণও অত্যন্ত মনোযোগের সহিত যাহা লক্ষ করিতেছেন আপনারা তাহার খবর রাখেন না। আমাদের দিক হইতে শুধু এইটুকুই বলিতে পারি যে, জীবনমরণ বিপদ কাটাইয়া উঠিয়াই সোভিয়েট রাশিয়া যে, রাষ্ট্রের ব্যয় বরাদ্দের এক পঞ্চমাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতেছে এবং দেশের সর্বত্র, এমন কি গ্রামে গ্রামে ও প্রতি শ্রমিক-কেন্দ্রে, স্কুল ও লাইব্রেরী স্থাপন করিতেছে—এ ঘটনার গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করিব কেমন করিয়া। অনেকে রাশিয়ার যৌন-ব্যাভিচারের দৃষ্টান্ত দিয়া আনন্দ পান। সেখানে কতকগুলি দুঃসাহসী আইনের বলে নরনারীর সম্পর্কের প্রাচীন ধারণা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে চালিয়াছে। এই আইনের সুযোগ লইয়া কিছু যৌন-ব্যাভিচারও দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ-আইনগুলির উদ্দেশ্য শিশুকে রক্ষা করা। নরনারীর সম্মেলনের রূপ যাহাই হউক না কেন—শিশু পবিত্র। আর সোভিয়েট সমস্ত শিশুর সমানাধিকার স্বীকার করিয়াছে। ফল হয় তো অনেক সময় উদ্দেশ্য অনুযায়ী হয় না। তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া হয় তো অনেক সময় সংস্কারের প্রয়োগ ও পদ্ধতির উপলব্ধি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে-সীমাহীন বিশৃঙ্খলা রাশিয়ার বুকে রাজত্ব করিয়াছে তাহার ফলে জনশিক্ষা, নীতিবোধ ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সব কিছুই নূতন করিয়া গড়িতে হইতেছে, তার উপর গত দশ বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট গণতন্ত্রের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ বাহিরাক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের জন্য বারবার আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমার যে সকল বন্ধু রাশিয়া পরিদর্শন করিরা ফিরিয়া আসিয়াছে (দ্যুরতঁ্যা ও দ্যুয়ামেল-কে

আমি সাক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করিতেছি) সকলেরই চোখে পড়িয়াছে শিশু ও কিশোরদের আনন্দ এবং তরুণদের স্বাস্থ্য ও হর্ষোচ্ছলতা। অন্যদের কমবেশি আহুতি দেওয়া হইয়াছে।

যার বয়স চল্লিশ, গত দশ বৎসরের জীবন ধারণের সাংঘাতিক সমস্যায় সে আজ অকাল বার্ধক্যে অবসন্ন। সব কিছুই সেখানে ভবিষ্যতের জন্য, শিশুর জন্য পরিকল্পিত হইতেছে। আমি জানি আমার এ চিঠিতে আপনাদের মতের পরিবর্তন হইবে না। যে আঘাত আপনারা পাইতেছেন তাহার ক্ষত আপনাদের দেহে এত গভীর হইয়াছে যে, কোনো কিছুর ভালো দিকটা আর আপনাদের চোখে পড়িতেছে না। আপনাদের দুর্ভাগ্য যদি আমাকে ভোগ করিতে হইত, তবে আমিও আপনাদের মতোই হইতাম। যদি কখনও আমি একটি নির্দোষ মানুষকে শাস্তি ভোগ করিতে দেখি, তবে সে সমাজব্যবস্থা যতোই মহান হউক না কেন তাহার অপরাধ ভুলিতে কি ক্ষমা করিতে পারিব না। আপনাদের যুগের মতো একটি যুগের মানুষের সহিত আমি বহুদিন মানসজীবন যাপন করিয়াছি। বালর্ম! আপনাদের চিঠিতে আপনি আমাকে আমার থিয়েটার অব রেভলিউশনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ইহার রচনা আজও আমি বন্ধ করি নাই। সে সকল মহাপ্রাণকে বিপ্লবের আগুন আহুতি গ্রহণ করিয়াছে, নূতন রচনার জন্য আমাকে তাহাদের সহিত সংযোগ সাধন করিতে হইবে।

শাঁফর, রিভেরল, শেনিয়ে, লাভোয়াজিয়ে ও কঁদরসে-র বেদনা বিদ্বেষ ও শোকের অংশ আমি মনে মনে গ্রহণ করিয়াছি। আপনারা কি মনে করেন শেনিয়ে-র মস্তক যদি আমার চোখের সামনে ছিন্ন হইত তবে কি সেই হত্যাকারী-রাষ্ট্রকে আমি অন্তরের সমস্ত ঘৃণা লইয়া আক্রমণ করিতাম না? আপনারা কি মনে করেন নির্বাসিত মহাপ্রাণদের নিহত জিরঁদ্যার ভাগ্যের অংশ গ্রহণ করিতে লোভ হইত না? কিন্তু সেন্ট জাস্ট ও রোবেসপিয়র-এর

মতো হত্যাকারীদের দৌলতেই যে নূতন জগত গড়িয়া উঠিয়াছিল আজিকার ইউরোপের লিবারেলগণ তাহাতে গর্ব অনুভব করেন এবং যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রবাদিগণ রুশবিপ্লবকে ঘৃণা করেন তাহারাই হাসিমুখে ফরাসী বিপ্লবের সুবিধা ভোগ করেন। লক্ষ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে মানুষের প্রগতি কিনিতে হয়। অথচ এই প্রগতি সৃষ্টির কাজে যাহাদের পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবার কথা, এক মর্মান্তিক দৃষ্টিহীনতার ফলে তাহারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া মরে।

তথাপি মানুষের জগত আগাইয়া চলে। আজও সে আগাইয়া চলিয়াছে। চলিয়াছে আপনাদের উপর দিয়া, আমাদের উপর দিয়া।

আর. আর

রাশিয়ার নির্যাতন সম্পর্কে লিবেরতেয়র পত্রিকাতে লিখিত চিঠি

২৮শে মে, ১৯২৭

আপনারা যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমি জানি না। যে সকল সূত্রে উহা জানিতে পারি তাহাও যে কতখানি নির্ভরযোগ্য জানি না। তবে ঘটনাগুলি আমি অবিশ্বাস করি না। স্পেনবাসীদের মধ্যে একটি প্রচলিত কথা আছে, 'দুঃসংবাদ সব সময়েই সত্য।' এতদূর অবশ্য আমি বলিতে চাহি না, তবে গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে এ বিশ্বাস আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে যে প্রচণ্ড অস্থিরতা ও আলোড়নের যুগে রাজনীতিতে এমন অনেক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়া থাকে যাহা অন্যসময়ে কল্পনাতেও আসে না। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া ফাশিস্ট কি কমিউনিস্ট যে ধরনের গভর্নমেণ্টই হউক না কেন, ঠিক সেই সবই তাহারা করিতে শুরু করে যাহার জন্য একদিন

---

* সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট কর্তৃক এনার্কিস্ট ও রেভলিউশনারী সোশালিস্টদের নির্যাতনের প্রতিবাদ ছাপাইবার জন্য লিবেরতেয়র পত্রিকা আপন বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের তাহারা আক্রমণ করিত; এবং এইভাবে তাহারা নিজেদের ও নিজেদের ভাবাদর্শকে ধ্বংস ও ব্যর্থতার পথে লইয়া যায়।

ক্ষমতার এই অপব্যবহারকে আমি চিরদিনই আক্রমণ করিয়া আসিয়াছি, আজও আবার করিতেছি। বিশেষত দুঃখ বরণে ও আত্মত্যাগে অতীতে এক দিন যাহারা সঙ্গী ছিল তাহাদের বিরুদ্ধেই এই আঘাত আরও ঘৃণ্য।

তথাপি ইউরোপের সমস্ত স্বাধীন মানুষকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, স্বাধীনতার সম্মুখে আজ সাংঘাতিক দুর্দিন উপস্থিত এবং এক দুরূহ দায়িত্বকে তাহাদের অবিলম্বে বরণ করিয়া লইতে হইবে। স্মরণ করাইয়া দিতে চাই একটি কথা—রাশিয়া বিপন্ন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাপে আজ পৃথিবীতে সোভিয়েট গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমাবেশ গড়িয়া উঠিতেছে।

সমস্ত বিচ্যুতি, সমস্ত অপরাধ, সমস্ত অদূরদর্শিতা সত্ত্বেও রুশ বিপ্লবের মতো এত বিরাট, এত শক্তিমান, এত সম্ভাবনাময় সামাজিক প্রয়াস বর্তমানে ইউরোপে আর হয় নাই। যদি ইহা ধ্বংস হইয়া যায় তবে শুধু পৃথিবীর সর্বহারারাই ক্রীতদাসে পরিণত হইবে না, সামাজিক বা ব্যক্তিগত সর্বপ্রকারের স্বাধীনতারই সমাধি হইবে। এই পবিত্র স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বল্‌শেভিকরা নির্বোধের মত সংগ্রাম চালাইয়াছে বটে, কিন্তু এই স্বাধীনতাই তো বলশেভিক রাশিয়ার সবচেয়ে বড় বন্ধু। নূতন রাশিয়া ধ্বংস হইয়া গেলে পৃথিবী কয়েক স্তর পিছাইয়া যাইবে। এবং এশিয়ার স্বাধীনতাসংগ্রামের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ধনিক গোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদী পরিচালিত এক দানবীয় যুদ্ধের নাগপাশে ইউরোপের সমস্ত জাতিগুলি ক্রমেই জড়াইয়া পড়িতে থাকিবে।

অতএব, এই ভ্রাতৃঘাতী বিতর্কের আপাতত অবসান হোক। আমি আশা করি এনার্কিস্টদের, সোশাল রেভলিউশনারীদের ও অন্যান্য মতবিরোধী

বন্ধুদের রুশগভর্নমেণ্ট কারাগার হইতে মুক্তি দিবেন এবং তাহারাও শুভবুদ্ধি ও হৃদয়ের ঔদার্যের বলে সমস্ত বিদ্বেষ ভুলিয়া সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে অতীতের শত্রুর পাশাপাশি আসিয়া দাড়াইবেন।

এই মিলনের কার্যে আমরা যেন সাহায্য করিতে পারি। শত্রু দ্বারে সমাগত। সাম্রাজ্যে-সাম্রাজ্যে যুদ্ধ শুরু হইয়াছে। ইউরোপের স্বাধীনতাকে আমাদের রক্ষা করিতে হইবে।

আর. আর

(১৯২৭ সালের ১৫ই অক্টোবর ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত)

লুনাচারস্কির সহিত পত্র-বিনিময়

রলাঁর নিকট লুনাচারস্কি

মস্কো, ২রা সেপ্টেমবর, ১৯২৭

'বিপ্লব ও সংস্কৃতি' নামে আমরা একখানি নূতন পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'প্রাভদার' সহিত একত্রে ইহার সম্পাদনার ব্যবস্থা হইয়াছে। সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ যদি আপনি প্রথম সংখ্যাগুলির একটির জন্য লিখিতে পারেন তবে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব। সম্পাদকদের মতের সহিত মূলনীতির পার্থক্য থাকিলেও ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। এই যে অনুরোধ পত্র আপনাকে লিখিতেছি ইহা হইতেই আপনি বুঝিতে পারেন আমাদের সম্পাদকগণ আপনাকে কী গভীর শ্রদ্ধা করেন। আমাদের মতানৈক্য সত্ত্বেও আপনার সহযোগিতায় আমাদের জনগণ বিশেষ উপকৃত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। লিবেরতেয়র পত্রিকার জবাবে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়াই আমরা বুঝিয়াছি, আমাদের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেন এমন অনেক বুদ্ধিজীবীর দ্বিধা দুর্বলতা অপেক্ষা আপনার বাস্তবনিষ্ঠ অনাসক্ত বুদ্ধি

কত বড়। এ-কথা অবশ্য আমি বলিতেছি না যে ঐ জবাবে যাহা কিছু আপনি লিখিয়াছেন সব কিছুর সাথেই আমার মতের মিল আছে; তবে আপনার জবাবের মূল রাজনৈতিক সুরটি ন্যায় ও নীতির দিক হইতে সত্যই গভীর ও মহান।

লুনাচারস্কি,
জন-শিক্ষা-সচিবের দপ্তর

লুনাচারস্কির নিকট রলাঁ।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

প্রিয় লুনাচারস্কি,

আপনার চিঠি পাইয়াছি। আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুণ। যদিও বর্তমানে আমি যে কাজে ব্যস্ত আছি তাহাতে কোনো পত্রিকার সহিত নিয়মিতভাবে সহযোগিতা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে, তথাপি আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার সহিত একমত হইয়া আমি আপনাদের পত্রিকায় লিখিতে প্রস্তুত আছি।

সর্বোপরি আমি একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতে চাই। আন্তর্জাতিক বণিক স্বার্থের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত সংবাদসরবাহ প্রতিষ্ঠানগুলির অবিশ্রাম প্ররোচনার ফলে বিপ্লবী রাশিয়ার বিরুদ্ধে আজ যখন সমগ্র জগত জুড়িয়া একটা উদ্ধত জনমত সংহত হইয়া উঠিতেছে তখন স্বাধীন ফরাসী হিসাবে আমারও কর্তব্য আছে। যে প্রবঞ্চক প্রতিক্রিয়াশক্তি সারা ইউরোপের সমস্ত জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং রুশ বিপ্লবের অস্বস্তিকর মশালকে নিবাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে তাহাকে আবার আমি আঘাত হানিতে চাই।

রুশ বিপ্লবের সহিত কোথায় যে আমার বিরোধ তাহা আমি কখনো গোপন করি নাই। যে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে এই বিপ্লব ধ্বংস করিতে চাহে বিপ্লবের মধ্যে তাহারই কতকগুলি নিকৃষ্টতম অভিব্যক্তিকে—মতবাদের সংকীর্ণত্ব ও একনায়কত্বের মনোবৃত্তিকে—আমি কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমার এই বিতৃষ্ণা আমি গোপন করি নাই, রুশ বিপ্লবের হিংস্রতা ও দুমুখো নীতিকে আমি প্রথম হইতেই আক্রমণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু যাহারা প্রথম হইতেই এই বিপ্লবের মহত্ত্ব ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, আমি তাহাদেরই একজন। এ উপলব্ধি আমার কোনো দিনই ক্ষীণ হইবে না। আমার বিশ্বাস, রুশ বিপ্লব সমগ্র মানবসমাজের শক্তিমান অগ্রগামী অংশ।

বিপ্লবের কল্যাণেই আমি বিপ্লবের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা করিতে পারি নাই। যে সকল সুসময়ের বন্ধু দুর্দিনের আভাস পাইবামাত্রই রুশ বিপ্লবের পার্শ্ব হইতে পালাইয়া গিয়াছে, আমার বিশ্বাস তাহাদের চেয়ে আমার বন্ধুত্ব গভীর ও আন্তরিক। ইহার প্রমাণ আজ আপনারা পাইতেছেন। আপনাদের পার্টির পত্রিকায় স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য আজ আমাকে আহ্বান করিয়াছেন।

যদি আপনারা বুঝিয়া থাকেন যে সুস্থ স্থায়ী কোনো রুশ প্রতিষ্ঠানের বিকাশলাভের পক্ষে স্বাধীন আলোচনা একান্ত অপরিহার্য, যদি বুঝিয়া থাকেন যে শুধু এই আলোচনার দ্বারাই কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্র ও জনসাধারণের শিক্ষা হইতে পারে, তবেই আপনারা পৃথিবীর স্বাধীনচেতা মনস্বীদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিতে পারিবেন। যে সকল তেজোদ্দীপ্ত মনস্বী কোনো মতবাদকেই অন্ধভাবে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন এবং দক্ষিণপন্থীদের হউক বা বামপন্থীদের হউক সর্বপ্রকারের ফাশিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যারা বদ্ধপরিকর তাহাদেরও পূর্ণ সমর্থন আপনারা পাইবেন। আজ পৃথিবীতে মিথ্যা

ও পাশবিক নৃশংসতার অবাধ শাসন চলিয়াছে। ইহারই বিপুল বিরোধী-শক্তিকে আপনারা যদি উজ্জীবিত করিতে না পারেন তবে জয়লাভের কোনো আশাই আপনাদের নাই। জ্ঞান ও স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা আপনারা তুলিয়া ধরুন; যত আঘাতই আসুক না কেন পৃথিবীতে পরিশেষে আপনারাই জয়ী হইবেন।

রম্যাঁ রলাঁ

অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উপলক্ষে ভক্স্-এর নিমন্ত্রণের উত্তরে লিখিত। (সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত বহির্জগতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিষ্ঠানকে 'ভক্স্' বলা হয়।)

সোভিয়েটবাসীদের প্রতি

১৪ই অক্টোবর ১৯২৭

হে আমার রাশিয়ার ভ্রাতা ভগ্নিগণ, হে আমার বন্ধুগণ, আপনাদের আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের বার্ষিকী উৎসবে যোগদান করিতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম। কিন্তু স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভব হইল না। দেহে না হউক, মনে আপনাদের সঙ্গে রহিলাম, আপনাদের সমস্ত কমরেডদের নিকট আমি আমার এই বাণী পাঠাইতেছি।

জগত যখন তাহাকে স্বীকার করিতে চাহে নাই তখন হইতেই, তাহার দুর্দম সংগ্রামের সূচনাকাল হইতেই, রুশ বিপ্লবকে ইউরোপে যাহারা অভিনন্দন জানাইয়া আসিতেছেন, আমি তাহাদেরই একজন। এই বিপ্লবের সহিত আমার মতবিরোধকে আমি আন্তরিকভাবে বারংবার ঘোষণা

করিয়াছি বটে, তথাপি বিপ্লবের প্রতি আমার আসক্তিকে আমি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। আজ যখন দেখিতেছি, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত ফাশিজম্, সর্বপ্রকারের প্রতিক্রিয়াশীলতা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংবাদপত্র-জগত ও জনমতকে আপনাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতেছে, যখন দেখিতেছি এই সকল অকল্যাণের শক্তি স্বর্ণ-স্বার্থের ক্রীড়া-পুত্তলিকা দেশের গবর্ণমেণ্টগুলির উপর রুশ বিপ্লব ধ্বংস করিবার জন্য চাপ দিয়া সফলকাম হইতেছে তখন পশ্চিম ইউরোপের যে সকল শিল্পী ও মনস্বীদের আমি বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে পারি তাহাদের পক্ষ হইতে ও আমার নিজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদের সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ঘোষণা করিতেছি।

জাতি ও পরিবেশের প্রভেদ যতই থাকুক না কেন আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি ও আপনারাও আমাদের সঙ্গে আছেন। বিভিন্ন বিচিত্র পথে আমরা একই লক্ষ্যপথে চলিয়াছি। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক মতবাদ যে আমাদের মিলন ঘটাইয়াছে তাহা নহে, আমরা মিলিত হইয়াছি কর্মের উন্মাদনায়; এই কর্মের, এই শ্রমনারায়ণের আমরা সেবা করি ও পূজা করি। ইহাই পৃথিবীর রক্ত, ইহাই আমাদের নিশ্বাসবায়ু, ইহাই জীবনের মূল শক্তি। ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আমরা সকলেই সমান, সকলেই ভাই! সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট গণতন্ত্র সর্বপ্রথমে পৃথিবীতে ইহারই রাজত্ব স্থাপন করিয়াছে, তাই কামনা করি ইহা যেন চিরজীবী হয়!

ভ্রাতৃগণ, আসুন আজ আমরা এমন দিনে বিশ্বপতি কর্মের স্তবগান করি। মনের শ্রমিক দেহের শ্রমিক সকলে মিলিয়া যেন সমগ্র সফল কর্মধারার মধ্য দিয়া শ্রমজীবীসমাজের এক বিরাট মধুচক্র রচনা করিতে পারি। আমাদের মধ্যে কোনো পুরুষ মৌমাছি থাকিতে পারিবে না। এই মানুষ-মৌমাছিদের বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র যেন তাহাদের পাখার সংগীতে ও মধুর সুরভিতে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। আর. আর

সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থনে

সমাজ ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বার্ষিকী উপলক্ষে অভিনন্দন বাণী

৪ঠা নভেম্বর ১৯২৭,

উনিশ শো সতেরো সালের ৭ই নভেম্বরকে আমি ফরাসী বিপ্লবের গৌরবময় দিনগুলির পর সমাজ ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন বলিয়া মনে করি। ফরাসী বিপ্লব নূতন জগতকে প্রাচীন জগত হইতে যতখানি বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, বর্তমানকে অতীত হইতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন করিয়াছে মানুষের এই নূতন বিপুল পদক্ষেপ।

রুশ বিপ্লব যে অনেক ভুল ও অপরাধ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেজন্য তাহাকে তিরস্কার করিবার অধিকার ফরাসী বিপ্লবের এবং আজ যাহারা সেই বিপ্লবের নামে শপথ গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাদের নাই। কারণ রুশ বিপ্লবের চেয়ে অনেক বেশি ও অনেক মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে ফরাসী বিপ্লব নিজে।

উভয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল ইউরোপের সমবেত শক্তি হিংস্র-ভাবে সংগ্রাম করিয়াছে এবং উভয় বিপ্লবেই প্রতিপক্ষের আক্রণের কেন্দ্রস্থল হইয়াছে ইংলণ্ড। রুশ বিপ্লব আজ গণ-পরিষদ ও গণ-সম্মেলনের স্তর কাটাইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে আজ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের বিরুদ্ধে সতর্ক হইতে হইবে— সতর্ক হইতে হইবে ধনিক সম্প্রদায় ও সমর-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। ফরাসী বিপ্লব অপেক্ষা রুশ বিপ্লবের দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা বেশি। তাই বহির্জগতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের লোভ তাহাকে সংবরণ করিতে হইবে। তাহাকে নিজের গৃহ অর্থাৎ শ্রমজীবীর গণতন্ত্রকে মজবুত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই নূতন গৃহের গঠনকার্য যেদিন সমাপ্ত হইবে সেদিন সে দেখিবে ইউরোপের এবং পৃথিবীর অন্যান্য অনেক স্থানে তাহার বিনা হস্তক্ষেপেই

সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থনে

বহু পুরাতন পচা বাড়ি ধ্বসিয়া পড়িতেছে। কারণ দিনের অভ্যুদয়েই রাত্রির মৃত্যু।

সেদিন আমি দেখিয়া যাইতে পারিব না। কিন্তু গল্‌দের মোরগের মতো আমি ঊষার অভ্যুদয় ঘোষণা করিতেছি।

আর. আর

নিখিল-ইউরোপ সঙ্ঘ

২৮শে জানুয়ারি ১৯৩০

কাউণ্ট কুডেন্‌হোর-এর নিখিল ইউরোপ সঙ্ঘের সহিত নিজের নাম জড়িত করিতে আমি অস্বীকার করিয়াছি। নিখিল-ইউরোপ সঙ্ঘের আবরণের মধ্যে যতই আন্তরিক কল্যাণকামনা ও আদর্শবাদের মাহাত্ম্য থাক না কেন, ভবিষ্যতের পক্ষে উহার মধ্যে আমি বহু কুচক্রী-স্বার্থ ও বহু বিপদের ইঙ্গিত দেখিতে পাইতেছি। আমার এ ভয় অমূলক নহে যে, এই সঙ্ঘের প্রথম লক্ষ ইউরোপের বাহিরের সমস্ত পৃথিবীকে শোষণ করা এবং পরিশেষে অপর শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িত হওয়া।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের শাসকগণের প্রতি আর আস্থা নাই। আরও দুর্ভাগ্য, এই অবিশ্বাস আমাদের কানায় কানায় পূর্ণ হইয়াছে। কারণ এই শাসকেরাই একদিন আমাদের ভাগ্যে যুদ্ধ আনিয়াছিল এবং ইহাদের যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহারও কোনো প্রমাণ নাই। পরিবর্তন হইয়াছে শুধু তাহাদের অস্ত্রের। কাল তাহারা যেমন যুদ্ধকে ব্যবহার করিয়াছিল আজ ঠিক তেমনি শান্তিকে ব্যবহার করিতেছে মুনাফা শিকারের কাজে।

আমরা যেন কথার ফাঁদে পা না দিই, ; সভ্য নামের তালিকার পরিবর্তন না করিয়া শুধু মাত্র "জাতীয়" শব্দটির স্থানে "আন্তর্জাতিক" শব্দটি বসাইয়া দিলে কিছুই আসে যায় না। স্বেচ্ছাচারী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপেক্ষা আন্তর্জাতিক আর কিছুই নাই। পাশ্চাত্য ইউরোপের বড় বড় শিল্পপতি ও ফাশিস্ট বুর্জোয়া মহারথীদের পবিত্র মিলন আজ পৃথিবীর সবচেয়ে সাংঘাতিক বিপদগুলির একটি।

ইউরোপের এই ঘনায়মান বিপদের বিরুদ্ধে আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছে। এই বিপদের প্রথম লক্ষণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। যে-ইউরোপ সোভিয়েট ইউনিয়নকে সমগ্রভাবে স্বীকার না করে সে-ইউরোপকে আমি স্বীকার করি না। ভুল সে করিয়াছে সত্য কিন্তু এ ভুল তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। যে দানবীয় শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়া সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে সে তাহার জন্য রাখিয়া গিয়াছে দৈন্য, দুর্নীতি, অজ্ঞতা ও ধ্বংসের এক দুঃসহ গুরুভার উত্তরাধিকার; এই বিশালায়তন দেশের চারি পাশে শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকের দল। ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া সে যে ভুল করিয়াছে তাহার নগণ্যতায় বিস্মিত হইতে হয়। ভুল সে করিয়াছে স্বীকার করি, প্রথম অভ্যুদয়ে যে বিপুল স্বপ্ন সে আনিয়াছিল তাহা পূর্ণ হয় নাই স্বীকার করি, তথাপি লেনিনের দুঃসহ নির্মল আদর্শে অনুপ্রাণিত সোভিয়েট ইউনিয়ন আজও ফাশিজমের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীল ইউরোপের বিরুদ্ধে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এই ফাশিজমই কত বিচিত্র রূপেই না সমাজে ও রাষ্ট্রে তার বিষক্রীড়া শুরু করিয়া দিয়াছে।

সাবধান, যে-শান্তির প্রতিশ্রুতিই তাহারা দিক না কেন আপনাদের চারি পাশে কোনো দিনই যেন সতর্ক প্রহরীর অভাব না ঘটে। তথাকথিত বিশ্বস্ত মানুষদের বিশ্বাস করিয়া এই প্রহরীদের কোনো দিন বিদায় দিবেন না। সুস্থ গণতন্ত্রের নিজেকে নিজেরই রক্ষা করিতে হইবে।

মনে রাখিবেন, গতযুদ্ধ যাহারা শুরু করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, চিরদিনকার মতো যুদ্ধ শেষ করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সে যুদ্ধ। আগে আমি বেলিপ্যাসিফিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। সাবধান, আজ যেন আমাদের প্যাসিবেলিজীম্‌-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে না হয়।

সতর্কবাণী

৯ই এপ্রিল, ১৯৩০

আন্তর্জাতিক বণিকস্বার্থের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র-জগতে আজ কয়েকমাস ধরিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঘৃণ্যতম উপায়ে জনমত উত্তেজিত করিয়া তুলিবার এক কাপুরুষ অভিযান শুরু হইয়াছে। জনমতকে উত্তেজিত করিয়া গভর্নমেণ্টগুলিকে রুশবিরোধী নীতি গ্রহণে বাধ্য করানোই এই অভিযানের উদ্দেশ্য; আর ঐ নীতি গ্রহণের জন্য গভর্নমেণ্টগুলিও তো প্রস্তুত হইয়াই আছে।

আপনারা জনমত জাগ্রত করিতে চান? ভালো কথা, কিন্তু সাবধান! জনমত যেন আপনাদেরই বিরুদ্ধে জাগ্রত হইয়া না ওঠে। আজ আর মতবিরোধের প্রশ্ন নহে। আমাদের মধ্যে অনেকেই (লেখক নিজেও) কমিউনিস্ট নহেন। ইউরোপের কমিউনিস্টদের অনেকেই আবার মস্কোর রাজনৈতিক নেতৃত্ব মানিয়া চলেন না। কিন্তু এ সমস্ত বিরোধ আজ আপাতত থাক। স্বতন্ত্রবাদী অথবা সাম্যবাদী, সোশালিস্ট অথবা সিণ্ডিকালিস্ট, আসুন সকলে আমরা আজ সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে হাতে হাত মিলাইয়া দাঁড়াই। ন্যায়, ধর্ম ও সভ্যতার মুখোশ পরিয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির যে জঘন্যতম বিকৃতি বণিকের স্বর্ণলালসা, সমরলিপ্সুর হিংস্র হুঙ্কার ও স্বৈরাচারী শাসকের নির্বিবেক নির্যাতনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া পশ্চিম মহাদেশকে শৃঙ্খলিত করিয়াছে এবং রুশ বিপ্লবের মিত্রজাতিগুলিকে ও তাহাদের বিপুল সৃষ্টিপ্রয়াসকে ধ্বংস করিবার জন্য আমাদের জনগণকে নিয়োজিত করিতে চাহিতেছে তাহাকে আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না। আমরা ভালোভাবেই জানি, সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সৃষ্টিপ্রয়াসে আপনারা শঙ্কিত। তাহাদের সাফল্যে আপনারা যদি ভীত না হইতেন, তবে পাগলের মতো আজ আপনারা তাহাদের ধ্বংসের পরি-

কল্পনায় মাতিতেন না। তাহাদের পুনর্গঠনের এই বিরাট পরিকল্পনাকে বাধা দিবার আপনাদের আজ একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, আপনারা জানেন, এই পরিকল্পনাকে তাহারা যদি বাস্তবে পরিণত করিতে পারে (যাহা তিন বৎসরের মধ্যেই সম্ভব হইবার কথা) তবে সর্বহারার এই গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র তাহার বিশাল আয়তন লইয়া ইউরোপের বুকের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইবে এবং দাঁড়াইবে আপনাদের সর্বপ্রকারের আঘাতকে উপেক্ষা করিয়াই। আর ব্যর্থ করিয়া দিবে আপনাদের সমগ্র পৃথিবীকে শৃঙ্খলিত করিবার পরিকল্পনা। তখন আর সময় থাকিবে না। এ কথা আপনারা জানেন……

কিন্তু একথা আমরাও জানি। তাই আপনাদের মুখ হইতে আমরা মুখোশ ছিনাইয়া লইয়া জগতের কাছে আপনাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে চাই। চক্রান্তকারিগণ! নিজেদের ছায়ার মধ্যে আত্মগোপন কর। যে হাত তুলিয়াছ সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাহা নামাইয়া লও!

(১৯৩০ সালের ১৯শে এপ্রিল মর্দ পত্রিকায় প্রকাশিত ও মস্কোর 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত)

এউজেন রেলজিস্-এর পত্রের জবাব

[বুখারেস্টের লেখক এউজেন রেলজিস্ ১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে রলাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকট আন্তর্জাতিক শান্তি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। নিম্নে উদ্ধৃত চিঠিতে রলাঁ তাহার জবাব দেন।]

২০শে অক্টোবর, ১৯৩৯

প্রিয় রেলজিস্,

আপনার প্রশ্নগুলি পড়িলাম।

অনেকগুলি প্রশ্নই (১, ২, ৩) এমন এক ইউরোপ সম্পর্কে যাহাকে বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হইয়াছে। আমি স্পষ্টভাবে আপনাকে জানাইয়া দিতে চাই, এ-পথে আপনার সহিত সহযাত্রা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি এমন কোনো দলবন্ধনের কথা চিন্তা করিতে পারি না যাহা শুধু ইউরোপের মধ্যেই আবদ্ধ। এ-কথা অবশ্য বলি না যে, সম্মুখস্থ ভবিষ্যতের রাজনৈতিক বিবর্তনের এরূপ কোনো স্তর হইতে পারে না, অথবা জাতির অগ্রগতির পথে এরূপ কিছুর প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি এ স্তর উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছি, আর কখনো ফিরিয়া যাইব না। পরিষ্কার দেখিতেছি, ইউরোপীয়-বাদের ছদ্ম আবরণে, প্যান-ইউরোপা, ইউরোপীয়ান ফেডারেশন প্রভৃতি বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়া এক নূতন ধরনের সাংঘাতিক জাতীয়তাবাদ মাথা তুলিতেছে। সর্বগ্রাসী স্বার্থের শোষণশক্তির এই বৃহত্তম সমবায় বাকি পৃথিবীর বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জা শুরু করিয়াছে। এ-ধরনের সঙ্ঘগঠনের অর্থই শান্তি বিপন্ন এবং এ-ধরনের সঙ্ঘগঠনের ঘোষণামাত্রেই দেখা দিবে

ইহারই দুই তিনটি দানবীয় প্রতিদ্বন্দ্বী দল: দেখা দিবে প্যান-এশিয়া প্যান-আমেরিকা এবং তারপর নিশ্চয়ই দেখা দিবে প্যান-আফ্রিকা ইত্যাদি। ইউরোপের অধিবাসীদের নিকট এই কপট আবেদনের মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে দশটি জাতির নিজেদেরই সৃষ্ট এক বিরোধী-জগতের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জার আবেদন।

আমি ইহার সমর্থন করিতে পারি না। আমি ইহার বিরোধিতা করি। আমি এমন কোনো সঙ্ঘ স্বীকার করি না, যাহার দ্বার সমগ্র জগতের নিকট উন্মুক্ত নহে। আপনার মতো একজন স্বাধীন মনস্বী যে, ইউরোপ এশিয়া অথবা আমেরিকা এই মহাদেশগুলির কোনো একটির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে অস্বীকার করিয়া সময় নষ্ট করিতে পারেন, (আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে ইহাই আপনি করিয়াছেন) ইহাকে আমি দুর্লক্ষণ বলিয়াই মনে করি। আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছি যে প্রত্যেক দেশে একই প্রকৃতি ও একই ধারায় চিন্তা প্রবাহিত হইতেছে। বাস্তব, প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় বিচার-বুদ্ধি আর কাহারো নাই, এইরূপ মনে করা কূপমণ্ডুক প্রাচীন ইউরোপের কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নহে।

সম্প্রতি কতকগুলি বই-এ আমি দেখাইয়াছি, ভারতবর্ষের ও ক্যাথলিক ইউরোপের রহস্যবাদের উৎস একই, তাহাদের অভিব্যক্তিও প্রায় একই প্রকৃতির। যুক্তিবাদ চীনা প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ, এবং এমন কি ভারতবর্ষেও (ভারতবর্ষ কুড়িটি বিভিন্ন জাতি লইয়া গঠিত একটি ইউরোপের সমান) এই যুক্তিবাদ কয়েকটি মহান জাতির মানস-প্রকৃতিতে রহিয়াছে। মানুষের এই মানস-স্রোতকে আর দুইটি বিভিন্ন ভূখণ্ডে পৃথক করিয়া রাখা চলে না; আজ সর্বপ্রকারের ভাবধারাই আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে আজ অব্যাহত চলিয়াছে বৈজ্ঞানিক,

আধ্যাত্মিক, ধর্মগত ভাবধারার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার আদান প্রদান।

কলিকাতার স্যার জে. সি. বসুর বিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরকে যদি আমি লা সালেৎ-এর গবেষণাগারের সহিত তুলনা করি, তবে কেমন করিয়া আপনি ইউরোপের ভাবধারাকে প্রত্যক্ষবাদ ও এশিয়ার ভাবধারাকে রহস্যবাদ বলিবেন? বুদ্ধিজীবীরা আজ অন্ধের মতো এই যে ঝুটা মাপকাঠির প্রচলন করিতেছে তাহার ফলে ভবিষ্যতে মহাদেশে মহাদেশে সশস্ত্র সংঘর্ষের পথই প্রশস্ত হইতেছে। এ মাপকাঠি আমাদের বিসর্জন দিতে হইবে। মানুষ সর্বত্রই এক। তারতম্য যাহা কিছু তাহা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বৈষম্যের জন্য।

যে তুর্কী ও তাতার জগতকে আমরা গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া মৃত ও নিস্তব্ধ ভাবিয়া আসিতেছিলাম সেখানে আজ কী দ্রুত পরিবর্তনই না শুরু হইয়াছে। একদিকে এক প্রতিভাবান একনায়কের শাসনে নবীন তুর্কী জাগিয়া উঠিতেছে, অপরদিকে অদম্য সোভিয়েট প্রচারকার্যের ফলে এবং কৃষিবিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্‌দের অক্লান্ত পরিশ্রমে মধ্য-এশিয়ার বুকে গভীর অর্থনৈতিক পরিবর্তন শুরু হইয়াছে, মাথা তুলিতেছে অসংখ্য বিশাল শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। গতির আবেগে কাঁপিতেছে সমস্ত জগত। একটা ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে সর্বত্র। এ-জগতকে আমরা যেন কয়েকটি অতি-জাতিতে, কয়েকটি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করিয়া এই বিপুল সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করিয়া না দিই। যে আন্তর্জাতিকতা বিশ্বজনীন নয়, তাহার অস্তিত্ব আর থাকিতে পারিবে না।

তারপর রাজনীতির সমস্যা। এই সমস্যা সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণের ইঙ্গিত আপনি করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আমার মত ও মনোভাব আমি স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতেছি। চার-পাঁচটি প্রশ্নে বিভিন্নভাবে আপনি ইহারই

উল্লেখ করিয়াছেন এবং আপনার সমস্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে ঐ একই মনোভাব নিহিত রহিয়াছে! প্রশ্নগুলির মধ্য দিয়া রাজনীতির প্রতি আপনার একটা ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা ফুটিয়া উঠিয়াছে; মনে হয় রাজনীতিকে যেন আপনি আপনার চিন্তার ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিতে চাহেন।

আজকাল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই মনোভাব খুব প্রবল; কিন্তু এ-দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। 'সংগ্রামের উর্ধ্বে'র মধ্য দিয়া আমি যে আবেদন জানাইয়াছিলাম তাহা অনেকেই বুঝিতে পারে নাই। তাই, আপনার প্রশ্নাবলীর জবাবের সুযোগ লইয়া আজ আমার মত ব্যক্ত করিতে চাই।

ফরাসী লেখক জুলিয়ঁ বেঁদা মিথ্যার বেসাতিতে সিদ্ধহস্ত। দশ বছর আগে অন্য সকলের সাথে যুদ্ধের জোয়ারে ইনি গা ভাসাইয়াছিলেন। সহকর্মীদের প্রতি যে সকল বুদ্ধিজীবী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহাদের লইয়া দশ বছর পরে আজ ইনি আবার দল গড়িবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। সম্প্রতি ইহার একখানি বই-এ বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইনি নিজের জন্য এক বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন। মন এই বিগ্রহ। এ-বিগ্রহ চিরদিনই নিরাপদ, কারণ পাছে গায়ে সংগ্রামের আগুন লাগে এই ভয়ে বাস্তব জীবন হইতে এ-বিগ্রহ দূরেই থাকিবে। প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ হইতে বহু উর্ধ্বে এক অবাস্তব ভাবরাজ্যে এই মনের অবাধ সঞ্চরণ। রাজনীতির বল্‌গা যাহাদের হাতে এ 'মন' তাহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করে না; তাহাঁরাও ইহাকে ইচ্ছা করিয়াই উৎসাহ দেন। কারণ 'অপ্রযুক্ত' বুদ্ধির নির্লজ্জ বেসাতি যাহাদের পেশা এবং কলাশাস্ত্র গবেষণা যাহাদের বিলাস তাহাদের এই জনমনোরঞ্জনের আয়োজনের দিকেই নির্বোধেরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে অথচ বহির্জগতের বিশাল রণপ্রাঙ্গনে বিশ্বের জাতিপুঞ্জের ভাগ্যের যে-ওঠাপড়া চলিয়াছে সে-দিকে তাহারা তাকায় না।

এ খেলার মধ্যে আমি নাই। 'মসীকৌলিন্যের' বিশেষ সুবিধাভোগের লালসা আমার নাই। 'সংগ্রামের উর্ধ্বের' আবেদন আমি যখন প্রচার করি তখন আমার সতীর্থদের দুঃখভোগকে আমি অস্বীকার করি নাই; তাহাদের ভুলগুলিকে দেখাইয়াছিলাম এবং ঐ ভুল ভাঙ্গিতে চাহিয়াছিলাম। সফল হইতে পারি নাই। সে ভুল তাহাদের আজও আছে; কিন্তু আমি হাল ছাড়ি নাই। কর্মজগতের অবিচারকে আমি কোনো দিনই সহ্য করিব না, সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়াসও আমার কোনোদিনই থামিবে না।

আপনার কাছে রাজনীতি 'পরাশ্রয়ীর কাজ'। যে ভাগ্যান্বেষীর দলকে 'রাজনীতিজ্ঞ' বলা হইয়া থাকে, জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনীতির সুযোগগ্রহণ যাহাদের পেশা, এ-কথা শুধু তাহাদের বেলাতেই খাটে। সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানুষের দৈনন্দিন অন্ন আহরণ ও বণ্টনের জন্য মানবস্বার্থের সংগঠন এবং কোনো দেশের, অথবা কয়েকটি দেশের, অথবা সমগ্র মানবসমাজের সাধারণ স্বার্থ-শক্তি সুশৃঙ্খলভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করাই রাজনীতি। *panem quotidianum* বলিতে আমি বুঝি জীবনধারণের জন্য যাহা কিছুর প্রয়োজন সব কিছুই: অন্ন, জীবিকা, স্বাধীনতা······

আপনার কি মনে হয়, এসকল ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীর উদাসীন থাকা উচিত? এ উদাসীনতার ভাণ করা তাহার পক্ষে সাজে না, কারণ সমাজের ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির সহিতও এখানে তাহার পার্থক্য নাই—এ-সকল না হইলে তাহার একদিনও চলে না। অমর্ত মানসলোকের নামে মর্তজীবনের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করিবার অধিকার তাহার নাই, কারণ এই বাস্তবতাই তাহার মানস-জীবনের প্রথম উপাদান। যদি ব্যক্তিমানুষ হিসাবে ইহলৌকিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে মনের স্বাধীনতা সে ক্রয় করিতে চাহে, তবে বলিব বিপুল জনগণের নিকট হইতে এই সন্ন্যাসজীবন-যাপনের ক্ষমতা চাহিয়া লইবার অধিকার তাহার নাই, কারণ জীবনের দুঃখ কষ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মতো, তাহার মতো,

মনের এতখানি শক্তিসম্পদ সাধারণ মানুষের নাই। তাই, সর্বাগ্রে সাধারণ মানুষের দুঃখ মোচনের কথাই আমাদের ভাবিতে হইবে।

সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মরমী, ভারতের ফ্রান্সীস আসিসি, আমার প্রিয়তম মহর্ষি ঠাকুর রামকৃষ্ণের দুঃসাহসী ঘোষণা আমার কানে বাজিতেছে: 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' মনের কাজও খালি পেটে হয় না। রামকৃষ্ণের শক্তিমান শিষ্য ভারতের সেণ্টপল বিবেকানন্দের বিজয় পতাকায় লেখা ছিল এক বিষণ্ণ মহীয়সী বাণী—'দরিদ্র নারায়ণ'। তিনি বলিতেন, 'যতদিন আমার দেশে একটি কুকুর ক্ষুধিত থাকিবে, ততদিন তাহাকে খাওয়ানোই হইবে আমার একমাত্র ধর্ম।'

আমার ধর্মও তাই। ক্ষুধিত, নিপীড়িত, নির্যাতিতের সেবক আমি। আমার মনের ঐশ্বর্য তাহাদেরই জন্য, কিন্তু সর্বাগ্রে আমার কাছে তাহাদের দাবী: অন্নের, সুবিচারের, স্বাধীনতার। বুদ্ধিজীবীর বিশেষ সুযোগ সুবিধার অংশভুক আমি, সমাজকে সক্রিয় সাহায্য দানের ক্ষমতা আমার আছে। আর ক্ষমতা আছে বলিয়া কর্তব্যও আছে। তাই আমাকে সাধারণ মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির পথকে আলোকিত করিয়া তুলিতে হইবে, সমাজপ্রতারকদের মুখোশ খুলিয়া দিতে হইবে। যদি পারি তবে সমাজকে দিতে হইবে নির্ভুল পথের সন্ধান, সতর্ক করিয়া দিতে হইবে বিপদ সম্পর্কে। না, রাজনীতির দিক হইতে মুখ ফিরাইলে আমার চলিবে না; চিন্তা ও কর্মের মহাসমন্বয়কারী গান্ধীজীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমিও ঐ দু-এর মিলন ঘটাইতে প্রয়াসী হইব।

এ-কথা কেমন করিয়া মানিব যে বর্তমানের জন্য, যে-যুগে বাস করিতেছি সে-যুগের স্বার্থের জন্য সংগ্রাম, করিলে ভবিষ্যতের প্রতি এবং 'সর্বমানবের শাশ্বত স্বার্থের' প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে? বর্তমানের প্রতি উদাসীন থাকাই তো ভবিষ্যতের প্রতি, সর্বমানবের চিরন্তন স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

করা। চিন্তাক্ষেত্রের একটা অর্থহীন ভাববাদ দ্বারা বাস্তব কর্মের বিরোধিতা করা আজকাল একটা বিলাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, সত্যকার সামাজিক সুবিচার ও মানবিকতার চিরন্তন মূল্যের সহিত জাতির প্রকৃত স্বার্থের কোনোদিনই কোনো বিরোধ হইতে পারে না। সমরতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে আমি যে-সংগ্রাম করিতেছি তাহা ভাববাদী বুদ্ধিজীবী হিসাবে নহে। বাস্তববাদীর দৃষ্টি লইয়াই দেখিতেছি সমরতান্ত্রিকতা ও জাতীয়তাবাদ জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু, দেখিতেছি জাতির শত্রুরা জাতির বুদ্ধিকে কি ভাবে বিভ্রান্ত করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে, আর তার ফলে ভয়ে অন্য জাতিও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দেখিতেছি কি-ভাবে হত্যার স্থির লক্ষে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া সভ্যতার সমগ্র বিপুল প্রয়াস নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। যে-কেহ মানুষের ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম করিতে চাহে, তাহাকে নামিতে হইবে রাজনীতির ক্ষেত্রে, কিন্তু নামিতে হইবে মনের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়া, কারণ এই স্বাধীন দৃষ্টির ফলেই সে সমগ্র রণক্ষেত্রকে প্রভাবিত করিতে পারিবে।

'অবশিষ্ট সমগ্র দেহের সহিত মস্তিষ্কের যে সম্পর্ক' বুদ্ধিজীবিগণ অবশিষ্ট সমগ্র সমাজের সহিত নিজেদের সেই সম্পর্ক বলিয়া প্রচার করিতে চান। (বুদ্ধিজীবী বলিতে কাহাদের বুঝায় তাহা আগে জানা দরকার। 'কায়িক শ্রমজীবী' হইতে স্বতন্ত্র ধূলি-বিমুক্তদেহ কোনো বিশেষ গোষ্ঠী হিসাবে তাহাদের দেখা চলিবে না। যদি সেইভাবে দেখিতে চান, তবে আমি কোনো এক ৪ঠা আগস্টের রাত্রির কথা তুলিব, যে-রাত্রে বুদ্ধিজীবীদের সমস্ত বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটাইয়া তাহাদের কায়িক শ্রমজীবীদের দলভুক্ত করা হইয়াছিল।) সত্যই যদি বুদ্ধিজীবীরা এই অভিমান এখনো পোষণ করিয়া থাকেন তবে মানেনিয়াস আগ্রিপা-র গল্পের কথা তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে। এই 'মস্তিষ্ক' দেহের অন্যান্য অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ ছাড়া কি ভাবে চলিতে পারে। অতএব দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা যেন উহাদের সহিত সহযোগিতা করে।

'বুদ্ধিজীবীদের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ' ও 'মনের সেবকগণে'র কথা আপনার প্রশ্নাবলীর মধ্যে রহিয়াছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের দাম্ভিকতা হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার দাম্ভিকতা তাহাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কর্মী-মানুষের বৃহৎ সঙ্ঘের একটা অংশ ছাড়া তাহারা আর কিছুই নহে; সমস্ত শ্রমজীবী লইয়া যে সেনাবাহিনী গঠিত তাহারই একটি বিশেষ অস্ত্র তাহারা (প্রতিভার মতো)। তাহাদের রমণীয় কর্তব্য তাহারা যেন একাগ্রমনে সম্পন্ন করিয়া যায়, কিন্তু এ গর্ব যেন কোনোদিন তাহাদের মনে না আসে যে, অপর সহকর্মীদের কাজের চেয়ে তাহাদের কাজের গুরুত্ব বেশি। সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাশ্যবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতি যে-সকল বিপুল সামাজিক আন্দোলনের কথা আপনি লিখিয়াছেন, 'মনের সেবক সঙ্ঘের' মতো ঐ সকল আন্দোলনের প্রত্যেকটিরই লক্ষ সাধারণ মানুষের একই সাধারণ স্বার্থের সেবা। লক্ষ তাহাদের একই—মুক্ততর ও বৃহত্তর এক সমাজ সৃষ্টি। শুধু পদ্ধতি তাহাদের বিভিন্ন। কর্মক্ষেত্রে তাহারা প্রায়ই লক্ষের জন্য উপায়ের নির্মলতা বিসর্জন দেন। যাহারা কাজের জগতে নামিয়া আসেন, কাজের উন্মাদনায় তাহারা প্রায়ই ভাসিয়া যান। আন্দোলনের ধূলিধুম্রজালের মধ্যে লক্ষবস্তুকে বিস্মৃত হওয়া নেতাদের চলে না। কিন্তু 'নেতা' বলিতে আমি শুধু পেশাদার বুদ্ধিজীবীদের কথা বলিতেছি না। বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাহাদের যে-টুকু ক্ষমতা তাহাতে নেতৃত্ব চলে না; গত যুদ্ধেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধের জোয়ারের জন্য সকলের চেয়ে বেশি ভাসিয়া গিয়াছিল তাহারাই। নেতৃত্ব প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা, বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ইহাকে যথাযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। সমাজের কোনো

বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ইহা আবদ্ধ নহে; সব শ্রেণীর মধ্য হইতেই নেতৃত্ব আসিতে পারে। কিন্তু কোনো শ্রেণীতেই নেতা খুব বেশি জন্মায় না। সর্বপ্রকারের কর্মক্ষেত্রেই নেতার সংখ্যা খুব কম। জরেস, লেনিন, কামাল ও গান্ধী প্রকৃত নেতা। যে-সকল বুদ্ধিজীবী ইহাদের প্রতি বিরূপ, তাহারা যেন ইহাদের সম্মুখে অবাস্তব ভাবরাজ্যের দুর্গম পর্বতমালা খাড়া না করিয়া মনঃশক্তিতে আরো শক্তিমান এমন কর্মবীরদের নেতারূপে প্রকাশ করিতে পারেন, বাস্তব জগতের দুর্গম হইতে আরো দুর্গমে যাহারা তাহাদের পরিচালনা করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। যদি তাই তাহারা করিতে পারেন, তবে তাহাই তো হইবে সর্বাঙ্গসুন্দর সুস্থ 'রাজনীতি'।

'যুবশক্তির প্রতি আমার বাণী' (আপনার ১৩ নম্বরের প্রশ্ন) :

'চিন্তাকে কখনো কর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিও না। কাজ আছে দুই ধরনের; এক, সম্মুখবর্তী কর্তব্য ও দ্বিতীয় দূর-ভবিষ্যতের। দ্বিতীয়টিতে মনোযোগ দিতে গিয়া যেন প্রথমটিকে অবহেলা না করা হয় এবং প্রথমটিতে আত্মনিয়োগ করিতে গিয়া যেন চিন্তারাজ্যের বিস্তীর্ণ দিকচক্রবাল হইতে দৃষ্টি সরিয়া না যায়। যে-মানুষের মনঃশক্তি সক্রিয় সে যেন তার চিন্তাধারাকে বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের বুকের উপর দিয়া সুদূর ভবিষ্যতের বিশাল পটভূমিকায় পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারে। যে-চিন্তা সক্রিয় নহে, সে চিন্তা চিন্তাই নহে, সে চিন্তার অসাড়তা, সে মৃত্যু। যে নিষ্ফল, নিষ্প্রাণ কলা-উপাসনার অন্ধকূপে এ যুগের একদল মস্তিষ্কবিলাসী আত্মগোপন করিয়া 'চিন্তার জন্য চিন্তার সাধনা'র নেশায় মাতিয়া থাকিতে চাহিতেছে, তাহারা তো এক অতলস্পর্শ গহ্বরের একেবারে মুখের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের দেহ হইতে শবের গন্ধ বাহির হইতেছে। যাহা কাজ করে, তাহাই শুধু জীবন্ত। ইন আউফাং ভার ডী টাট······

তাই আমি তরুণদের নিকট শক্তিসঞ্চয়ের জন্য অবিশ্রাম আবেদন

জানাইতেছি। শক্তির এত প্রয়োজন বোধ হয় আর কোনো যুগেই হয় নাই। এ এক হিংস্র, নিষ্ঠুর ধ্বংসের যুগ। কিন্তু এই ধ্বংসের মধ্যে রহিয়াছে বিপুল সৃষ্টির সম্ভাবনা। এ যুগ প্রলয়ের, এ যুগ নবজীবনের। গৃহকোণে বসিয়া নিষ্ফল ক্রন্দনের সময় ইহা নহে। নূতন যে আলো জগতে নামিতেছে তাহার দিকে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইবার সময় আসিয়াছে। এ যেন দেবদূতের সহিত জেকবের সংঘর্ষ। নূতন ঊষার অভ্যুদয় পর্যন্ত ইহা চলিবে।…

দেবদূত বলিল: "আমাকে ছাড়ো, প্রভাত হইয়াছে।" জেকব বলিল: "আমাকে আশীর্বাদ না করিলে তোমাকে ছাড়িব না।" দেবদুত বলিল: "তুমি ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছ। তুমি আরো শক্তিমান হইয়াছ।"

আজ আমাদের সংগ্রাম ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে; আমাদের সংগ্রাম প্রাচীন ভাবধারার বিরুদ্ধে, মুমূর্ষু ও হিংস্র দেবতাদের বিরুদ্ধে আর ঐ কবন্ধ দেবতাদের লক্ষ লক্ষ অন্ধ পূজারীদের বিরুদ্ধে; আমরা গড়িব নূতন দেবতা ও নূতন মানবতা। প্রচণ্ড শক্তি ও পরিপূর্ণ আত্মাহুতি ভিন্ন ইহা সম্ভব নহে। ঈশ্বর করুন, এ কাজে আমরা যেন অযোগ্য প্রমাণিত না হই।…ভীভ লাকসিয়ঁ…ভীভ লা পেষ…

পরিশেষে আমার চিন্তাগুরু স্পিনোজার মহাবাণী স্মরণ করি:

"যুদ্ধ না থাকিলেই শান্তি হয় না,
আত্মার বীর্যে যে মহাগুণের জন্ম তাহাই শক্তি।"

আর. আর

ইউরোপের প্রতি

(গাস্ত রিয়-র জবাব)

জানুয়ারী, ১৯৩১

ন্যুভেল রেভ্যু মঁদেল পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনা গাস্ত রিয়-র প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে যে-সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে তাহার গুরুত্ব ইউরোপের স্বাধীন চিন্তাজীবীদের পক্ষে খুব বেশি। যদিও বর্তমানে আমি রোগশয্যায় তথাপি অবিলম্বে ইহার জবাব দেওয়া কর্তব্য মনে করি।

আমার সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি যে মৈত্রী ও সৌজন্য দেখাইয়াছেন তজ্জন্য গাস্ত রিয়-কে ধন্যবাদ। কিন্তু, আমার স্বভাব ও কর্মধারা সম্পর্কে তাহার ধারণা একেবারেই ভুল। পশ্চিম মহাদেশের অন্তর্লোকে যে রহস্যময়, সংগীতময়, অবচেতন মহাশক্তি ঘুমাইয়া আছে, তাহার আদিম ও গভীর উৎসকে আমি আমার সাহিত্যিক কর্মজীবনে আলোড়িত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছি সত্য, সত্য আমি স্বপ্নের শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছি, কিন্তু সেজন্য আমাকে বাস্তববিমুখ, স্বপ্নসঞ্চারী, ভাবতন্দ্রালু ভাবিবার অধিকার কাহারো নাই। ঐতিহাসিক গবেষণা শুধু আমার পেশা নহে, আমার স্বভাব। এ-ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টি মোহমুক্ত, মানুষের শাশ্বত দুষ্কৃতি ও অধঃপতনের ছবি দেখিতে আমার চোখ অভ্যস্ত, রাজনৈতিক মিথ্যায় আমি বিশ্বাস করি না, যে পবিত্র নীতিগুলির আবরণ সর্বদেশের, সর্বকালের রাষ্ট্রগুলি নিজেদের পবিত্র আত্মন্তরিতা ঢাকিয়া রাখে, তাহা আমাকে প্রতারিত করিতে পারে না।

ইউরোপের প্রতি

আমার কতকগুলি পুস্তকের সম্ভবত কিছুটা অসঙ্গত সাফল্যের ফলে জনসাধারণ আমার নিকট হইতে নির্দেশের প্রতীক্ষা করে। তাহাদের প্রতি আমার যে নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা পালন করিতে গিয়া তাহাদের গ্রহণশক্তি অনুযায়ী সমগ্র সত্যের একাংশ মাত্র আমি তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে সুবিধা আমি দিব না। কারণ, এ রচনা লিখিতেছি আমি আমার বুদ্ধিজীবী সতীর্থগণকে লক্ষ করিয়া। আজ প্রচণ্ড সংঘর্ষের মুখে তাহারাই তো ইউরোপের গণতান্ত্রিক মমস্বিতার সর্বোচ্চ সামরিক কর্তৃপক্ষ। অতএব, পূর্ণ সত্য গ্রহণের জন্য তাহারা প্রস্তুত থাকুন।

কাউণ্ট কণ্ডেনহোভে-কালের্গি-র প্যান-ইউরোপার সহিত ও মঃ ব্রিয়াঁ-র পরিকল্পনার সহিত (ব্রিয়াঁ-কে গাঁস্ত রিয়ঁ তাহার আবেগোদ্বেল অন্তরের পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন) নিজের নাম জড়িত করিতে যখন আমি অস্বীকার করি তখন এমন কোনো অলীক স্বর্ণস্বর্গের কল্পনা আমার মনে ছিল না যাহা বিংশ শতাব্দীর মধ্যে সম্ভব হইতে পারে অথবা মোটেই সম্ভব হইতে পারে না। আমার এই অস্বীকৃতির কারণ ছিল অত্যন্ত বাস্তব। যে-ভূমিখণ্ডের উপর আমরা পা রাখিয়াছি, যে-বেষ্টনীর মধ্যে আমরা দাঁড়াইয়া আছি সেখানে চারিপাশ হইতে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে; সেনাবাহিনীরা প্রস্তুত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে যে আঘাত আমাদের উপর নামিবে, আমরা কি-ভাবে তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করিব, আমাদের সম্মুখে আজ সেই প্রশ্নই বড় হইয়া উঠিয়াছে।

ফ্রান্স-ইউরোপ লীগের বুদ্ধিজীবীরা এ বিপদ সম্পর্কে সচেতন নহেন। আমি যদি তাহাদের সতর্ক করিয়া দিই, তবে আশা করি তাহারা ক্ষুব্ধ হইবেন না। যদি মাঝে মাঝে আমার কথা তাদের কাছে কঠোর ও তিক্ত মনে হয় তবে যেন তাহারা আমাকে ক্ষমা করেন। কারণ তাদের মতো আমিও

১৯১৪ সালের শেষ কয়েকমাসের পূর্ব পর্যন্ত অন্ধ ছিলাম ও প্রতারিত হইয়াছিলাম এবং তারপর হইতে সেই ভীষণ প্রবঞ্চনাকে আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি। তাই আশা করি, তাহাদের চোখ খুলিয়া দিবার অধিকার আমার আছে।

শ্বেত স্বাধীনতার পতাকাবাহী ইউরোপ ও আমেরিকার বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিতে রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাশাসনের অবসান হইয়া যেদিন হইতে গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেদিন হইতে ধূর্ত রাজনীতির পঞ্চশক্তি তথাকথিত 'জনগণের বাসনার' ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। এই 'জনগণের বাসনা' নিরূপণে কোনোদিনই জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয় না, বুদ্ধির ক্ষেত্রে তাহাদের নেতাদের ভাবাদর্শের দ্বারা তাহারা চিরদিনই বিভ্রান্ত হয়। সত্যকথা বলিতে গেলে, স্বৈরতন্ত্রের দিনেও ব্যক্তিগত লালসাকে ঢাকিবার জন্য শাসকদের ধর্ম, পিতৃভূমি প্রভৃতি গালভরা মিথ্যার সাহায্য লইতে হইত। কিন্তু, আজ যে টাকার শক্তি সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহার নির্লজ্জ আচরণ এবং আইন, বিচার ও স্বাধীনতার ছদ্মনামে গণতান্ত্রিকতার যে ব্যাভিচার চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যকার বিভেদ আরো বেশি স্পষ্ট ও গভীর।

বন্ধুগণ, যে জাগিয়া ঘুমাইতেছে সে ছাড়া আর সকলেরই আজ ঘুম ভাঙ্গা উচিত। সব প্রতারণা আজ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে জনসাধারণের কোনো রাষ্ট্রক্ষমতাই নাই, রাষ্ট্রের কিছুই তাহারা জানে না। তাহাদের একমাত্র জানিবার স্থান সংবাদপত্র কিন্তু সংবাদপত্র-জগতের পনেরো আনা আজ টাকার শক্তির পায়ে আত্মবিক্রয় করিয়াছে। সমালোচনার শক্তি ও মনোবৃত্তি তাহাদের একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কারণ ও ঘটনার অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে কেহই জনসাধারণকে শিখায় নাই ; রাজনীতির ধুরন্ধরগণের প্রয়োজন মতো অন্ধ উত্তেজনার জন্য

কিভাবে কতটুকু তাহাদের দেওয়া হইতেছে তাহারও বিচার করিতে তাহারা কোনোদিন শিক্ষা পায় নাই। এ বড় কঠিন শিক্ষা। এ-শিক্ষায় উৎসাহদান দূরে থাকুক রাষ্ট্র এ-শিক্ষায় বাধা দেয়; কারণ এ-শিক্ষা পাইলে জনসাধারণ প্রথমেই রাষ্ট্রের সমস্ত চাতুরী ধরিয়া ফেলিবে। স্বাধীন চিন্তাজীবীরাও জনগণের অগ্রজের মতো; কিন্তু অনুজদের এ-শিক্ষা দিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। কারণ তাহাদের সামাজিক শিক্ষা জনসাধারণের অপেক্ষা বেশিদূর অগ্রসর নহে; আর রাষ্ট্রের চতুরঙ্গ খেলায় তাহারাই প্রথমে ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হন।

ইউরোপের দুই অংশের মধ্যে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন পৃথিবীর ভূখণ্ড ও বাণিজ্য-বণ্টনের জঘন্য গোপন চুক্তিগুলি ও নানা কুকীর্তি ঢাকিবার জন্য উভয়পক্ষেরই প্রয়োজন হয় এমন কয়েকজন খ্যাতিমান ব্যক্তির, যাহারা স্বদেশহিতৈষণার, স্বদেশের জন্য আত্মবলিদানের মহিমার ও আত্মনিগ্রহের বীরোচিত আনন্দের স্তবগান গাহিতে পারেন। এমন লোক খুঁজিয়া পাইতে তাহাদের কষ্ট হয় না। আমি জানি কী ঐকান্তিকতা লইয়া, কতখানি আত্মনিগ্রহ বরণ করিয়াই না আমাদের এই বেদনাতুর ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিগণ তাহাদের এই কর্তব্য পালন করিয়াছেন—নিজেদেরই হউক বা নিজেদের গোষ্ঠীরই হউক, কতখানি আত্মদানই না তাহারা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার প্রাক্তন সহকর্মিগণ কী-বেদনা বহন করিয়াই না গণদেবতার স্তবগান রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও আমি জানি, কতখানি তাহারা প্রতারিত হইয়াছেন, কতজনকেই বা তাহারা প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। আর এ-কথা তাহাদের বলিয়াছিলাম বলিয়া কোনোদিন তাহারা আমাকে ক্ষমা করেন নাই।

তাহারা আর কি করিতে পারিতেন? আমি তখন দুঃখ ও বেদনার সহিত ধীরে ধীরে যৌবনের সমস্ত মোহপাশ হইতে নিজেকে ছিন্ন করিতেছিলাম,

ছিন্ন করিতেছিলাম আপনাকে সরকারী ইসিহাসের, জাতীয় ও সামাজিক আচার ও ঐতিহ্যের এবং রাষ্ট্রের সর্বপ্রকারের মিথ্যা প্রচারের নাগপাশ হইতে। সবেমাত্র তখন আতঙ্কের সহিত উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছি, মুক্তির আহ্বানে জাতির মধ্যে কী সাড়াই জাগিতে পারিত। সেদিন সে-কথা বলিতে সাহস ছিল না। আজ আছে। ১৯১৭ সালে এই আহ্বানেরই নির্দেশ দিয়াছিলেন লেনিন। নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি ইউরোপের সেনাবাহিনীকে, যাহারা তাদের যুদ্ধে পাঠাইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া রণক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে।

কিন্তু অতীতের কথা এখন থাক। সে দীর্ঘ স্বীকারোক্তি একদিন আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিবার সময় যেদিন পাইব সেদিন যাহা লিখিব তাহা হাজার মানুষের এমন মনের কথা যাহা সেদিন তাহারা সাহস করিয়া বলিতে পারে নাই। কিন্তু অতীতের কথা আজ থাক, বর্তমানই আজ সব; সেই ভীষণ আলোচনাই আজ করিব।

গাস্তঁ রিয়ঁ-র নেতৃত্বে ফ্রান্সের হৃদয়বান বুদ্ধিজীবিগণ আজ নূতন গান ধরিয়াছেন: 'ইউরোপ, আমার দেশ।' তাহারা দেখিতে পাইতেছেন না যে, তাহাদের এই নূতন গানে বর্তমানের শাসকশ্রেণীর নূতনতম স্বার্থকেই সেবা করা হইতেছে।

'বাস্তববাদী' ফরাসী নীতি বলিতে কি বুঝা যায়? যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ঘরে যাহা আসিয়াছে তাহা রক্ষা করা, নূতন এক যুদ্ধে জড়াইয়া না পড়িয়া। অতএব, শান্তি ও 'ফ্রান্স-ইউরোপে'র আইন স্থাপন করিতে হইবে ১৯১৯ সালের সন্ধিনামাগুলির ভিত্তিতে। কিন্তু এই সন্ধিনামাগুলি ন্যায় কি অন্যায়ের ভিত্তিতে রচিত, তাহারা বিজয়ী হিংসার কদর্যতম অপপ্রয়োগ না, অসাম্য ও অসহ্য অবিচারের স্তূপের উপর তাহারা রচিত হইয়াছে, সে-প্রশ্ন সযত্নে এড়াইয়া যাওয়া হইতেছে। ১৯১৯ সালের সন্ধিতে

যে ব্যবস্থাকে পাকা করা হইয়াছে ইউরোপের দুই-তৃতীয়াংশের পক্ষে তাহা অচল।

বিজিত জাতিগুলির অপরিমেয় দুঃখদুর্দশার কথা কোনো ফরাসী সূত্রেই জানিবার উপায় নাই।

বিপুল শক্তিতে নবজাগ্রত ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ উপবাসী জার্মানিকে যদি আর দুই এক বৎসরের অধিক এই নির্যাতন সহ্য করিতে হয়, তবে প্রচণ্ড জাতীয় ও সামাজিক আলোড়নে ইউরোপ কাঁপিতে থাকিবে। ফ্রান্সের মিত্ররাষ্ট্র পিলসুদ্‌স্কির পোল্যাণ্ড পোলিশ জনসাধারণ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির উপর অসহ্য নির্যাতন চালাইতেছে; হতাশায় উন্মাদ হইয়া হাঙ্গেরী কবরের গহ্বর হইতে শৌর্যবান জাতিকে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছে···স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে আজিকার ইউরোপ ইউরোপের অপমান ছাড়া আর কিছুই নহে। মুসোলিনির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যদি কোনো গুণ্ডা-সর্দার আজ ফ্রান্সের মহিমাকে ধুলিসাৎ করিতে চাহে, তবে তাহার আহ্বানমাত্রেই এই উন্মাদের দল তাহার চারিপাশে ভীড় করিবে।

রিয়ঁ-র মতো 'ইউরোপীয়ানদের' মধ্যে যদি সত্যকার বাস্তব-বোধ থাকে, তবে বিশ্বশান্তির ধ্বংসের আয়োজন করিয়া মৌখিক উদারতায় বিশ্ব-শান্তির নামগানে যাহারা মুখর হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া তাহারা তাহাদের বাস্তববোধের পরিচয় দিন। ইউরোপের শান্তি-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে তাহারা উদ্যোগী হইয়া আসুন, গভীরতম অবিচার ও জঘন্যতম বিদ্বেষকে দূর করিতে তাহারা সর্বপ্রযত্নে সর্বান্তকরণে চেষ্টা করুন, রাজনৈতিক দুরদর্শিতার পরিচয় দিন। তাহাদের নিজেদের দেশ ইউরোপের বুকের উপর যে অন্যায় অবিচারের ক্ষতচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে, সেগুলিকে দেখিবার ও স্বীকার করিবার মতো স্বচ্ছদৃষ্টি ও উদারতার পরিচয় দিন; সে অন্যায় অবিচারেব ক্ষতিপূরণের কথা নিজ হইতেই উত্থাপন করুন।

শান্তিব্যবস্থার এই পরিবর্তন যতই সংযত হউক না কেন, উহার ফলে বিজেতা জাতিগণের প্রচুর ক্ষতিস্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই; ইউরোপকে ধ্বংস করিবার মূল্য তাহাদের ভাগ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু এ-নীতি যিনি ফ্রান্সে প্রচার করিবেন, জনপ্রিয়তার আশা করা তাহার চলিবে না। কিন্তু শান্তি যিনি চাহিবেন শুধু মুখে নহে অন্তরের অন্তস্থল হইতে, তিনি যেন মনে রাখেন নিজের জীবন দিয়া এই শান্তিকামনার মূল্য তাহাকে দিতে হইবে। ইউরোপে এমন একটি বৃহৎ বিচারশালা খুলিবার দাবী আমি জানাইতেছি, যেখানে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিগণ সকলে একত্র ও আন্তরিকভাবে যথাসম্ভব সাধারণ জীবনযাত্রার সর্তাবলীর বিষয় আলোচনা করিবেন। যতদিন পর্যন্ত না এই সর্তাবলী আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততদিন পর্যন্ত 'ইউরোপ' কথাটি বারম্বার উচ্চারণ করিয়া লাভ নাই। ইউরোপ নাই। শিকল-পরা কতকগুলি জাতি শুধু পরস্পরের প্রতি রুখিয়া উঠিতেছে। শিকলগুলি ধরিয়া আছে কয়েকটি লোক। আপনারা কাহাদের সঙ্গে আছেন?

ইহা হইল শুধু প্রথম সমস্যা। এইবার দ্বিতীয়টির কথায় আসা যাক্।

ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে মিলন ঘটাইয়া পশ্চিম ভূখণ্ডে শাশ্বত শান্তি স্থাপনের কথাই ইউরোপের 'ইউরোপীয়ানদের' আজ একমাত্র চিন্তার বিষয়। ইহা স্বাভাবিক এবং কর্তব্য হিসাবেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহার জন্য আমি চিরদিনই চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই কাজই সব নহে। আমার মনের কথা খুলিয়া বলিয়া গেলে বলিতে হয়, ইহা আর বর্তমানের সবচেয়ে বড় সমস্যা নহে। জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে নূতন সংঘর্ষের সম্ভাবনা আর সবচেয়ে বড় বিপদ নহে। জার্মানিকে আমি ভালোভাবেই জানি; উন্মাদ অথচ ক্ষমতাহীন কয়েকটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছাড়া সেখানে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা কেহ ভাবে না। (৩)

জার্মানির বর্তমান আর্থিক অবস্থায় যুদ্ধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। লক্ষ করিবার বিষয় গতযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি লুডেনডর্ফ তাহার দেশ যাহাতে নূতন যুদ্ধে জড়াইয়া না পড়ে তজ্জন্য উন্মাদের মতো জার্মানিতে প্রচারপুস্তিকা ছড়াইতেছেন, কারণ নূতনভাবে যুদ্ধে সে যদি নামে তবে ত্রিশবৎসরব্যাপী যুদ্ধের মতো এ যুদ্ধও যে হত্যা ও ধ্বংসের লীলাভূমিতে পরিণত হইবে। লুডেনডর্ফ জার্মানির কবর আর নিজহাতে খুঁড়িতে চাহেন না।* তিনি পূর্ব হইতেই ঘোষণা করিয়াছেন যে যুদ্ধ যদি একান্তই শুরু হয় তবে তিনি উহাতে অংশ গ্রহণ করিবেন না। হিটলারপন্থীদের ভীতিপ্রদর্শন অপেক্ষা হাতেকলমে কাজের দিকেই ঝোঁক বেশি। সেখানকার রাজনৈতিক-দলগুলির আন্দোলন প্রহসন-মাত্র। আজ আসল খেলা চলিয়াছে ব্যবসায়ের জগতে।

জার্মানির বিখ্যাত পটাসিয়াম ব্যাবসায়ী আর্নল্ড রেশ্‌বের্গ ও ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী ব্যবসায়ীদের মধ্যে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে গোপন কারবার চলিয়াছে, একবছরের কিছু উপর হইল ইউরোপ পত্রিকায় তাহাকে আমি তীব্রভাবে আক্রমণ করি। ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে সামরিক মৈত্রীর যে ভয়াবহ পরিকল্পনা চলিয়াছে (রেশ্‌বের্গ নিজে প্রকাশ্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন) তাহার ফলে ফরাসী শিল্পপতিগণের লাভের অংশভুক্ত হইয়া বৃহৎ জার্মান-শিল্পগুলি আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। শুনা যাইতেছে, এ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা এখনই সবচেয়ে বেশি শুরু হইয়াছে। বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে জার্মানির বৃহৎ শিল্পগুলির যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাদের সমারোপকরণ উৎপাদন ব্যবসায়ে যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন খাটাইবার ক্ষমতা আর তাহাদের নাই। তাই জার্মানির সামরিক শিল্পগুলিকে পুনরায় উজ্জীবিত করিবার জন্য জার্মান শিল্পপতিগণ ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সাহায্য লাভের চেষ্টা

* পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে দেখা গিয়াছে এ সম্পর্কে আমি খুব বেশি আশা পোষণ করিয়াছিলাম (১৯৩৫ সালে লিখিত মন্তব্য)

করিতেছে। লাভের অংশ ছাড়াও তাহারা ফ্রান্সকে তাহার সমরোপকরণ বাড়াইবার সুযোগ দিতে চাহিতেছে। সামরিক সহযোগিতার এই দানবীয় পরিকল্পনাই নূতন নিখিল ইউরোপ আন্দোলনের মূলে গোপনে রসসিঞ্চন করিতেছে।

ফ্রান্স-ইউরোপ লীগ সম্পর্কে ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা কি ভাবেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটিকে ফুলচন্দনে ঢাকিয়া দিতে তাহাদের প্রাণ চায় কি না, জানিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। এদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে তাহাদের আমি কিছুতেই দিব না; তাহাদের পৃষ্ঠপোষকেরা ফ্রান্স-ইউরোপকে কোন মৃত্যুগহ্বরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন সে-সম্পর্কে নীরব থাকিতেও আমি তাহাদের দিব না! ইউরোপের সব চেয়ে শক্তিমান দুইটি রাষ্ট্র আজ যে তাহাদের অস্ত্রসজ্জা ও সেনাবাহিনী ক্রমেই বাড়াইয়া চলিয়াছে, সে কি শুধু করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্য। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাহারা আজ শিকার খুঁজিয়া ফিরিতেছে। একা এই কাজ সম্ভব নহে, ; তাই তাহারা ভাগ করিয়া লইয়াছে। এ শিকার কোথায়?

গাস্তঁ রিয়ঁ আমাকে বাইবেলের মেরীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রভু যীশুর মরমী প্রেমিকা মেরী প্রভুর পদতলে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া স্বপ্নে বিভোর। গস্তিঁ রিয়ঁ নিজে সজিয়াছেন মার্থা, প্রভুর জন্য খাবার রাঁধিতে তিনি ব্যস্ত। তিনি কি কখনও চোখ তুলিয়া প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন? বলিতে পারেন প্রভু কে?• কাল প্রভু কি ছিলেন, তিনি কি হইবেন?

কমিতে দে ফর্জ্ কিম্বা স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল? অথবা স্যার হেনরি ডেটারডিং? মার্থা যখন দেখিবে যে-প্রভুর ধ্যান সে করিতেছিল সে-প্রভুর আসনে কে আসিয়া বসিয়াছে তখন বিস্ময়ে ও আতঙ্কে নিশ্চয়ই সে রন্ধনভাণ্ড উল্টাইয়া ফেলিবে? আর আমি? আমি তো কোনোদিন মেরী হইতে চাহি নাই; আমার জন্মবন্ধন রুসো-র সহিত নহে; দিদেরোর সহিত। আমার কোনো প্রভু

নাই, কাহাকেও আমি আমার গৃহরক্ষার ভার দিই নাই। আমার পিতামহ কোলা ব্রেঞ্ঞঁ শিশুকাল হইতেই নিভেরনা-এর মেষগুলির মতো আমার মনে অবিশ্বাস আনিয়া দিয়াছিলেন।

"হতভাগ্য মেষের পাল আমরা! যদি শুধু নেকড়ের ভয় হয়, তবে আত্মরক্ষার পন্থা আমাদের ভালোই জানা আছে। কিন্তু মেষপালকের হাত হইতে আমাদের বাচাইবে কে?

আমি কখনো চোখ সম্পূর্ণ মুদিয়া ঘুমাই না। কয়েক বছর ধরিয়া লক্ষ করিতেছি শয়তান মেষপালকের দল সোভিয়েট ইউনিয়নকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিতেছি নির্বাসিত হোয়াইট রাশিয়ান ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলির সহিত তাহাদের কাপুরুষ সহযোগিতা: দেখিতেছি পোল্যাণ্ড ও বল্‌কান দেশগুলির ভাড়াটিয়া সৈন্য লইয়া সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্য আমাদের সামরিক মিশনগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। সম্প্রতি মস্কোতে যে বিচার হইয়া গেল (১) তাহাতে আমি বিস্মিত হই নাই। নিজেদের বাঁচাইবার জন্য স্বীকারোক্তিগুলিকে আরো একটু দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে রামাসনের মতো শয়তানেরা হয় তো কিছু বাড়াইয়া বলিয়াছিল কিন্তু তৎসত্বেও তাহাদের স্বীকারোক্তি যে মূলত সত্য তাহা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। শিকারীদের লক্ষ আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন। আজ পর্যন্ত সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সব চক্রান্তই যে তাহাদের ব্যর্থ হইয়াছে তাহার কারণ সোভিটের পক্ষে সৌভাগ্যবশত ইংরেজ, জার্মান ও ফরাসী বণিক ধুরন্ধরেরা প্রতিবারেই কালনেমির লঙ্কাভাগ করিতে গিয়া নিজেদের মধ্যেই কলহে মাতিয়াছেন। এই কলহ মিটিয়া যেদিন ইউরোপে একটি সামরিক ও বাণিজ্যিক শক্তিসঙ্ঘ

(১) ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ানদের বিচার।

গড়িয়া উঠিবে সেদিন সে-সজ্ঘ নিশ্চয়ই সোভিয়েট-জগতের সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে না। কারণ সামাজিক গঠনের দিকে হইতে সোভিয়েট-জগত তাহাদের বিপরীত, সোভিয়েট-ব্যবস্থা যতই সাফল্যের পথে অগ্রসর হইবে, তাহাদের অস্তিত্বও ততই বিপন্ন হইবে।

রিয়ঁকে আমি জিজ্ঞাসা করি: তিনি ও তার বন্ধুরা কোথায় স্থান লইবেন? কোন শিবিরে? তৈল ও পেট্রোলের বণিক ধুরন্ধররাও ইউরোপীয় বাণিজ্য-সজ্ঘের প্রতি আজও কি তাহারা আনুগত্য রক্ষা করিয়া চলিবেন? তা যদি না করেন তবে আর কি করিতে পারেন তাহারা? ফ্রাঁ জে—মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলুন তিনি। আমার কথা আমি বলিতেছি; "যে কোনো শত্রুর দ্বারাই সোভিয়েট ইউনিয়ন বিপন্ন হউক না কেন, আমি তাহার পাশে দাড়াইবই।" রাশিয়ানদের দোষত্রুটি সম্পর্কে আমি অন্ধ নহি। তাহাদের সে কথা আমি স্পষ্টভাবে জানাইয়াও থাকি। কিন্তু আমি জানি ও বিশ্বাস করি, রাশিয়ার মতো এতবড় দুঃসাহসী পরীক্ষায় আজ পর্যন্ত কোনো দেশ বা রাষ্ট্র আত্মনিয়োগ করে নাই; ভবিষ্যত সমাজের সবচেয়ে বড় আশা তাহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। যদি রাশিয়া ধ্বংস হইয়া যায়, তবে ইউরোপের ভবিষ্যৎ লইয়া আর কোনো দিন মাথা ঘামাইব না। বুঝিব, কয়েক শতাব্দীর মতো সেখানে অন্ধকার গভীর হইয়া নামিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু, ইহাই সব নহে। আমাদের নিজেদের গৃহদ্বারে আরো এক আগুন লাগিয়াছে। ইউরোপের যে-রূপের মোহে তরুণ গাস্ত রিয়ঁ মুগ্ধ সে-রূপ ১৭৯৮ সালের, মানুষের অধিকারের (Rights of Man) নবীন বাণীর প্রতীক, পুষ্পাচ্ছাদিতবক্ষ অনিন্দ্যসুন্দর যুক্তিরূপিনী দেবী মূর্তির (Goddess of Reason) নিকট হইতে ধার করা। তাহার সুরভিত রেণুপ্রলেপের অন্তরালে হিংস্র ভীষণ রূপ আত্মগোপন করিয়া আছে। আজিকার গণতন্ত্রের সবগুলিই সাম্রাজ্য। দুই তিনটা জানোয়ার নিজেদের

মধ্যে পৃথিবীটা ভাগ করিয়া লইয়াছে। বৃটিশ ব্যাঘ্র ভারবর্ষের বুকের গভীরে নিজের নখর এমনভাবে বসাইয়া দিয়াছে যে, না পারিবে সে তাহা টানিয়া তুলিতে, না পারিবে সে শিকার ছাড়িয়া একদিনও বাঁচিতে।

আমরা ফরাসীরা তাহাকে আমাদের হাত হইতে এই চমৎকার শিকার ছিনাইয়া লইতে দিয়াছিলাম। তারপর কিন্তু নানাভাবে এ-ক্ষতি আমরা পূরণ করিয়াছি। লক্ষ করিবার বিষয়, আমাদের সাম্রাজ্যবিস্তার ও তৃতীয় রিপাবলিক স্থাপনা হয় একই সময়ে। ভিক্তর য়্যুগো বলিতেন, "রিপাবলিকে 'পাবলিকান'রাই (শুঁড়ী) আছে।" রোমান রিপাবলিক শাসন করিত ক্র্যাসাস ও ভেরেস। আর আমরা পৃথিবীর চারিভাগের একভাগ দখল করিয়া ছিলাম শুধু আমাদের অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের, আমাদের অতুল ও অনিন্দ্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষা উপহার দিবার জন্য। কিন্তু এই অমূল্য উপহার লাভ করিয়াও তাহারা নিজেদের সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতিই ঝোঁক দেখাইতেছে বেশি। জীবনের ধর্ম ই কৃতঘ্নতা। কৃতঘ্ন না হইলে এশিয়ার মহান জাতিগুলি আজ স্বাধীনভাবে বাঁচিবার উদ্ধত দাবী জানাইতেছে কেন?

সর্বপ্রথমে জাপান অস্ত্রবলে তাহার সাবালকত্ব ঘোষণা করিয়াছে। জাগ্রত চীন আর ঘুমাইবে না। আত্মশক্তি-সচেতন গান্ধীজীর ভারতবর্ষ মহামুক্তির সঙ্কেত পাইয়াছে। এশিয়ার অবশিষ্টাংশ শীঘ্রই তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে; আমাদের ইন্দোচীনের সাম্রাজ্যের বুকে মুক্তিকামনার প্রথম স্পন্দন দেখা দিয়াছে—এ স্পন্দন অবশ্য আমাদের গণতন্ত্রের প্রতিভূগণ রক্তের স্রোতে ডুবাইয়া দিতে দ্বিধা করেন নাই। প্রাচীন মহাদেশের একতৃতীয়াংশ ব্যাপিয়া ইসলামের যে বিপুল জনসমাবেশ রহিয়াছে, তাহার বুকেও জাগিয়াছে ঐ স্পন্দন।

এ-প্রশ্ন উঠিবে আগামী কাল, এ প্রশ্ন উঠিয়াছে আজ: গাস্ত রিয় ও

তাহার বন্ধুগণ কোন পক্ষে দাঁড়াইবেন? রবারের দেবতার পক্ষে? না, স্বাধীনতার দেবী ও কলা, বিজ্ঞান, প্রগতি, সভ্যতা ও যুক্তিবাদের পক্ষে? এশিয়া ও আফ্রিকায় আমাদের যে বীর ভ্রাতাগণ শৃঙ্খল ছিঁড়িবার সংগ্রাম শুরু করিয়াছে তাহাদের দিকে? আমি স্পষ্ট জবাব চাই। ইউরোপে অন্ধ স্বার্থপরতার ফলে যে সংঘর্ষ আজ প্রায় অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে সেই সংঘর্ষ যখন শুরু হইবে, তখন বিদ্রোহী বিশ্বের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ইউরোপের ভাগ্যান্বেষীদের দাসানুদাস সাজিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবে কে?

অন্যের কথা জানি না, তবে আমার পক্ষ হইতে এ প্রশ্নের জবাব এই:

"সে দাসানুদাস আমি সাজিব না। সেই প্রলয়ঙ্কর বর্বর সংগ্রাম যদি কখনো তুমি আরম্ভ কর তবে, হে ইউরোপ, তোমার বিরুদ্ধে, তোমার উদ্ধত স্বৈরাচার ও উন্মত্ত ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিতে আমি দ্বিধা করিব না। ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোচীন প্রভৃতি প্রত্যেক শোষিত ও নিপীড়িত জাতির পাশে দাঁড়াইয়া আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইব। যে-সুবিচার ও পবিত্র অধিকারের কথা তোমাদের কপট ঘোষণায় তোমরা বারম্বার উচ্চারণ করিয়া থাক, শুধু তাহাদের নামেই আমি সংগ্রাম চালাইব না, আমার সংগ্রাম হইবে সভ্যতার নামেও। মহত্তর সভ্যতা ও মানবমনের সীমাহীন প্রগতির নামে চলিবে আমার এই সংগ্রাম। যে মহান জাতিগুলির স্বর্ণপিণ্ড শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া লুণ্ঠন করা হইয়াছে, অথচ যাহাদের লক্ষ বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার মানসসম্পদে আজো কেহ হাত দেয় নাই, সেই জাতিগুলির নৈতিক সমর্থনের দ্বারাই নিজেকে শক্তিমান ও সম্পদশালী করিয়া তোলাই আজ মানবসভ্যতা ও মানব-প্রগতির একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।"

আশা করিবার কিছু নাই তবু আশা করি, মানবসমাজের দুই অর্ধাংশের মধ্যে যে বিপুল সংঘর্ষ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সে সংঘর্ষ মানুষ যেন এড়াইতে

পারে। কিন্তু সংঘর্ষ যদি সত্যই শুরু হয়, মৃত্যুর এত নিকটে দাঁড়াইয়া মনের কথা আমি কিছুতেই গোপন করিতে পারিব না। লেনিন ও স্টালিনের সোভিয়েট ইউনিয়নকে এবং গান্ধী ও সান ইয়াৎ সেনের এশিয়াকে আমি বলি :

"ভ্রাতাগণ, আমার উপর নির্ভর কর। লক্ষ লোকের মধ্যে আমি স্বতন্ত্র। সারাজীবন এই লোকটি ইউরোপে স্বাধীনভাবে কথা কহিয়া আসিতেছে। আমার কণ্ঠস্বর জ্যাঁ ক্রিস্তফ ও কোলা ব্রেইঞঁ-র কণ্ঠস্বর। স্বাধীন কর্মী আমি, জগতের স্বাধীন কর্মীদের সহকর্মী আমি; জাতি, ধর্ম ও শ্রেণীর বন্ধনমুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত বিশ্বের শ্রমজীবীসাধারণের এক মহাসম্মেলনের পথ প্রস্তুত করিতে আমি আত্মদানে প্রস্তুত।"

আর ইউরোপের উদ্দেশ্যে বলি আমি :

"ইউরোপ, নিজেকে বিস্তৃত কর নতুবা ধ্বংস হইয়া যাও। বিশ্বের সমস্ত নূতন ও স্বাধীন শক্তিকে তুমি গ্রহণ কর। যে প্রাচীন খোলসের মধ্যে তুমি বদ্ধ হইয়া আছ, তাহা উজ্জ্বল বটে, কিন্তু তাহা পাথর হইয়া গিয়াছে। এ খোলস তুমি ভাঙো, ইউরোপ! বুক ভরিয়া নিশ্বাস টানো, তোমার সঙ্গে আমরাও টানি। ইউরোপের চেয়েও বড় বাসভূমি, বড় পিতৃভূমি আমরা চাই।"

আমার পিতৃভূমি অতীত নহে, ভবিষ্যৎ। আর উষার আলো তো ফুটিয়াছে।

আর. আর

এ-পত্রের জবাবে গাস্ত রিয়ঁ যখন রলাঁকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, তাহার স্থান ফ্রান্স-ইউরোপের পার্শ্বেই তখন রলাঁ তাহাকে নিম্নোক্ত জবাব দেন।

(১) ১৯১৯ সালের সন্ধিপত্রগুলি আইনত ও বাস্তবত ইউরোপকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। এ-সন্ধির পরিবর্তন না হইলে আমি ইউরোপকে ইউরোপ বলিয়া স্বীকার করিব না। অস্ট্রীয়া ও জার্মানির মধ্যে সম্প্রতি যে চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে আমার মতের পরিবর্তন তো হয়ই নাই, উপরন্তু মত আরো দৃঢ় হইয়াছে। এভাবে চলিলে শীঘ্রই এ-ধরনের আরো অনেক চুক্তি আপনারা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আমাদের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ খোলা আছে: হয় ফ্রান্স উদ্যোগী হইয়া এই পরিবর্তন ঘটাইবে, নতুবা ফ্রান্সের উদাসীনতা সত্বেও এই পরিবর্তন ঘটিবে এক মহা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়া। এবং সর্বোপরি, সর্বপ্রথম আশু কর্তব্য হইতেছে, যে মিথ্যা ও অসম্মানকর কতকগুলি নৈতিক শর্ত ঐ হিংসাত্মক সন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ঐগুলিকে বিজিতের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে সেগুলিকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা; নতুবা আজ হোক, কাল হোক বিজেতাকেই উহার ফলভোগ করিতে হইবে। এই বন্ধনের অপমান শুধু বিজিতকে আঘাত করে না, আঘাত করে আমাদের, আঘাত করে ফ্রান্সের প্রতিটি বিবেককে।

(২) যে-ইউরোপ সোভিয়েট ইউনিয়নকে স্বীকার করে না, সে-ইউরোপকে আমিও স্বীকার করিব না। আমাদের চোখে—আমার চোখে ও আমার প্রত্যেক আন্তরিক সহকর্মীর চোখে—সোভিয়েট ইউনিয়ন ভবিষ্যত ইউরোপের সবচেয়ে প্রাণবান ও ফলবান অংশ, শুধু সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেই তাহার প্রগতি সীমাবদ্ধ নহে মানুষের সর্বপ্রকার মানসশক্তির উদ্বোধনেরও সে প্রতীক। (বিভিন্ন নবজাগ্রত জাতিগুলির বিপুল প্রাণশক্তির উজ্জীবনই তাহার প্রমাণ)।

আমার এই দুইটি শর্ত যদি আপনারা স্বীকার করিয়া নেন তবেই

ইউরোপের কথা, তাহার কর্তব্যের কথা, অবশিষ্ট পৃথিবীতে তাহার নৈতিক অভিযানের কথা লইয়া আলোচনা করা চলিতে পারে।

যতদিন পর্যন্ত এ শর্ত দুইটি স্বীকৃত না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত ইউরোপ বলিয়া কিছুই নাই। যাহা আছে তাহা ইউরোপের মুখোশ মাত্র। এ-মুখোশ ছিঁড়িয়া ফেল। যে সকল রাজনৈতিক নেতাকে লোকে সন্দেহের চোখে দেখে, যাহারা শান্তির নামে যুদ্ধের সাধনা করে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যাহারা ধুরন্ধর তাহাদের শিবিরে আপনাদের ফ্রান্স-ইউরোপ আজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইউরোপ বলিতে যদি সরকারী প্যান-ইউরোপ বুঝায় তবে আমি নিজেকে ইউরোপ-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। আপনারা জানুন বা না জানুন, এই ঝুটা ইউরোপ আন্তর্জাতিক বণিকস্বার্থের এক বিশুদ্ধ সম্মেলন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই সম্মেলনই আপনাদের আদর্শবাদকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করিতেছে। এই ইউরোপের বিরুদ্ধে ও সেই নবীন, সবল ও বিশ্বের স্বাধীন শ্রমিকদের মহাসম্মেলনের পার্শ্বে দাঁড়াইব আমি।

এ ঘোষণা আমি অকুণ্ঠকণ্ঠেই করিতে চাই। আমার নামের মূল্য যত কমই হউক না কেন, প্রত্যেক দেশের স্বাধীন মনস্বীদের মধ্যেই এমন কিছু লোক আছেন যাহাদের নিকট আমার জবাবদিহি করিতে হইবে। কোনো প্রকারের আপোসের সহিত যেন আমার নাম জড়িত না হয়।

আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিবেন।

আর. আর

স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবতা

(সোভিয়েট লেখক ফেডর গ্লডকভ ও ইলিয়া সেলভিন্‌স্কিকে লিখিত)

ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১

প্রিয় কমরেডগণ,

আপনাদের চিঠিতে আমার প্রতি আপনাদের যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে তজ্জন্য ধন্যবাদ। আপনারা জানেন, পশ্চিম ইউরোপে আমি আপনাদের একজন অনুরক্ত বন্ধু ও সমর্থক। সোভিয়েট ইউনিয়নের লক্ষ ও কর্মে আমি বিশ্বাসী। যতদিন এ-দেহে জীবন থাকিবে ততদিন সোভিয়েট ইউনিয়নকে আমি সমর্থন করিবই। কিন্তু আমি নিজেকে স্বাতন্ত্র্যবাদী ও মানবতায় বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করায় আপনারা চিন্তিত হইয়াছেন।

কিন্তু বন্ধুগণ, ইহা সত্য। সত্যই আমি স্বাতন্ত্র্যবাদী; সত্যই আমি মানবতায় বিশ্বাস করি। এবং স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবতার এই উপাসকই আপনাদের পক্ষ লইয়া সংগ্রাম করিতেছে। ইহাকে অসম্ভব বলিয়া ঘোষণা না করিয়া, এই ঘটনায় খুশি হইয়া ওঠা কি আপনাদের উচিত নয়? স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবতার শ্রেষ্ঠ সমর্থকগণ যে আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন, ইহা কি আপনাদের কাছে আনন্দের কথা নয়?

ইলিয়া সেল্‌ভিন্‌স্কি, আপনি লিখিয়াছেন "ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই," আরো লিখিয়াছেন "বুদ্ধিজীবীরা কোনোদিন স্বাধীন ছিল না, কোনোদিন স্বাধীন থাকিতেও পারে না।"

আমার সমগ্র জীবন ইহার বিপরীতকেই সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। যে-জগতের মধ্যে আমি এতকাল বাস করিয়া আসিতেছি তাহা আমার জীবনের সমস্ত প্রিয়বস্তুর, আমার লক্ষ্যের, আমার অস্তিত্বের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে। তথাপি আমার স্বাধীনতাকে আমি কোনোদিন ক্ষুণ্ণ হইতে দিই নাই। এই স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া প্রায় পরিপূর্ণ এক মানসিক বিচ্ছেদ আমাকে বরণ করিতে হইয়াছে, একটা সার্বজনীন বিরোধিতার মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীন থাকিবার এই পরম কর্তব্য পালন করিতে গিয়া কোনো ত্যাগকেই আমি বড় করিয়া দেখি নাই, তাই আমার স্বাধীনতা আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছি। সমস্ত জীবন আমি স্বাধীন, বুদ্ধিজীবীসমাজে আমি প্রায় নিঃসঙ্গ। কারণ তাহাদের অন্ধ দম্ভ ও স্বার্থপর কুসংস্কারের অংশ আমি কোনোদিন গ্রহণ করি নাই। আমার দেশের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করিয়াছি, ১৯১৪ সালের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধকে আমি আক্রমণ করিয়াছি। এ সকল কাজে আমার কোনো সহযোগী ছিল না, তাই আমি ছিলাম নিঃসঙ্গ। যুদ্ধ থামিয়া গিয়া যখন শান্তি আসিল, সে শান্তির মধ্যে নিঃসঙ্গতা আমার আরো বাড়িয়া গেল; কারণ সে শান্তি মিথ্যা শান্তি, সে শান্তির পরিবর্তন আমি চাহিয়াছিলাম। পশ্চিম ইউরোপের মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে লইয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থনে ও সহযোগিতায় যখন আমি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি তখনও আমি প্রায় নিঃসঙ্গ।

ইলিয়া সেল্‌ভিন্‌স্কি, ইহার পরেও কি আপনি বলিবেন: "কেহ কখনও স্বাধীন থাকিতে পারে না"? মনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত তিনিই তো স্বাধীন। আজ যদি এই স্বাধীনের সংখ্যা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে তবে ভালোই হইয়াছে এবং জগতকে আত্মদানের দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রয়োজন তাহাদের আরো বেশি হইয়া পড়িয়াছে। আমৃত্যু আমি এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যাইব।

গ্লড্‌কভ্‌, আপনি লিখিয়াছেন, "আজ মানবতার কথা বলার কোনো অর্থই হয় না" কিন্তু আমার মনে হয় মানবতার কথা বলার প্রয়োজন আজই সব চেয়ে বেশি। কারণ, পশুপালের বীভৎস চীৎকারে পৃথিবী আজ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাই আজিকার মতো এত বিপদ মানবতার সম্মুখে আর কোনোদিন আসে নাই। এ যেন রণক্ষেত্রে কোনো এক পবিত্র পতাকা পদদলিত হইতে চলিয়াছে। উন্মাদদের পদতল হইতে এ পতাকা রক্ষার চেষ্টাই আমি করিতেছি।

বলা বাহুল্য, যে সকল প্রবঞ্চকের দল মানবতা ও শান্তির নাম লইয়া স্বেচ্ছাচারে মাতিয়াছে তাহাদের মুখোশ ছিঁড়িয়া ফেলা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ নাই। লিলুলি-র লেখকের মতো এত নিষ্ঠুরভাবে আর কে এই প্রবঞ্চকদের আক্রমণ করিয়াছে? কিন্তু প্রত্যেক আন্দোলনে, প্রত্যেক শিবিরে চিরদিনই একদল প্রবঞ্চক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। আপানাদের সমর্থকদের মধ্যেও তাহাদের অভাব নাই। শৃগালের মতো তাহারা সিংহকে অনুসরণ করিতেছে সিংহের ভুক্তাবশিষ্টে নিজেদের উদর পূরণের জন্য, আর সিংহ যদি কোনোদিন পীড়িত বা আহত হয় তবে সিংহ-মাংস আহার করিতেও এই ফেরুপাল দ্বিধা করিবে না। এই শবাহারী শৃগালের দলকে সিংহ বলিয়া যেন আমরা ভুল না করি। যে বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যবাদ ঘোষণা করিয়াছে "আমি মরিব তবু বিশ্বাস ছাড়িব না" তাহাকে আমরা যেন সেই জঘণ্য আত্মম্ভরিতার সহিত এক করিয়া না দেখি, স্বার্থপরতা, অহং-সর্বস্বতা ও ঐহিক সুখসম্ভোগ ছাড়া যাহার আর কোনো লক্ষ নাই। মানবতার ধ্বজাধারী যে সকল প্রবঞ্চকের দল আন্তর্জাতিক শান্তির নাম ভাঙ্গাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়া চলিয়াছে তাহারা যেন সেই বিপুল আত্মত্যাগের অগ্নিশিখাকে কলঙ্কিত ও ছায়াচ্ছন্ন না করিয়া তোলে। সে শিখা নির্যাতীত ও শোষিত মানুষের মুক্তির পথ আলোকিত করিতেছে, সে শিখায় সোভিয়েট ইউনিয়নবাসী আপনারা জ্বলিয়া সুন্দর

হইয়া উঠিতেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিবাসী হে আমার বন্ধুগণ, আপনারা স্বাধীন, এবং স্বাধীন বলিয়াই আপনাদের অজ্ঞাতসারেই আপনারা সত্যকার স্বাতন্ত্র্যবাদী। মানবতার পতাকা যে আপনারাই বহন করিতেছেন সম্ভবত সে-কথা আপনারা জানেন না।

আত্মভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারী মুক্ত শ্রমিকদের শিবিরে, আপনাদের শিবিরে, আমি মানবতার ও চিন্তার স্বাধীনতার দুই পবিত্র পতাকা বহন করিয়া আনিয়াছি। এ পতাকা দুইটিকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। ইহারা আপনাদের গর্বের বস্তু। মানবতা ও স্বাধীন মনঃস্বিতা আজ আপনাদের পাশে আসিয়া দাড়াইয়াছে, ইহা তো আপনাদের পক্ষে পরম আনন্দের কথা। মনে পড়ে সেক্সপীয়রের "এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার" কথা? পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারী মহাসংগ্রামের পূর্ব-সন্ধ্যার অন্ধকারে এণ্টনির শিবিরের উপরকার আকাশে এক রহস্যময় সংগীত ভাসিয়া যাইতে শোনা গেল—যেন কোনো অদৃশ্য অশ্বারোহীদল সংগীত ও বাদ্যের সমভিব্যহারে চলিয়া গেল। ইহা ডিওনিসসের অশ্বারোহীদল; ইহারাই এণ্টনির দেবতা। এণ্টনির দেবতারা আজ এণ্টনিকেই ছাড়িয়া যাইতেছে, যাহার মৃত্যু সন্নিকট তাহাকে তাহারা এইভাবেই পরিত্যাগ করে। পুরাতন জগতের দুই দেবতা, মানবতা ও স্বাধীনতা আপনাদের শত্রুর শিবির ত্যাগ করিয়া আসিতেছে। আসিতেছে তাহারা আপনাদের নিকট। সম্বর্দ্ধনা জানান তাহাদের! যাহারা তাহাদের পথ দেখাইয়া আনিতেছে জড়াইয়া ধরুন তাহাদের প্রসারিত হস্ত। তাহারা আপনাদেরই সহযোদ্ধা।

(মস্কোর লিটারেটর নয়া গেজেটে প্রকাশিত)

কমিউনিস্‌ট বস্তুবাদ

(সার্গে রাডিন কমিউনিস্ট বস্তুবাদ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া রলাঁর নিকট এক পত্র লেখেন। রলাঁ তাহার নিম্নোক্তরূপ জবাব দেন।)

১৯শে মার্চ, ১৯৩১

ভাববাদ ও বস্তুবাদ এই দুটি কথার উপর আমি কোনো গুরুত্ব আরোপ করি না। প্রায়ই দেখা যায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের জিনিসকে একই নামে ঢাকিয়া দেওয়া হয়। যদি কোনো লোক, যদি হাজার হাজার লোক বস্তুবাদের জন্য আত্মবিসর্জন করিতে সক্ষম হয় তবে প্রকৃতপক্ষে তাহারাই তো সত্যকার ভাববাদী। আর ভাববাদের পতাকার উপর গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কী আবর্জনাই না জমিয়াছে! আমার প্রথম যৌবন হইতেই আমার মন এই আবর্জনার প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল এবং ১৯০০ সালের পূর্বে লা ফোয়ার স্যুর লা প্লাস নামক পুস্তকের ভূমিকা হিসাবে সর্বপ্রথম আমি যে প্রবন্ধ প্রকাশ করি তাহার নাম ছিল "ভাববাদী বিষ"। মানুষকে তাহার ভাবধারা দিয়া বিচার করিবেন না, বিচার করবেন তাহাকে বাস্তব ঘটনার মাপকাঠিতে। মূল প্রশ্ন হইতেছে এই যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে আজ যে গঠনমূলক আন্দোলন চলিয়াছে তাহা কি সমাজকে এমন এক ভবিষ্যতের দিকে লইয়া যাইতেছে না, কেবলমাত্র যেখানেই শুধু সুবিচার ও সৃজনীশক্তির পূর্ণবিকাশ সম্ভব। আমার তো মনে হয়, সোভিয়েট-সাধনার গতি ঐ দিকেই। নূতন সমাজ সেখানে যাহারা গড়িয়া তুলিতেছেন তাহাদের হাতে মলিন মাটির ছাপ লাগিয়াছে বলিয়া তাহাদের দিক হইতে বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরাইয়া

লইবার অধিকার কাহারো নাই। তাহাদের সমুখে যে কাজ, সে কাজ অতি-মানবের কাজ। অতীতের আবর্জনার পাহাড়কে তাহাদের আগে ভাঙ্গিয়া দিতে হইতেছে; অতীতের আবর্জনার পাহাড় তাই তাহাদের বাধা দিতেছে। (এ বাধা শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নে নহে, এ বাধা সর্বত্র)। এ আবর্জনার গায়ে যতই আপনি সুরভিদ্রব্য ঢালুন না কেন ইহার পুতিগন্ধ আপনি রোধ করিতে পারিবেন না।

আপনার মতে "ভবিষ্যতের এক কাল্পনিক স্বর্গের" প্রতি ইহা "দূর হইতে অর্ঘ্যদান" ছাড়া আর কিছুই নহে। এ-কথা সত্য নহে। ইহা বাস্তবক্ষেত্রে একটি নীতিকে আশু প্রয়োগের প্রশ্ন। নীতিটি এই: যে কাজ করিবে সেই খাইবে এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাজ যে করিবে না, খাইবার অধিকারও তাহার থাকিবে না। এ নীতি মানুষের কাজ সমানভাবে বণ্টনের নীতি। এই অপক্ষপাত বণ্টনের ফলেই কোটি কোটি মানুষ পাইবে বিশ্রামের অধিকার ও ব্যক্তিগত বিকাশলাভের সুযোগ। যে পরাশ্রয়ী কীটের দল জীবনতরুর গভীরে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের দূর করিয়া দিতে হইবে। এই রক্তশোষকের দল আজ গাছের প্রাণরসের পনের আনা শুষিয়া খাইতেছে। যে বা যাহারা জীবনতরুকে এই কীটের কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিবে তাহাদের তুমি যে নামেই ডাকো, ভাববাদী, বস্তুবাদী, মার্ক্সবাদী, গান্ধীবাদী, খ্রীস্টপন্থী যাহা খুশি বল কিছুই আসে যায় না। ভুল সে করিতে পারে কারণ মানুষ মাত্রেই ভুল করে। কিন্তু আমার মনে হয় লেনিন ও স্টালিনের মতো মানুষেরা প্রাচীন ও অভিজ্ঞ উদ্যানরক্ষক। মাটিকে তাহারা চেনেন, সারাজীবন তাহারা এই মাটি লইয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু শিখিতে পারি। বহুদিন ধরিয়া তাহাদিগকে লক্ষ করিয়া তাহাদের প্রতি আমার আস্থা জন্মিয়াছে। ভবিষ্যতেই সব কিছু প্রমাণিত হইবে।

গর্কির প্রতি রলাঁ

দিগন্তের দুই বিপরীত প্রান্ত হইতে আসিয়া আমরা ভ্রাতৃত্বের সংঘর্ষে সম্মিলিত হইয়াছি, গর্কি ও আমার মধ্যে যে বন্ধন তাহার বিশেষত্ব এইখানেই। তিনি আসিয়াছিলেন প্রাচীন রাশিয়ার শক্ত সাধারণ জোয়ান মানুষের মধ্য হইতে; আর ভগ্নস্বাস্থ্য অথচ অদম্য মনোবল লইয়া আমি আসিয়াছিলাম প্রাচীন ফরাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে। বিশাল জীবন ও জগতের পথে পথে তাহার শিক্ষা আর আমার শিক্ষা ইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঞ্চেতে কনুইয়ের দাগ রাখিয়া। বাস্তবক্ষেত্রে গর্কি যে আমার চেয়ে অনেক কঠোর জীবন যাপন করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করি না কিন্তু, নৈতিক জীবনে কষ্ট ও কঠোরতা তাহার অপেক্ষা আমার কম নহে। কারণ কুসংস্কারের জঙ্গল ও জলা ভাঙ্গিয়া আমাদের দুইজনকেই পথ করিয়া লইতে হইয়াছে। জনসাধারণের কুসংস্কার আছে, মধ্যবিত্তশ্রেণীরও কুসংস্কার আছে, বুর্জোয়াদের কুসংস্কারও খুব বেশি গোপন বস্তু নয়। অজ্ঞতা ও বিদ্বেষের এই অন্ধকারের মধ্যে আলোক প্রবেশ করানো সহজ নয়।

স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রাম করিতে করিতে যেদিন আমরা মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইলাম সেইদিনই আমরা বন্ধু বলিয়া পরস্পরকে চিনিতে পারিলাম।

আমাদের জীবনের ইতিহাস এক নহে, মনের গঠনও স্বতন্ত্র কিন্তু একই অভিজ্ঞতার অগ্নিপরীক্ষা আমাদের উভয়কেই দিতে হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতার দুই রূপ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তিলে তিলে স্তূপীকৃত মানব সংস্কৃতির মহিমা ও মূল্যকে একদিকে যেমন আমরা দুইজনেই প্রাণের সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছি, অপরদিকে তেমনি যে শ্রেণী নিজেকে এই সংস্কৃতির

অভিভাবক করিয়া তুলিয়াছে সেই শ্রেণীর প্রায় সমগ্র অংশের তীব্র বিদ্বেষ আমাদের দুইজনকেই সহ্য করিতে হইয়াছে। নিজেদের কৌলিন্য সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন এই বুদ্ধিজীবীর জাত গত দুই শতাব্দীর মধ্যে ফ্রান্সের অভিজাত শাসকশ্রেণীর ক্ষমতা আহরণ করিয়া '৮৯ সালের বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করিয়াছে সমগ্র জাতিকে মুক্তি দিবার জন্য নয়,—জন্ম কৌলীন্যের ধ্বংসস্তূপের উপর মুষ্টিমেয় মস্তিস্কজীবীর আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, সমস্ত শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর বুর্জোয়া-শাসনের পতাকা তুলিবার জন্য। কারণ, এই বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যমণি বলিয়াই তাহারা নিজেদের মনে করিতেন।

অল্পদিন পূর্বে প্রকাশিত ডি. জাসাল'ভস্কির একটি প্রবন্ধে আমি পড়িয়াছি, অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে গর্কি সংবাদপত্রের মারফৎ যে প্রচার অভিযান আরম্ভ করেন তাহাতে তিনি আসল সংস্কৃতি-সমস্যার অবতারণা করিয়া রাশিয়ার মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর ক্লীবত্ব, ক্ষীয়ত্ব ও অসার বাক্‌বিভূতিকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করেন।

ঠিক ঐ সময় আমার জ্যাঁ ক্রিস্তফ্ পারির বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে, আর্ট ও চিন্তাক্ষেত্রের সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে, কলাবিদ-শ্রেণীর যুক্তিহীন ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে।

ধর্মকে জনসাধারণের আফিম বলা হইয়াছে। গত পঞ্চাশ বৎসর ইউরোপে ধর্মের চেয়ে আর্ট ও সাহিত্য সম্পর্কেই ঐ কথাটি অনেক বেশি সত্য। জনসাধারণের বিবেকবুদ্ধিকে তাহারা নির্জীব করিয়াছে, মানুষকে সামাজিক দায়িত্ব এড়াইবার পথ দেখাইয়াছে, বাস্তব জীবন হইতে যাহারা পলাতক তাহাদের আশ্রয় দিয়াছে। "কোনো অবিচারের সংস্পর্শে আমি থাকিতে চাই না," এই অজুহাতে মানুষকে কাজ ও কর্তব্য এড়াইবার সুযোগ দিয়াছে এই সাহিত্য ও আর্ট। গত শতাব্দীর শেষভাগে দ্রেইফ্যুস ব্যাপার লইয়া যে সঙ্কটের সৃষ্টি হয় তাহার প্রবল আলোড়নে জোলার মতো মহাপ্রাণ

ব্যক্তি স্থির থাকিতে পারে নাই সত্য; কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী বিদ্রোহের আকস্মিক উন্মাদনায় জনসাধারণের সহিত সর্বাধিক সাহসী ও স্বার্থত্যাগী বুদ্ধিজীবীর সাময়িক সম্মেলন ছাড়া আর কিছুই নয়। পরক্ষণেই, আবার তাহারা যে-যাহার শিবিরে ফিরিয়া যায়, সেখান হইতে আজ পর্যন্ত তাহারা বাহিরে আসে নাই।

গত পনের বৎসরের পূর্ব পর্যন্তও আমাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ ও অগ্রণী তাহারা কেহই স্বাতন্ত্র্যের অন্ধ গলি হইতে বাহিরে আসিবার পথ খুঁজিয়া পান নাই। জনজগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শুধুমাত্র বিবেকের নির্দেশেই আমরা কাজ করিয়া চলিয়াছিলাম। এইখানেই ছিল আমাদের স্বাধীনতা, আর এইখানেই ছিল আমাদের অক্ষমতা। এইখানেই ছিল আমাদের শক্তি ও দুর্বলতা। ১৯১৪ সালে যুদ্ধের প্রারম্ভে এই কথাই উপলব্ধি করিয়া পরাজিতের তিক্ত গর্বের সহিত 'যুদ্ধ হইতে দূরে' এই ধ্বনির সহিত আমিই ঘোষণা করিয়াছিলাম, "ইউরোপকে বিশ্বাস করাইবার জন্য এ-কথা আমি বলিতেছি না, এ-কথা বলিতেছি আমার বিবেককে শান্ত করিবার জন্য।" সেদিন আমাদের দাঁড়াইবার মাটি ছিল না।

১৯১৯ সালে যখন নিজের নামে আমি একটি আবেদন প্রচার করি, তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, মনের স্বাধীনতা গাছের মতোই আকাশের দিকে বাহু মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু শিকড় ইহার সম্পূর্ণরূপে মাটির মধ্যে। মানবতার বুকে, মজুর জন-সমাজের 'কালো মাটিতে' এই গাছটিকে যদি আমরা তুলিয়া আনিতে পারি, তবে এ গাছ বাঁচিতে পারে। সেই কালো মাটি হইতেই আসিয়াছেন গর্কি। শ্রমিকশ্রেণীর বিবেকের সহিত তিনি আজ একাত্ম। সর্বহারাশ্রেণীর তিনি সংস্কৃতির মধ্যমণি। তাহাদের সাহত তিনি এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের বুদ্ধিজীবী আমরা, গর্কির মতো সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। নিজেদের জনগণের সহিত

অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমরা বৃথাই খুঁজিয়া ফিরিয়াছি। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমি এই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছি। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত 'জন সাধারণের রঙ্গমঞ্চ' নামক পুস্তকের শেষে আমি লিখিয়াছিলাম, "জন-সাধারণের আর্ট চাও? তবে, অনন্ত দুঃখ ও অবিশ্রাম পরিশ্রমের অভিশাপ হইতে, কুসংস্কার ও অন্ধ উন্মাদনার মোহ হইতে জনগণকে মুক্ত কর, মুক্ত কর তাহার মন, প্রতিষ্ঠিত কর তাহাকে আত্মকর্তৃত্বে, জয়ী কর তাহাকে বর্তমান সংগ্রামে।"

পশ্চিম ইউরোপে এমন লোক আমি পাই নাই। শিশুকাল হইতেই আমি তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, তাহাকে আহ্বান করিতেছি, তাহার আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। আমার চারিদিকে পশ্চিম ইউরোপের মাটি শুকাইয়া শক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, আমার শিকড় আমি বাহিরে রাখি নাই। ইউরোপের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া সোভিয়েটের নবজাগ্রত বিশাল জনজীবনের উর্বর মৃত্তিকাস্তরের মধ্য দিয়া আমি দুই স্তরের সংযোগ সাধন করিয়াছি। এই ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকা স্তরের প্রান্তদেশে আমার শিকড় গর্কিকে স্পর্শ করিয়াছে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আমরা হাতে হাত মিলাইয়াছি। আজ ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসুন আমরা রক্তে রক্তে জীবনে জীবনে মিশিয়া যাই। শক্তির সহিত শক্তির মিলন হোক্। আমাদের আদর্শ আজ সর্বজগতে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। নূতন বসন্তের আবির্ভাব হোক্। রমাঁ রলাঁ

গর্কি

('তাহারা ও আমরা' শীর্ষক গর্কির প্রবন্ধ-পুস্তকের ফরাসী সংস্করণের ভূমিকা হিসাবে ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রবন্ধ রচিত হয়।)

ইউরোপীয় জনসাধারণের নিকট গর্কির পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তাহার খ্যাতি সর্বত্র প্রসারিত। কিন্তু এই গর্কির আরেক রূপ আছে,

যাহা লইয়া আজও বিতর্ক চলে। গর্কির এই রূপকে ফরাসী কলাবিদগণ তাহাদের বহির্বাশের এক অংশ দিয়া বিনীতভাবে ঢাকিয়া রাখিতে চান। গর্কির এ রূপ যোদ্ধার রূপ; যে সর্বহারা বুদ্ধিজীবীর দল নূতন জগত গড়িয়া তুলিতেছে এ-গর্কি তাহাদেরই নায়ক ও চালক। যে মসীকুলীনের গোষ্ঠী অভিজাত্যের অভিমানে জনজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন তাহাদের কলঙ্কময় জীবনযাত্রার জবাব দিয়াছেন নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া একমাত্র গর্কিই—অন্তত ইউরোপে এ-পথে তাহার সহযাত্রী বড় কেহ নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম, আর্ট ও মনীষার জগতের এই বিরাট ব্যক্তি-পুরুষ তাহার সমস্ত প্রতিভা ও মহিমা লইয়া বিপ্লবের শিবিরে আসিয়াছেন এবং ব্যারিকেডের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পশ্চিম ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের তিনি আহ্বান করিতেছেন। জাহাজ নিমজ্জনোন্মুখ না হওয়া পর্যন্ত এ মূষিকের দল তাহার আহ্বানে সাড়া দিবে না জানি, কিন্তু আমি এ-পাশ হইতে ও-পাশ দিয়া গর্কির প্রসারিত হস্ত জড়াইয়া ধরিয়াছি।

গত দুইএক বৎসর হইতে 'শ্রেষ্ঠ সৈনিক' লেখক হিসাবে গর্কির কার্যকলাপ আমি প্রতিনিয়তই লক্ষ করিয়া আসিতেছি; মস্কোর সংবাদ-পত্রগুলিতে প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধাবলীও পাঠ করিয়া আসিতেছি। আমার দুঃখ হয়, গর্কির এই আবেগময় রচনাগুলির কথা পশ্চিম ইউরোপ জানে না। এই রচনাগুলির মধ্যে শুধু যে গর্কির রুক্ষ ও অগ্নিগর্ভ মানসপ্রকৃতিই অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা নহে, তাহারই চোখের সম্মুখে, তাহারই পরিচালনায় যে নূতন জগত গড়িয়া উঠিতেছে রচনাগুলির মধ্যে তাহারও আভাস রহিয়াছে। আমি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি, প্রবন্ধগুলির মধ্যে আমার মনোমত কয়েকটি প্রবন্ধ এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমি সংকলনকর্তা হইলে এমন আরো কতক-গুলি প্রবন্ধ ইহাদের সহিত যোগ করিতাম যে-গুলি লেখকহিসাবে আমাকে বিশেষ করিয়া মুগ্ধ করিয়াছে। কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নের যে জাতিগুলি বন্ধ

শতাব্দী ধরিয়া ভাষা হইতে বাঞ্চিত ছিল এবং যে সর্বহারাশ্রেণী সামাজিক নিপীড়ণের ফলে চিরদিনই সংস্কৃতির উত্তাপ হইতে দূরে ছিল, তাহাদের মধ্যেই আজ সাহিত্য, কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের যে অসামান্য স্ফুরণ দেখা দিয়াছে, ঐ প্রবন্ধগুলিতে তাহারই আভাস পাওয়া যায়।

এই পুস্তকখানির প্রবন্ধগুলিকে প্রধানত দুইশ্রেণীতে ভাগ করা যায়: শত্রুদের জবাব ও বন্ধুদের নিকট আবেদন।

প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি পড়িলে বুঝা যায় সোভিয়েট ইউনিয়নে স্বাধীন সমালোচনার অধিকার কিভাবে প্রযুক্ত হইতেছে। একটা তিব্রতা ও অধৈর্য এগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে; এগুলির মধ্যে রহিয়াছে একটা উদ্দীপ্ত আবেগ, রহিয়াছে যুদ্ধের আহ্বান। প্রবন্ধগুলি বলিষ্ঠ, পৌরষদীপ্ত সন্দেহ নাই, তথাপি ঠিক এগুলি আমার মনোমত নয়। স্বমতে আনিবার চেয়ে শত্রুকে সংগ্রামে প্ররোচিত করাই এগুলির লক্ষ; যাহারা আগে হইতেই বুঝিয়া বসিয়া আছে এ আক্রমণ তাহাদেরই প্রতিআক্রমণে বাধ্য করানোর চেষ্টা।

পশ্চিম ইউরোপের আমরা তাহার অপর রচনাগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করি বেশি। রচনাগুলির মধ্যে গর্কির অন্য রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে তিনি স্বদেশের শ্রমজীবী সাধারণের নির্মম, দূরদর্শী উপদেষ্টা,—কখনো উৎসাহ উপদেশ ও পথনির্দেশ দিতেছেন কখনো বা নূতনের মোহে যাহাতে তাহারা প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ না হইয়া ওঠে সে-সম্পর্কে কঠোর তিরস্কার ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছেন; যে সকল তরুণ নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে আঘাত দিয়া, উৎসাহ দিয়া তাহাদের তিনি নূতন যুগের মহিমার আলোক দেখাইতেছেন। সম্মুখে অনন্ত কাজ,—অতএব গর্কি বলিতেছেন হতাশার স্থান নাই, চাই আনন্দ ও উদ্দীপনা। চোখের উপর জীবন তাহার অনন্ত সম্পদ স্তরে স্তরে মেলিয়া ধরিতেছে, নূতন যুগের মানুষকে মুগ্ধচিত্তে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

উদারনৈতিকতা (Liberalism) ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individualism) এই দুই পুরাতন বুর্জোয়া বিগ্রহের ধ্বংস দেখিয়া যাহারা আর্তনাদ শুরু করিয়াছে, তাহাদের লক্ষ করিয়া সত্যকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি যে মহিয়সী বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা কর্তব্য মনে করি। কারণ, স্বাধীনতার নামে দাসত্বের শিকল গর্বভরে গলায় পরিয়া পশ্চিম ইউরোপের বুদ্ধিজীবিগণ অন্ধকার গৃহকোণে যে নেশার নিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছেন, আমার মনে হয়, গর্কির এই কণ্ঠস্বরে সে-নেশা তাহাদের ভাঙ্গিলেও ভাঙ্গিতে পারে।

"সমাজের অধিকাংশের শ্রমশক্তির শোষণের ভিত্তির উপর যে শ্রেণীর রাষ্ট্র-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া সমাজ ব্যক্তিমানুষকে সেই শ্রেণীর দেওয়া বাহিরের নামের (label) ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা দেয়। বুর্জোয়া দেশগুলিতে, গোষ্ঠী, জাতি, শ্রেণী ও ধর্মের ধারণা ও জাতীয় সভ্যতার মৌলিকত্বের কুসংস্কারের মধ্যে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ।

"আমাদের সোভিয়েট রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; সীমাবদ্ধ ধারণা এখানে আর নাই এবং ব্যক্তিমানুষ এখানে তাহার সমস্ত দক্ষতা ও শক্তির স্বাধীন বিকাশের অধিকার লাভ করিয়াছে।

"আপনারা বলিবেন: এসব মিথ্যাকথা, কারণ বক্তৃতার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি যে-সকল স্বাধীনতার ধনতন্ত্রীজগতে কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নাই, অথচ ধনতন্ত্রী-ব্যবস্থার সমর্থকগণ যেগুলির গুণবর্ণনায় পঞ্চমুখ, সোভিয়েট রাষ্ট্র তাহাদের বিরোধী। আমি জবাব দিব: শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে-সকল ভাবধারা ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন বিকাশকে খর্ব করিয়া আসিতেছে তাহাদের পাশাপাশিই আমাদের রাষ্ট্র মানুষকে দিয়াছে সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। ব্যক্তিমানুষের বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীন বিকাশের পথে যে-সকল ভাবাদর্শ বাধা সৃষ্টি করে, কোনো ব্যক্তিমানুষ যদি সেই ভাবাদর্শগুলির বেসাতি ও প্রচার শুরু করিতে চেষ্টা করে, তবে আমাদের রাষ্ট্র তাহা নীরবে সহ্য করে না।

এই ভাবাদর্শগুলিই ধনতন্ত্রী-শক্তির ভিত্তি : শ্রেণী, গোষ্ঠী, জাতি, ধর্ম। শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্রে শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থবিরোধী ভাবধারার প্রচারে বাধা না দেওয়া এবং শ্রমজীবী লইয়া গঠিত এক জাতির নিকট শ্রমজীবীদের দাসত্বকে সঙ্গত ও অনিবার্য বলিয়া অবাধে প্রচার করিতে দেওয়ার চেয়ে হাস্যকর মূঢ়তা আর কি হইতে পারে ?"

একস্থানে মনস্তাত্ত্বিক গর্কি সুনিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা দেখাইয়াছেন 'চিন্তার স্বাধীনতা'র সর্বশেষ সমর্থক বুর্জোয়া দেশগুলি যে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রাণপনে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে তাহা কত মিথ্যা, কত অন্তঃসারশূন্য ; এই চেষ্টার শোচনীয় ব্যর্থতা তিনি তাহাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছেন।

"খাঁচার মধ্যে বসিয়াই ব্যক্তিমানুষ তাহার এই ঝুটা স্বাধীনতাকে সমর্থন করিতেছে। যে পারাবত-কোটরে বসিয়া লেখক, সাংবাদিক, দার্শনিক, সরকারী কর্মচারী ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রে সুগঠিত অন্যান্য বৃত্তিজীবিগণ এই স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম করিতেছেন কৃষকের পারাবত-কোটর অপেক্ষা নিশ্চয়ই তাহা অনেক বেশি আরামদায়ক।

"শ্রেণী সমাজ বাহির হইতে মানুষের উপর যে চাপ দেয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাহারই ফল ; হিংস্র আঘাত হইতে ব্যক্তিমানুষের আত্মরক্ষার ব্যর্থ প্রচেষ্টাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। কিন্তু আত্মরক্ষার এই প্রয়াস মানুষের সমস্ত কর্মকে নিজের চারিপাশেই সীমাবদ্ধ রাখে, কারণ মানুষ যখন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত থাকে তখন তাহার মানসপ্রতিভার বিকাশের গতি শ্লথ হইয়া যায়। উহাতে ব্যক্তিমানুষ ও সমাজ উভয়েরই ক্ষতি। রাষ্ট্র যখন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জায় কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতেছে তখন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের হিংস্র আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া ব্যক্তিমানুষের শক্তির অধিকাংশই নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে।

" 'জীবন একটি সংগ্রাম ?' অস্বীকার করি না। কিন্তু মানুষের এ-সংগ্রাম

হইবে প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে। এ-শক্তিকে নির্জিত ও নিয়ন্ত্রণ করাই হইবে এ-সংগ্রামের লক্ষ। শ্রেণীবিভক্ত রাষ্ট্রই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার এই বিরাট সংঘর্ষকে মানুষের শ্রমশক্তিকে করায়ত্ত রাখিবার এবং তাহাকে চিরদিন দাসত্বে বাঁধিয়া রাখিবার অসম্মানকর সংগ্রামে পরিণত করিয়াছে। বিংশশতাব্দীর বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত কৃষকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূলত কোনো প্রভেদ নাই; বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাহিরটা শুধু বেশি পালিস ও বেশি পরিচ্ছন্ন। কিন্তু অন্ধ ও পাশবিক এটি অনেক বেশি। জনসাধারণ ও রাষ্ট্র, এই হাতুড়ী ও হাপরের মধ্যে বুদ্ধিজীবীর স্থান; পারিপার্শ্বিক তাহার বিরোধী বলিয়া বাঁচিবার সমস্যা তাহার পক্ষে কঠিন ও কিছুটা নাটকীয়। এই সীমাবদ্ধ জগতে বসিয়া তাহাকে চিন্তা করিতে হয় বলিয়াই জীবন সম্পর্কে তাহার নিজের ধারণার জন্য সে সমগ্র জগতকে দায়ী করিয়া বসে এবং বহির্জগত-বিচ্ছিন্ন অন্তর্লোকের এই তন্ময়তা হইতেই দার্শনিক নৈরাশ্য, অবিশ্বাস ও বিকৃতচিন্তার উদ্ভব হয়।"

এই কথাগুলি আমার নিজের জীবনের চিন্তাভাবনার সহিত এমন অদ্ভুত-ভাবে মিলিয়া যাইতেছে যে এগুলি এখানে না তুলিয়া পারিলাম না। গত কয়েক বৎসরের বেদনাময় সংগ্রামের মধ্য দিয়া আমিও আমার মতো চিন্তা করিতে করিতে ঐ একই উপসংহারে আসিয়া পৌছিয়াছি। শীঘ্রই আমি কয়েকটি প্রবন্ধে ও একটি পুস্তকে পশ্চিম মহাদেশে স্বাধীন চিন্তার রক্তাক্ত অভ্যুদয়ের কাহিনী লিখিবার সুযোগ পাইব। এ ধরনের সঙ্কটের কাহিনী ফ্রান্স, জার্মানি ও অন্যান্য দেশে আমার হাজার হাজার সহকর্মীর কৌতূহল জাগ্রত করিবে। আমি জানি তাহারাও আধা-অন্ধকারে ঐ একই পথের উপর পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছেন।

পশ্চিম ইউরোপের বুদ্ধিজীবিগণ কয়েদীর মতো কারাপ্রাচীরের সঙ্কীর্ণ অবরোধের মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছেন। মাঝে মাঝে হাঁপাইয়া উঠিলে

তাহারা 'আকাশ হইতে' মুক্তির স্বাদ পাইবার চেষ্টা করেন। কখনো দেখেন তাহারা ধর্মানুভূতির অলীক স্বপ্ন কখনো ব্যক্ত করেন নিষ্ফল কৃচ্ছ্রসাধনের দাম্ভিক অহমিকা। ইহাদেরই বিষণ্ণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পরিবর্তে গর্কি সন্ধান দিয়াছেন বিপ্লবোত্তর নতুন সমাজে সমষ্টির সহিত ব্যক্তিমানুষের এক বলিষ্ঠ সুন্দর হৃদয়বিনিময়ের। বিপ্লবী জনসাধারণের মধ্য হইতে এমন এক আবেগময় শক্তির অভ্যুদয় হয় যাহা কেন্দ্রীভূত হইয়া পুনরায় জনসাধারণের মধ্যেই বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত করে। সমষ্টিগত শক্তিকে নানাপ্রকারের ভাবচিত্রে রূপান্তরিত করিবার যে শক্তি জনগণের মধ্যে নিহত রহিয়াছে সেই শক্তির দ্বারাই জনগণ ঐ বিদ্যুৎশক্তিকে বহুগুণ বাড়াইয়া তোলে। সৃজনী কর্মোন্মাদনার মহালগ্নে জনগণ এমন একটি লক্ষ স্থির করিয়া ফেলে, যে লক্ষে বিপুলতম প্রতিভা লইয়াও কোনো ব্যক্তিবিশেষের একাকী পৌঁছানো সম্ভব নহে। এই বিরাট সংকল্পের উত্তাপে ব্যক্তিমানুষ এক নির্ভীক বলিষ্ঠ আনন্দে উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে এবং বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্যবাদের অবিশ্বাস ও নিষ্ফল বিলাপের তন্দ্রাজড়িমা তাহার ভাঙ্গিয়া যায়।

এ জীবন নিরানন্দ, নিষ্ফল ও নিস্তরঙ্গ বলিয়া যাহারা বিলাপ করে তাহাদের লক্ষ করিয়া গর্কি বলিতেছেন, "হে আমার তরুণ বন্ধুগণ, তোমাদের কল্যাণের জন্যই আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি জীবন যেন তোমাদিগকে কঠোর শাস্তিবিধান করে, তাহার রুক্ষ শিরাদীর্ণ হাতের গুরুভার যেন তোমাদের দেহ অনুভব করিতে পারে। ক্ষমাহীন মহাশিক্ষক এই জীবনের মধ্যে আমরা মানুষেরাই আনিয়াছি আমাদেরই যুক্তি ও আমাদেরই কামনার উত্তাপ। আমি চাই, তোমাদের বিলাপ যে কত অর্থহীন তাহা যেন তোমরা বুঝিতে পার, তোমরা যেন বুঝিতে পার সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ যুগে বাস করিবার সুযোগ পাইয়াও অভিযোগ করা কতখানি নির্লজ্জতা। আজ মানবজগত নিজেকে ধ্বংস করিয়া আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে,—অপূর্ব উদ্দীপনার মধ্যে একটা

জাতি আজ মুমূর্ষু প্রাচীন জগতের হিংস্রতম বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শ্রেণীহীন, বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতেছে।

"যদি সত্যিই তোমরা সুস্থ, সুন্দর, উদার জীবন যাপন করিতে চাও, তবে হে আমার তরুণ বন্ধুগণ, এই অতুল, বিপুল মহা নির্মাণপ্রয়াসে অন্য সকলের সাথে অংশ গ্রহণ কর।"

রাশিয়ার এ আহ্বানে আমরা যেন সাড়া দিতে পারি, এ আহ্বান যেন সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে প্রতিধ্বনি তুলিতে পারে। যে কাপুরুষ তরুণের দল বাহিরের রৌদ্রদীপ্ত পৃথিবী হইতে সংকীর্ণ গৃহকোণে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে, যাহারা বণিক-রাজনীতি ও স্বর্ণ সাম্রাজ্যবাদের পায়ে আত্মবিক্রয় করিতে উদ্যত, কর্মজগত হইতে পালাইয়া যাহারা বদ্ধ ঘরে আর্টের নামে আত্মরতির নিষ্ফল বিলাসে দিন যাপন করিতে চাহিতেছে, তাহারা যেন এই দর্পণে নিজেদের মুখ দেখিয়া লজ্জায় মাথা নিচু করিতে পারে।

নিজেদের অকাল বার্ধক্য উপলব্ধি করিয়া পুনর্যৌবন লাভের চেষ্টা করিবার মতো শক্তি যদি তাহাদের দুর্বল দেহে থাকে তবে উত্তরের বাতাসে এই মরা পাতাগুলি যেন উড়িয়া যায়, মানবঅরণ্য যেন সবুজের সমারোহে হাসিয়া ওঠে। ঐ যে সোভিয়েট ইউনিয়নে দেখিতেছি, "১৬ কোটি মানুষের এক জাতি কাজে লাগিয়াছে শুধু নিজের জন্য নহে, পৃথিবীর মানুষের জন্য,—জগতের সম্মুখে তাহারা প্রমাণ করিতেছে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে সংগঠিত জনসাধারণ কী অলৌকিক সাফল্যই না লাভ করিতে পারে।"

হে ইউরোপের জনগণ, বহু শতাব্দী ধরিয়া তোমরাই ছিলে মানুষের প্রগতি-বাহিনীর অগ্রগামী দল। কিন্তু আজ তোমরা পশ্চাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছ। নূতন জগতের নির্মাতাগণের মধ্যে আবার কবে তোমরা তোমাদের স্থান বাছিয়া লইবে?

কিন্তু তোমরা হাত মেলাও বা না মেলাও, নূতন জগতের অভ্যুদয় রোধ করা যাইবে না।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ

মীরাট মামলার বন্দীদের প্রতি

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

পৃথিবী আজ নরকের রূপ ধারণ করিয়াছে। বিশেষ সুবিধাভোগী জাতিগুলির—এবং উহাদের মধ্যকার শ্রেণীগুলির এবং ঐ শ্রেণীগুলির মধ্যকার বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠীসমূহের—সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্য হইতে যদি কেহ বাহিরে আসিতে পারে তবে আজ হোক, কাল হোক এ-সত্য তাহার চোখে প্রতিভাত হইবেই যে, যে-সভ্যতা হইতে সে প্রাণরস আহরণ করিতেছে ও যে-সভ্যতা তাহার গর্বের বস্তু পৃথিবীর শতকরা নব্বুইজন অধিবাসীর জঘন্য, নির্মম, পাশবিক শোষণ সে-সভ্যতার বেদী রচনা করিয়াছে। এ উপলব্ধি যখন তাহার মনের গভীরে প্রবেশ করিবে, তখন জীবনের সমস্ত আনন্দ তাহার মরিয়া যাইবে; জীবনপণ করিয়া এই কর্কট ব্যাধিকে নির্মূল করিবার সংকল্প যতদিন না সে গ্রহণ করিতে পারিতেছে, সে আনন্দ ততদিন আর সে ফিরিয়া পাইবে না।

যে বিরাট মেষপাল আগেভাগেই লড়াই ছাড়িয়া চলিয়া আসে, নিজেদের নিষ্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাহারা বলে, আজ যাহা দেখিতেছি তাহা তো চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে, অতএব এ অবস্থার পরিবর্তন করা যাইবে না। এ কথা মিথ্যা কথা। মানুষের ইতিহাসে চিরদিন যেমন একদিকে জাতির শ্রেণীর ও গোষ্ঠীর নির্যাতন চলিয়া আসিতেছে তেমনই তাহারই পাশাপাশি চলিয়া আসিতেছে শৃঙ্খল ছিড়িবার জন্য নির্যাতিতের আপ্রাণ প্রয়াস। কিন্তু গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর শতকরা নব্বুই জন অধিবাসীর শোষণ

ও নিপীড়ণ-ব্যবস্থা যে-ভাবে সংহত ও সংবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। নিপীড়কের সংখ্যা এক কি বহু, তাহারা দলে বিভক্ত কি রাষ্ট্রে বিভক্ত, সে প্রশ্নের কোনো মূল্যই আজ নাই। নিপীড়ক আজ একটি বিশেষ ব্যবস্থা; এ ব্যবস্থা স্বর্ণসাম্রাজ্যবাদ। আন্তর্জাতিক নীতি আজ এই ব্যবস্থাই পরিচালিত করিতেছে। বড় বড় শোষণকারী রাষ্ট্রগুলি এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। জাতিতে জাতিতে হিংসা ও বিভেদ এই ব্যবস্থার মূলে রসসিঞ্চন করিতেছে। একটা বিদ্রোহী জাগরণ আজ নিপীড়িত জাতিগুলির মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, কাঁপিয়া উঠিতেছে ধনতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতোরণ। এই আলোড়ন যতই বাড়িতেছে, ভাঙ্গনের ভয়ে ধনতন্ত্রীব্যবস্থা যত বেশি উদ্বিগ্ন হইতেছে, নিপীড়নের দানবীয় রূপ ততই নগ্ন ও নির্লজ্জ হইতেছে। স্বেচ্ছাচারকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য আধুনিক রাষ্ট্রগুলি যে আইনের আবরণ ব্যবহার করে, সেটুকু পর্যন্ত আর নাই। সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা আজ তাহার মুখোশ খুলিয়াছে। বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া সে একদিন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এই বিভীষিকাই আজও তাহাকে কায়েম করিতেছে।

ধনতন্ত্রীশোষণ পৃথিবীর সর্বত্র এই ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করিয়া আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ও সুদূর প্রাচ্যের লক্ষ লক্ষ শোষিত মানুষের উপর আজ যে দানবীয় নিপীড়ন চলিয়াছে তাহার তুলনা মেলা কঠিন। রক্তশোষকের দল পাপের পথে আজ এতখানি আগাইয়া গিয়াছে যে, পিছুফেরা আর তাহাদের চলে না, ফিরিলেই তাহাদের মরণ অনিবার্য। ভারতবর্ষকে শুষিয়া নিরক্ত করিয়া গত একশত বৎসর ইংলণ্ড বাঁচিয়া আছে। ভারতবর্ষ হাতছাড়া হইবামাত্রই ইংলণ্ডের টলটলায়মান সম্পদসৌধ ধ্বসিয়া পড়িবে। ইংলণ্ডের মেদস্ফীতির মূলে তাহার পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলি। ফ্রান্সের নিকট ইন্দোচীন সাম্রাজ্য শুধু মুনাফার সামগ্রী নহে; ভাঁটিখানার মালিকদের লইয়া যেমন প্রাচীন রোমক গণতন্ত্র গঠিত হইয়াছিল তেমনি এ সাম্রাজ্যও ফরাসী গণতন্ত্রের

অস্ত্রসজ্জিত ধনতন্ত্রের মহারথীদের সামরিক ঘাঁটি। আসন্ন প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের জন্য ও চীনকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য এই ঘাঁটি ব্যবহার করা তাহাদের লক্ষ।

তাই, যেমন বাংলাদেশে তেমনি আনামে, যেমন বাটাভিয়ায় তেমনি নানোই-এ ও পেশোয়ারে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সামরিক আইনের রাজত্ব চলিয়াছে। হাজার হাজার লোক বছরের পর বছর ধরিয়া জেলে ও বন্দীশিবিরে পচিতেছে। গান্ধীজী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল শুধুমাত্র এই অপরাধে ১৯৩২ সালের মে মাসে ব্রিটিশ ভারতে ৮০,০০০ নরনারীকে কারারুদ্ধ করা হয়। ইয়েন-বে ঘটনার পর হইতে সরকারী স্বীকৃতি অনুসারেই ফরাসী ইন্দোচীনে ৭,০০০ নরনারীকে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত করা হয়। ইহাদের মধ্যে তিন হাজার ১৯৩৩ সালের ১৪ই জানুয়ারি তারিখেই ধৃত ও দণ্ডিত হন। বন্দীদের মধ্যে বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যাও কম নহে। ইহাদের অপরাধ, ইহারা কর হ্রাস, সার্বজনীন ভোটাধিকার ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহে দৈহিক শাস্তিদান-ব্যবস্থা রহিত করার দাবী জানাইয়াছিলেন। ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারি ডাচইণ্ডিজে ১০,০০০ নরনারীকে রাজনৈতিক অপরাধে বন্দী করা হয়। চীনের বন্দীসংখ্যা ৫০,০০০ (অবাধ হত্যালীলার কথা বাদ দিলাম)। কোরিয়ায় ৩৫,০০০। ইহা ছাড়া, জাপানে হাজার হাজার লোক ধৃত, নির্যাতিত ও দণ্ডিত হইতেছে এবং ইতালীয়, বেলজিয়ান ও পোর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়— নিপীড়নের বন্যা চলিয়াছে। নিষ্ঠুর, কপট, দানবীয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাও দেখিবার মতো। সে আজ দুর্নীতিজর্জরিত কুয়োমিংটাং সেনাপতিগণের পরম মিত্র ও কিউবার হত্যালীলার সমর্থক। অর্থনৈতিক শোষণকে আরো কায়েম করিবার জন্যই ফিলিপিনদের সে স্বাধীনতা দিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকার বুকে সে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়া রক্তপিপাসু স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

পীড়নকারীর বিরুদ্ধে পীড়িতের বিদ্রোহ যতদিন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘটিতেছিল ততদিন দলন ও দমনের কাজ চলিতেছিল দ্রুতভাবে, নিঃশব্দে।

কিন্তু এ বিদ্রোহ যখন ব্রিটিশভারতে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মতো বিরাট গণঅভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করিতে শুরু করিল, তখন দমননীতিও সমস্ত মাত্রা ছাড়াইয়া গেল। এই বিপুল গণতরঙ্গকে অহিংসার সীমার মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন এক মহাপ্রতিভা। তাই যে সংস্কারপন্থী বুর্জোয়াশ্রেণী কিছুটা আপোস করিয়াও বর্তমান সমাজব্যবস্থা কায়েম রাখিতে চাহে এই সুসংযত অভ্যুত্থান এখনও তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই উদার বিদ্রোহের লক্ষ ভারতীয় স্বার্থের সহিত ব্রিটিশ-স্বার্থের সমন্বয়সাধন। ভাইসরয়ের নির্বোধ আত্মম্ভরিতায় ও কূপমণ্ডুক শাসকগোষ্ঠীর অদূরদর্শিতায় বাধ্য হইয়াই এ আন্দোলন শুরু করিতে হইয়াছে।

কিন্তু এ আন্দোলনের রূপ বদলাইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রমিক-কৃষকশ্রেণী সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের দৃঢ়সংকল্প লইয়া সুসংহত, বৈপ্লবিক, সংগ্রামশীল দলগঠনের উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছে। নিপীড়িত পৃথিবীর বিদ্রোহ-আন্দোলনে নূতন অধ্যায় শুরু হইয়াছে। ১৯২৮ সালে বোম্বাইএ কাপড়ের কলের ধর্মঘট ও গিরনি কামগড় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হইতেই ইহার সূত্রপাত; অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইহার সূচনা মাত্র ৫ বৎসর পূর্বে। আনামে হয় আরো পরে। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভিয়েৎ-নাম-কোক-দান-দাংএর (অর্থাৎ ইন্দোচীনের কুয়োমিংটাং, ইহারা ইয়েনবের উপর জাতীয়তা-বাদীদের আক্রমণ সমর্থন করে) সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গেই দলনের রথচক্র চলিতে শুরু করিল। ইন্দোচীনে স্থাপিত হইল এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন চিরস্থায়ী বিচারালয়—ক্রিমিনাল কমিশন অব সাইগন। এখানে বিচার চলিবে রুদ্ধ-কক্ষে, কৌঁসুলী মনোনীত করিবেন স্বয়ং

সরকার এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরোধী কোনো দলিল ও কাগজপত্র দেখিবার অধিকার তাহার থাকিবে না। এই কমিশনের বিচারে ১৯৩২ সালের ১লা জুলাই পর্যন্ত ১,০৯৪ জন দণ্ডিত হইয়াছেন; উহাদের মধ্যে ৮৩ জনের হইয়াছে মৃত্যু দণ্ড, ১৩০ জনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৪২০ জনের নির্বাসন। আগামী মার্চ ও এপ্রিল মাসে আনামের ১৮০ জন বিপ্লবীর বিচারের জন্য কমিশন এখন প্রস্তুত হইতেছেন।

ইন্দোচীনের রুদ্ধকক্ষের বিচারব্যবস্থায় যেমন অবিচার ও পক্ষপাত নির্লজ্জভাবে প্রকটমান ব্রিটিশ ভারতের বিচারব্যবস্থায় সেরূপ নহে। সেখানে বৈধতার একটা ছদ্মবেশ সযত্নে রক্ষা করা হয়। তাই, ব্রিটিশ ভারতের বিচারযন্ত্রটি আরো বেশি ভারী, সেকেলে ও জবরজঙ্গ। সম্প্রতি মীরাটে এই বিচারযন্ত্রটি একটি চারি বৎসর ব্যাপী দানবীয় মামলা শেষ করিয়াছে এক কলঙ্ককর দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিয়া। ১৯২৯ সালের জুন মাস হইতে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত এই মামলা চলিয়াছে। ২,৬০০ দলিলপত্র ও হাজার হাজার ছাপা কাগজে যেন কাগজের পাহাড় উঠিয়াছিল; এই অর্থনৈতিক চরম দুর্গতির দিনে ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা; দণ্ডাদেশ যাহা দেওয়া হইয়াছে অভিযোগের সহিত তাহার অসঙ্গতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এ অসঙ্গতি এত চোখে লাগে যে উদারনৈতিক মধ্যপন্থী ইংরাজেরা পর্যন্ত ভীরুকণ্ঠে ইহার কিছুটা প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

কিন্তু বিশ্বের জনমতকে এ-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা উচিত মনে করি, কারণ, এ-বিচার শুধু যে ২৭ জন অভিযুক্তের বিচার তাহা নহে, এ-বিচার সেই সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার যাহা ঐ ২৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছে। নিখিলভারত শ্রমিক ও কিসান পার্টির সাধারণ সম্পাদক আর. এস. নিম্বকরের বিচার হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে ব্রিটেনের লিবারেলপন্থিগণ শুধু যে এই বিচার-ব্যবস্থায় দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্তন করিতে অসমর্থ তাহা নহে, গ্রেট ব্রিটেনের

সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাশব্যবস্থা যে অবৈধ পদ্ধতি অথবা অসাধারণ বৈধ পদ্ধতি দ্বারা তাহার সাম্রাজ্যের ষষ্ঠি-সপ্তমাংশ অর্থাৎ বিশ্ববাসিগণের এক-ষষ্ঠাংশের বিচার কার্য পরিচালনা করিতেছে তাহা বুঝিবার মতো ক্ষমতাও তাহাদের নাই।

কিন্তু, সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কথা এই যে, লেবর গভর্নমেণ্ট সব কিছু জানিয়াই এই বিচারপদ্ধতি অনুসরণের অনুমতি দিয়াছেন অর্থাৎ মামলাটি চালাইয়াছেন। যে বুর্জোয়া লিবারেল আন্দোলন হইতে লেবর পার্টির জন্ম হইয়াছে সেই আন্দোলনের নীতিগুলিই লেবর গভর্নমেণ্ট এইভাবে পদদলিত করিয়াছে ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলনের উদাসীনতার সুযোগ লইয়া। এইভাবে সাম্রাজ্যের সাত ভাগের ছয় ভাগ লইয়া যে দেশ, সেই ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনকে লেবর গভর্নমেণ্ট নির্মূল করিতে চাহিতেছে ব্রিটেনের বিভ্রান্ত শ্রমিক আন্দোলনের সহযোগিতায়। ব্রিটেনের তথা ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলন যদি আজও এই কলঙ্ক বহন করিয়া চলে, যদি আজও তাহার শুভ বুদ্ধির উদয় না হয়, যদি নিজেদের নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আজও তাহারা প্রতিবাদ না জানায়, তবে এ-পাপের গুরুভারে তাহারা নিজেরাই পিষিয়া মরিবে।

আজ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস মহা আড়ম্বরে ডেরচেস্টরের শহীদ শ্রমিকদের আসন্ন স্মৃতি-বার্ষিকীর আয়োজন করিতেছে। ১৮৩৫ সালে এই শহীদেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অপরাধে নির্বাসিত হইয়াছিল; আজ ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাহাদের স্মৃতিপূজার আয়োজন চলিয়াছে। অথচ, ও-দিকে এই আন্দোলন শুরু করিবার জন্য মীরাটের কয়েকজন কর্মীকে যথাক্রমে যাবজ্জীবন, বারো বৎসর, দশ বৎসর, সাত বৎসর ও পাঁচ বৎসরের অবর্ণনীয় দুঃসহ অবস্থার নির্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। (ইহাদের মধ্যে তিনজন মহাপ্রাণ ইংরেজও আছেন। তাহাদের নাম, ফিলিপ স্প্র্যাট, বি. ডি. ব্র্যাড্‌লে ও লেস্টার হচিন্‌সন। ভ্রাতৃত্বের অনুভূতিতে ভারতীয়

কর্মীদের পাশে ইহারা দাঁড়াইয়াছিলেন। চারি বৎসরের হাজতবাসের মধ্যে মীরাট মামলার একজন আসামীর মৃত্যু হয়।) ইহাদের একমাত্র অপরাধ: ইহারা ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছেন। ভারতের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আজ নরকযন্ত্রণার মধ্যে জীবন যাপন করিতেছে। তাহাদের আত্মরক্ষায় সঙ্ঘবদ্ধ হইবার যে-কোনো প্রচেষ্টাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে চাহে। বিশ্বের শ্রমিকেরা কি তাহাতে বাধা দিবে না? বিশ্বের লেখক ও চিন্তাজীবিগণ কি নীরব থাকিবেন?

কায়িক ও মানসিক শ্রমজীবী উভয়ের নিকটই আমরা আবেদন জানাইতেছি। ভারতীয় শ্রমিকদের যে ভয়াবহ শোষণ চলিয়াছে, তাহাদের অর্ধাহারে ও অবসন্ন ভগ্নস্বাস্থ্যে রাখিয়া তাহাদের জমাট বুকের রক্ত পিণ্ডে পরিণত করিয়া যে-ভাবে আপনার অতল উদর-গহ্বরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উহা অদৃশ্য করিয়া দিতেছে আমরা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। যে সকল তেজস্বী পুরুষ এই পাপ ব্যবস্থার অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছেন এবং যাহাদের বিরুদ্ধে আইন-ভঙ্গের কোনো অভিযোগ আনা যায় নাই (১৯২৩ সালের মার্চমাসে ব্যবস্থাপরিষদে ভারত সরকার নিজে ইহা স্বীকার করিয়াছেন) তাহাদিগকে এইভাবে স্বেচ্ছাচারীর মতো গ্রেপ্তারকে আমরা তীব্র নিন্দা করিতেছি।

স্প্র্যাট 'উৎপাদন ও বণ্টনের উপকরণ সমূহকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার কথা' কহিয়াছিলেন। ইহা তো লেবর পার্টির যে-কোনো সদস্যই বৈধ-ভাবে বলিয়া থাকেন এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রীও আদর্শত্যাগের পূর্বে বহুবার বলিয়াছেন। তথাপি স্প্র্যাটকে ঐ কথা বলিবার জন্যই রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। অভিযোগ সম্পর্কে এই হাস্যকর অজ্ঞানতা ও দুরভিসন্ধির তীব্র প্রতিবাদ করি। সম্রাটকে তাহার সার্বভৌম অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা বলিয়া যে অভিযোগ আনা হইয়াছে সে

অভিযোগের আমরা প্রতিবাদ করি। এ ইচ্ছা যদি অপরাধ হয়, তবে প্রত্যেক গণতন্ত্রীই অপরাধী। যে-দেশে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের জন্ম সেই দেশই ভারতবর্ষের ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনকে দলন করিবে—ইহার প্রতিবাদের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার বিরুদ্ধে প্রত্যেক আঘাতের আমরা প্রতিবাদ করি, এ আন্তর্জাতিকতা শ্রমিকশ্রেণীর অন্যতম মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য; শুধু তাই নয়, শোষণ-শক্তির আন্তর্জাতিকতার বিরুদ্ধে একান্ত প্রাণধারণের দায়েই শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রয়োজন। আমরা মীরাট মামলার প্রকাশ্য পরিবর্তন দাবী করি। অভিযুক্তদের আমরা সহানুভূতি ও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি জানাইতেছি।

সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য সমগ্র জগত ব্যাপিয়া আজ যে মহা সংগ্রাম চলিয়াছে তাহাতে যে হাজার হাজার মানুষ আত্মাহুতি দিয়াছে মীরাট মামলার আসামিগণ আমাদের চোখে তাহাদেরই জীবন্ত প্রতীক। ইহাদের জীবন ব্যর্থ নহে, ইহাদের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আমরা এক বিজয়-বার্তা পাঠ করিতেছি। কারণ, শোষকের করাল দ্রংষ্ট্রাকে ইহারা জগতের চোখে প্রকট করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। শুধু তাই নয়, যে নূতন বিদ্রোহশক্তি মানব সমাজকে আলোড়িত করিতে শুরু করিয়াছে তাহার অনিবার্য বিস্ফোরণের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা ইহাদের জীবনের মধ্যে পাঠ করিতেছি। ইহাদের রুধিবে কে?

ইন্দোচীনে সায়গণের নিপীড়িতদের প্রতি

দালাদিয়ের-এর ফ্রান্স যেন 'স্বাধীনতার শেষ দুর্গ'। কিন্তু, এই 'স্বাধীনতার দুর্গ' কোন স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতেছে?

এ প্রশ্ন কর ইন্দোচীনকে। এ প্রশ্ন কর সেই দশহাজার আনামবাসীকে যাহারা পাওলো-কেদের ও লা গুইয়ার্ন জেলখানায় মরিতে বসিয়াছে। জিজ্ঞাসা

কর যাহাদের গুলী করিয়া মারা হইয়াছে আর যাহারা ফাঁসীতে ঝুলিবার জন্য দিন গণিতেছে। জিজ্ঞাসা কর সমস্ত শোষিত ও নিপীড়িত জাতিকে। দালাদিয়ের-এর দুর্গ কার স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে? শোষকের স্বাধীনতা? পীড়কের স্বাধীনতা? যাহারা নিজেদের জাতির স্বাধীনতার দাবী করিয়াছে অথবা শুধুমাত্র জাতির জীবনযাত্রার আর একটু সহনীয় অবস্থার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়াছে তাহাদের জেলে, দ্বীপান্তরে, ফাঁসিতে পাঠাইবার স্বাধীনতা?

হাসি পায়। আমরাই ভারতবর্ষের মীরাট মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলিয়াছি। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেখানে ২৭ জন কর্মীকে ৪ বৎসর ব্যাপী এক মামলার পর নির্বাসনে পাঠাইয়াছেন। জনমতের প্রবল দাবীর সম্মুখে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে সেখানে কিছুটা পিছু হটিতে হইয়াছে; তাহারা দণ্ডাদেশের পরিবর্তন আরম্ভ করিয়াছেন। আজ মনে হইতেছে সায়গনের দণ্ডাদেশের সহিত তুলনায় এ দণ্ডাদেশ তো কিছুই নয়। তিনবৎসর কারারুদ্ধ রাখিয়া ইন্দোচীনের আটজন শ্রমিককে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা, ১৮ জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং শতাধিক আসামীকে সর্বসমেত নয়শত বৎসরের গুরুশ্রমের দণ্ড সেখানে দেওয়া হইয়াছে।

এই গভর্নমেণ্টই আজ বিবেকের নামে ফাশিজমের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছে। এ নৈতিক অধিকার ইহার নাই। যে দালাদিয়ের গভর্নমেণ্ট বিবেকের আহ্বানে যুদ্ধ-বিরোধী-গণকে নির্যাতিত করিতেছে এবং ঘোষণা করিতেছে যে স্বদেশরক্ষা ফ্রান্সের প্রত্যেক নাগরিকের শুধু অধিকার নহে কর্তব্যও বটে সে যেন সেই সব দেশের নাগরিকদের ঐ একই কর্তব্য ও অধিকার স্বীকার করিয়া লয় যে সকল দেশকে ফ্রান্সেরই বৃহৎ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিয়া শোষণ করিতেছে। আমরা সায়গনের বন্দীদের মুক্তি চাই। মুক্তিলাভ তাহাদের অধিকার, মুক্তিদান আমাদের কর্তব্য।

ইউরোপে ফাশিজম্

১। হিটলারী ফাশিজম্

২রা মার্চ, ১৯৩৩

অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই হিটলারের বিভীষিকা মুসোলিনীর বিভীষিকাকে ছাপাইয়া গিয়াছে। যে-প্রভুর পদতলে বসিয়া ও যাহার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া হিটলারী ফাশিজম্ আপনাকে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিয়াছে সেই ইতালীয় ফাশিজম্ দশবৎসরে যতখানি নির্বিকার হিংস্রতার পরিচয় দিতে পারে নাই, সে তাহার বেশি দিয়াছে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। যে রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া সে এই হিংসার নরক উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে তাহা যে কতবড় প্রতারণা এবং তাহার পশ্চাতে যে কতখানি পুলিসের প্ররোচনা ছিল তাহা জানিতে আজ ইউরোপের কাহারও বাকী নাই, এই প্রতারণা ও অপপ্রচার; ন্যায়ের গণ্ডীর এই নির্লজ্জ উল্লঙ্ঘন; হিংস্র, প্রগতিবিরোধী দলবিশেষের হাতে এই যে সমস্ত সরকারী ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়া; শিক্ষালয়ের অভ্যন্তরে পর্যন্ত রাজনীতির এই উদ্ধত অনধিকার প্রবেশ, স্বাধীন মতপ্রকাশে সাহসী যে দু একজন লেখক ও শিল্পী সেখানে আজো অবশিষ্ট আছেন তাহাদের এই নির্যাতন ও বিতাড়ন; শুধু সোশালিস্টদের নিকটে নহে বুর্জোয়া লিবরেলদের নিকটেও যাহারা পরম শ্রদ্ধার পাত্র তাহাদের গ্রেপ্তার, সমগ্র জার্মানিতে সামরিক স্বেচ্ছাশাসন প্রতিষ্ঠা এবং যে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার উপর বর্তমান সভ্যতা দাঁড়াইয়া আছে তাহা প্রত্যাহার—ইহা আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না। দল ও মত নির্বিশেষে ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত লেখক ও জনমতবাহী

প্রতিষ্ঠানকে আমরা এই আহ্বান জানাইতেছি যে, মানুষের ও নাগরিকের মৌলিক সম্মানকে ধুলিলুণ্ঠিত করিয়া এই যে নির্বিবেক বিভীষিকার রাজত্ব শুরু হইয়াছে, আসুন আমরা সকলে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ইহার অকুণ্ঠ প্রতিবাদ জানাই।

২। জার্মান হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে

২০শে মার্চ, ১৯৩৩

আমি রোগশয্যায়। তথাপি আমি চাই না, জার্মানির হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আপনাদের এই প্রতিবাদ-সভায় আমার কণ্ঠ নীরব থাকিবে। বিশ্বের বিপ্লবী জনগণের প্রচণ্ড মুষ্টির প্রবল আঘাতে এই ঘাতক ও পীড়কের দল যেন চিরদিনের মতো শেষ হইয়া যায়। এই উন্মাদ নপুংসকের দল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইউরোপকে কয়েক শতাব্দী পিছাইয়া আনিয়াছে। যে অন্ধকার আজ সেখানে নামিয়া আসিয়াছে ততখানি অন্ধকার বোধহয় চতুর্থ হেনরী কর্তৃক প্রটেস্ট্যাণ্ট নির্যাতন পুনঃপ্রবর্তনের দিনে অথবা সেণ্ট বার্থেলমিউ-এর হত্যাকাণ্ডের দিনেও ছিল না।

আশ্রয়প্রার্থীদের আসুন আমরা সুস্বাগত জানাই, নির্যাতিতদের সম্মুখে আসুন আমরা মস্তক অবনত করি। তাহাদের রক্ত কখনও বৃথা যায় না। এই রক্তই পাপিষ্ঠদের শ্বাসরোধ করিয়া মারিবে। যে আদর্শের জন্য এই শহীদেরা প্রাণ দিতেছেন, তাহা আমাদের কাছে পবিত্র। এ আদর্শ জয়ী হইবেই।

৩। জার্মান সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে কোনো জার্মান বন্ধুর নিকট লিখিত পত্র

৩১শে মার্চ, ১৯৩৩

ফাশিজম্-এর পাশবিক আত্মপ্রতিষ্ঠায় আমি ততটা বিচলিত হই নাই যতটা হইয়াছি ফাশিজম্-বিরোধী দলগুলির প্রায় বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে।

আপনি লিখিয়াছেন নিজের পরাজয়ের অনিবার্যতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হওয়ার ফলেই আজ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঠিক ইহাই তো তাহার সবচেয়ে বড় পরাজয়। ইহাই তো তাহার দুরপনেয় কলঙ্ক। কিন্তু কর্মই যে-পার্টির মূলনীতি সে-পার্টিকে পরাজয়ের ভয় করিলে চলিবে না। পরাজিত হইবার সাহস থাকা চাই কিন্তু এ-পরাজয় অস্ত্রত্যাগ করিয়া নহে, যুদ্ধ পরিহার করিয়া নহে, মার্জনা ভিক্ষা বা আপোস আলোচনায় সম্মত হইয়া নহে। যাহারা নূতন জগত গড়িবে তাহাদের সকলের পক্ষেই ইহা কর্মের অন্যতম মূলনীতি। সমগ্র ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিবে। এক বা একাধিক রক্তাক্ত পরাজয়ের অগ্রিম মূল্য না দিয়া সমাজ-সংগ্রামে কোনো বড় জয়লাভ সম্ভব হয় নাই। ১৮৭১ সালের পারি কমিউন ও ১৯০৫ সালের ব্যর্থ বিপ্লব না হইলে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সম্ভব হইত না। কি চাই তাহা আমার জানিতে হইবে। আজিকার অধঃপতিত সোশালিস্টদের মতো তাহারা যদি সর্বপ্রকারের বিপদ এড়াইয়া শুধু আত্মরক্ষাই করিতে বলে, তবে কর্মক্ষেত্র হইতে তাহাদের সরিয়া যাইতে হইবে। তাহারা শুধু লাইব্রেরীতে বসিয়া বসিয়া নোট টুকিয়া লইতে পারেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কোনো নেতারই নির্দেশদানের অধিকার নাই। জনগণের স্বার্থের প্রতি তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। লেনিন যেমন তাহাদের ধিক্কার দিবেন, তেমনি দিবেন গান্ধীও। কারণ 'হিংসা অথবা অহিংসা' মূল প্রশ্ন নহে; মূল্য সমস্যা 'কাজ'। এই মহাসংকটমুহূর্তে দায়িত্ব ত্যাগ করা ও পালাইয়া যাওয়া চলিবে না। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় পরাজয় আনে শত্রু নহে, মানুষ নিজে; এবং এ পরাজয়ের পঙ্ক হইতে উদ্ধারলাভ অসম্ভব।

৪। জার্মানিতে ইহুদীবিদ্বেষের বিরুদ্ধে

৫ই এপ্রিল, ১৯৩৩

আজ জার্মানিতে ইহুদীদের যে নির্লজ্জ দলন চলিয়াছে, তাহাতে শাসকবর্গের নির্বুদ্ধিতা ও বর্বরতার মধ্যে কোনটাকে ধিক্কার দিব বেশি, বুঝিয়া পাই না। শাসকগণ দেশের মানস ও বাস্তব সম্পদের একাংশ নিবিষ্টচিত্তে ধ্বংস করিতেছেন—গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিম মহাদেশে এ দৃশ্য আর দেখা যায় নাই। সমস্ত দৃশ্য অর্থহীন হইতে বীভৎসতার পর্যায়ে গিয়া দাঁড়ায় (যদি ইহাকে মর্মান্তিক না বলি) তখনই যখন দেখি, নিজেদের যাহারা জাতীয়তাবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহারাই জাতির সবচেয়ে বড় শত্রুর কাজ করিতেছেন। শক্তি ও সংস্কৃতির এই 'রক্ষাকারীদের' মধ্যে একটা নির্মম অজ্ঞতা দেখিতেছি। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন ক্লাসিকাল-যুগের যে মহান জার্মানগণের সৃষ্টি ও ভাবধারাকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়া তাহারা প্রচার করিতেছেন তাহারা এবং পুণ্যশ্লোক লেসিং ইহুদীদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেছেন। ন্যাথান দি ওয়াইস-এর লেখক হিটলারের হাতে নিহত হইয়াছেন। বাহিরের জগতের চোখে হিটলারবাদী গোয়েবেল্‌সের মতো বিদ্বেষবিকৃত বর্বর নিরক্ষরদের দ্বারা মহান জার্মান জাতির সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন অধিকার ছাড়া আর কিছুই নহে। 'মানুষের বিভিন্ন জাতির বৈষম্য' সম্পর্কে গোবিনিয়ানের কতকগুলি অদ্ভুত আপাত-বিরোধী উক্তি এবং জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটা অন্ধ দম্ভ গোয়েবেল্‌সের দুর্বল ও হিংস্র মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়াছে।

এই শাসকদের দুষ্কৃতির জন্য জার্মান জাতি অপরাধী নহে। তাহাদের সহিত আমরা বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিব; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কামনাও আমরা করিব যেন সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহারা এই দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা কাটাইয়া উঠিতে পারেন।

৫। জাতিবাদ ও ইহুদীবিদ্বেষের বিরুদ্ধে

৯ই এপ্রিল, ১৯৩৩

সর্বপ্রকারের জাতিভেদের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা ও বিমুখতা আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেছি। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে উহা নির্বুদ্ধিতা ও অপরাধ। 'জাতি' সম্পর্কে অর্থহীন ভ্রান্ত ধারণার কথা এখানে আলোচনা করিতে চাহি না। (সার্বজনীন জীবনস্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন একান্ত সংস্কৃতিহীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি ভিন্ন বিশুদ্ধ জাতি বলিয়া আজ কিছু নাই।) জাতির সহিত জাতি মিশিয়া যে নিখিল মানুষ সম্ভব হইয়াছে তাহারই সম্মিলিত কীর্তি এই বর্তমান সভ্যতা। ইহার মধ্যে কাহার কীর্তি কতটুকু ভাগ করিতে যাওয়া হাস্যকর পাগলামি। এ কথা সবচেয়ে বেশি করিয়া খাটে ইহুদীজাতি সম্পর্কে। (ইহুদী জাতিও একটি জাতি; অন্তত তিন চারটি বিভিন্ন জাতি ইহার মধ্যে রহিয়াছে।) ইউরোপের সম্পদ ও সংস্কৃতিতে এ জাতির দান অবিচ্ছিন্নভাবে মিশিয়া আছে। স্পিনোজাকে বাদ দিলে আপনাদের গ্যয়টে দাড়াইবেন কোথায়? আজ আপনাদের গোরিং বর্বরতার উত্তুঙ্গশিখরে দাঁড়াইয়া চরম উদ্ধত্যের সহিত আইনস্টাইনের পবিত্র নামকে অসম্মান করিতেছে। আপনারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংস্কৃতির জগতে নিউটনের যে স্থান ছিল আজ সেই স্থান আইনস্টাইনের? সমস্ত বিচ্যুতি ও অপরাধ লইয়াই ইহুদীদের যোগ্যতার পরিমাপ করা হউক। এ বিচ্যুতি ও অপরাধ সম্ভবত তাহাদের কীর্তি ও প্রতিভার বিপরীত। বিচ্যুতি ও কলঙ্ক অপর কোন জাতির না আছে? প্রত্যেক জাতির মধ্যে ভালো ও মন্দ মিশিয়া আছে। কোনো জাতিই বলিতে পারে না সে ই বিধাতা কর্তৃক বিশেষভাবে নির্বাচিত।

এ কথা যদি সত্য হয় যে জনসংখ্যার অনুপাতে পশ্চিম মহাদেশের ইহুদীরা অনেক বেশি চাকুরী ও পদ অধিকার করিয়া আছে, তবে দেখিতে হইবে

তাহাদের এই সিদ্ধির মূলে দক্ষতা অথবা শঠতা রহিয়াছে। যদি শঠতা থাকে তবে অবশ্য আন্দোলনের প্রয়োজন আছে; (যদিও সে আন্দোলন হইবে সুবিচারের আন্দোলন, হিংসার আন্দোলন নহে)। আর যদি এ সিদ্ধির মূলে থাকে তাহাদের দক্ষতা, তবে আমি বলিব তাহারা অন্যায় করে নাই। যাহারা ইহা লইয়া অভিযোগ জানাইতেছেন তাহারা আগে উহাদের মতো অথবা উহাদের চেয়ে দক্ষতা অর্জন করুন। মনের সহিত মনের স্বাধীন সংগ্রামের মধ্য দিয়াই মানুষের সভ্যতা আগাইয়া চলে এবং সমগ্র সমাজ ইহাতে লাভবানই হয়।

আমি জানি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-মানুষের পক্ষে সংগ্রাম বড় কঠোর। আমার চেয়ে এ-কথা কে বেশি জানে? সমস্ত জীবন ধরিয়া এ সংগ্রাম আমাকে করিতে হইয়াছে; এবং চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বদ্ধ আবহাওয়ায় শ্বাসরুদ্ধ করিয়া আমাকে কাটাইতে হইয়াছে? কিন্তু তাহার কি আসে যায়? এই সংগ্রামই জীবন। শুধু চাই সংগ্রাম করিবার শক্তি, শুধু মনের শক্তি লইয়া সংগ্রাম চালাইবার সামর্থ্য। যাহারা তোমার পথের বাধা পুলিসী বলপ্রয়োগে তাহাদের নির্মূল করিতে যাওয়া কাপুরুষতা। পুলিসকে যে ডাকিবে অপমান তাহারই; আর পুলিসী বলপ্রয়োগের ফলে যে লাভবান হইবে তাহার অপমান আরও বেশি।

সর্বপ্রকার ফাসিজম্-এর আমি শত্রু। কিন্তু একথা আমি বলিব যে হিটলারের জার্মানির মতো এতখানি সর্বনাশা জাতিবাদ মুসোলিনীর ফাশিজম্ কোনোদিন গ্রহণ করে নাই। ইহার কারণ হয়তো ইতালীতে ইহুদীদের সংখ্যা অনেক বেশি, পদমর্যাদায়ও তাহারা উঁচু। যুদ্ধের আগে পনের-কুড়ি বৎসর ধরিয়া কখনো ইহুদী লুৎসাত্তি কখনো জিওলিত্তি প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকার করিয়াছেন। আজো সেখানে সেনাবাহিনীর মধ্যে বহু ইহুদী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। ইহুদীই হোক, কালোই হোক, পীতই হোক—যাহার সহিত তাহার মতবিরোধ নাই তাহার সহায়তা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবার

বাসনা মুসোলিনীর কোনোদিন ছিল না। কিন্তু হিটলারের ফাশিজম্ জাতিকে রক্ষা করিবার আজুহাতে ইহুদীদের নিপীড়িত ও নির্বাসিত করিয়া জাতির বাস্তব ও মানসসম্পদকে ধ্বংস করিতেছেন। এ-পাপ শুধু আন্তর্জাতিকতার বিরুদ্ধে নহে, জাতির বিরুদ্ধে। এই সর্বগ্রাসী ভুলের মাসুল জার্মানিকে বহুদিন ধরিয়া দিতে হইবে।

৬। 'কোয়েলনিসে ৎসাইতুং' পত্রিকায় লিখিত পত্র

১৪ই মে, ১৯৩৩

ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনাদের পত্রিকার ৯ই মে তারিখের সংখ্যায় আপনারা আমার সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ-কথা খুবই সত্য যে জার্মানিকে আমি ভালোবাসি, এবং বিদেশীর অবিচার ও নিপীড়ন হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যও আমি আপ্রাণ করিয়াছি।

কিন্তু এ জার্মানি তো সে জার্মানি নয়। আমার ধ্যানের জার্মানি সেই মহান বিশ্ব-নাগরিকদের জার্মানি যাহারা নিজের জাতির মতো অপর জাতিরও সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করিতেন এবং জাতিতে জাতিতে মানবতার সেতুবন্ধন করিতে যাহাদের চেষ্টার অবধি ছিল না।

সে জার্মানি আজ রক্তাক্ত, ধূলিলুণ্ঠিত, স্বস্তিকাধারী জার্মানির 'জাতীয়তাবাদী নেতাদের দ্বারা পদদলিত'। এ জার্মানি আজ তাহার আশ্রয় হইতে স্বাধীন মনস্বীদের, ইয়োরোপীয়ানদের, শান্তিবাদীদের, ইহুদীদের, সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের,—অর্থাৎ এককথায় যাহারা শ্রমজীবীর আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠন করিতে চাহেন তাহাদের সকলকেই দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। আমি বিস্মিত হইতেছি এই ভাবিয়া যে এই 'জাতীয় ফাশিস্ট' জার্মানি যে আসল জার্মানির সবচেয়ে বড় শত্রু এ-কথা আপনারা বুঝিতেছেন না কেন?

এই নীতি শুধু সভ্যতার বিরুদ্ধেই অপরাধ নহে। নিজের জাতির বিরুদ্ধেও ইহা অপরাধ। এই নীতির ফলে জাতির সৃজনীশক্তির একটা বড় অংশ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, পৃথিবীতে আপনাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের চোখে আপনারা শ্রদ্ধা হারাইতেছেন। প্রত্যেক দেশের জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা-বাদীদের আপনাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, আপনাদের ফুরারগণ। ইহা আপনারা দেখিয়াও দেখিছেন না। আপনারা শুধু জার্মানির বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের কথাই বলিতেছেন। এ ষড়যন্ত্র যদি কেহ করিয়া থাকে তবে সে তো আপনারাই।

উনিশ শো আঠারো সালের বিজয় লাভের পর মিত্রশক্তিগণ জার্মানির প্রতি যে অবিচার করিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাইয়াছি। তাহার উপর জোর করিয়া যে ভের্সাইয়ের সন্ধি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল আমি তাহার পরিবর্তন দাবী করিয়াছি।

আপনারা কি মনে করেন এই সকল দাবী আমি তুলিয়াছিলাম, আরো বড় অবিচারের জন্য? আপনারা কি মনে করেন এই সকল দাবী আমি তুলিয়াছিলাম সেই জার্মানির জন্য যে-জার্মানি নিজে সমস্ত জাতির সমান অধিকারের নীতিকে এবং মানুষের সমস্ত পবিত্র অধিকারগুলিকে নিজে পদদলিত করিয়াছে। জার্মানির উপর যে-সকল অন্যায় সন্ধি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে সে-সবের সবচেয়ে সাংঘাতিক বিরোধিতা করিতেছেন আপনারা নিজেরাই। ভের্সাই বিজয়ীদের অন্ধ ও নিষ্ঠুর অবিচার গত পনেরো বৎসর ধরিয়া জার্মান জাতির মধ্যে যে-হতাশার বিকার সৃষ্টি করিয়াছে সেই বিকারই আজ আপনাদের এই সর্বনাশ অভিযানের মূলে। ভবিষ্যতে যখন আপনাদের চোখ খুলিবে তখন আর সময় থাকিবে না।

আমার দিক হইতে আমি এইটুকু বলিতে চাই আপনাদের সমস্ত বিরোধিতাকে উপেক্ষা করিয়া আমি জার্মানিকে, আসল জার্মানিকে চিরদিনই

ভালোবাসিব—আমার সে জার্মানি আজ হিট্‌লারী ফাশিজম্-এর পাপে কলঙ্কিত। পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে লইয়া সর্বমন ও সর্বমানবের একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠনের চেষ্টা আমি চিরদিন করিয়া আসিতেছি। কোনো একক জাতির অহমিকাকে পরিতৃপ্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার জীবনব্যাপী এই সাধনা আমি মৃত্যু পর্যন্ত চালাইয়া যাইব।

আর. আর

হিট্‌লারের ফাশিজম্-এর সম্পর্কে বিদেশী সংবাদপত্রগুলিতে যে সকল অভিযোগ বাহির হইয়াছে আপনারা বলিতেছেন সেগুলি মিথ্যা।

হিটলার গায়েরিং গোয়েবল্‌স-এর যে সকল বক্তৃতা ও ঘোষণা বেতারে ও সংবাদপত্রে বিঘোষিত হইতেছে, সেগুলির সত্যতা কি আপনারা অস্বীকার করিতে চান? তাহাদের হিংসাত্মক কার্যে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তোলা, ইহুদী প্রভৃতি অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষের অভিযান পরিচালনা করা প্রভৃতি যে সকল মধ্যযুগীয় অন্ধ বর্বরতা পশ্চিম ইউরোপ বহুকাল হইল কাটাইয়া উঠিয়াছে সেই সকল পুনঃপ্রবর্তনের জন্য তাহাদের প্রকাশ্য প্রচেষ্টার কথাও আপনারা অস্বীকার করিতে পারেন না। জার্মানিতে বই পোড়াইবার কথাও পৃথিবীতে সকলে জানিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবং অন্যান্য শিক্ষালয়গুলিতে রাজনীতির উদ্ধত অনধিকার প্রবেশ কি সত্য ঘটনা নহে? আপনারা কি মনে করেন যে-সকল বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক আজ জার্মানি হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন তাহাদের কথার চেয়ে আপনাদের নির্বোধ শাসকদের নির্লজ্জ অপপ্রচারকে পৃথিবীর লোক বেশি বিশ্বাস করিবে?

আর. আর

৭। তরুণদের প্রতি

১৭ই মে, ১৯৩৩

ফাসিজম্-এর মুখোশ একটি নহে। যে কোনো জাতির রূপই ইহা ধারণ করিতে পারে। ইহার অঙ্গে কখনো সামরিক বেশ, কখনও ধর্মযাজকের পোশাক; ইহার রূপ কখনো ধনতন্ত্রী কখনো গণতন্ত্রী, কখনো বা সমাজতন্ত্রী। সংস্কৃতির অথবা অসংস্কৃতির সর্বপ্রকার তরল মিশ্রণের মধ্যেই ইহার বীজাণু বাড়িতে পারে। কিন্তু যে-মুখোশই ইহার মুখে থাকুক না কেন মূল প্রকৃতি ইহার সর্বত্রই এক—ইহা জাতীয়তাবাদী। ইহা সব কিছুকে জাতি ও জাতির সহিত একাত্মীকৃত একনায়ক রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকারে বাধ্য করে, যাহাতে সব কিছুকেই সে শৃঙ্খলিত করিতে পারে।

আমাদের পক্ষ হইতে আমরা বলিব, জাতীয়তাবাদই আমাদের শত্রু। তরুণ সহকর্মিগণ, এই বাণীই আমাদের রণধ্বনি হউক। এ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই শুধু বিদেশে নহে। আমাদের নিজেদের মধ্য হইতেও উহা নির্মূল করিয়া ফেলিতে হইবে। আমরা যেন নিজেদেরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করি। ইহা মরিয়াও মরিতে চাহে না, ইহার শিকড়ের সবটা সহজে উঠিয়া আসিতে চায় না। যাহারা হিটলারদের বিরুদ্ধে আক্রমণের ধ্বনি তোলেন তাহাদের অনেককেই তাহাদের জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে, জাতীয়তাবাদই প্রেরণা যোগায়। সর্বোচ্চ সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং গত যুদ্ধ হইতে আমাদের পরিচিত সরকারী সম্মানধারী বুর্জোয়াদের কাগজগুলিতে অবশ্য প্রথম হইতেই যুদ্ধের আহ্বান শোনা যাইতেছে। 'শেষ পর্যন্ত লড়াই' 'কখনও ভুলিও না' প্রভৃতি কথাও শুনিতেছি। কিন্তু আমাদের অভিযান ইহাদের সঙ্গে নহে। অবশ্য ভুলিব না আমরাও।

আমরা ভুলিব না যে হিটলারী ফাসিজম্-এর জন্য আসল দায়ী তাহারাই; কারণ বিজেতাদের অন্ধ প্রতিহিংসার ফলে বিজিত জাতির মধ্যে যে হতাশা ও বিকারের ঢেউ আসিয়াছিল তাহার মধ্য হইতেই হিটলারী ফাশিজম্-এর

জন্ম। আমরা ভুলিব না জাতির বিরুদ্ধে জাতির সর্বনাশা বিদ্বেষের আগুনে তাহারাই তো চিরদিন আহুতি দিয়া আসিতেছেন। জাতিতে জাতিতে বিচ্ছেদের শত্রু আমরা। যদি কোনো বিদ্বেষের বিষ আমাদের মধ্যে জমা হইয়া থাকে তবে তাহা জাতিবিদ্বেষের স্বার্থান্ধ প্রচারকদের জন্য আমরা তুলিয়া রাখিব। জার্মানির, ইতালীর এবং ডুচে ও ফুরার-শাসিত সব দেশেরই দুর্গত জনসাধারণের বন্ধু আমরা। আমরা আজ এখানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছি 'স্বেচ্ছাচারীদের বিরুদ্ধে' (তরুণ শীলারের এই কথাটি ফরাসী বিপ্লব গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিল)। ধনতান্ত্রিক নিপীড়ন হইতে যে সকল জাতি মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে তাহাদের লইয়া আমরা একটা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গড়িতে চাই। আমরা কোনো একটি বিশেষ জাতির জন্য লড়িতেছি না। শুধু আমাদের নিজের জাতির জন্যও নয়। আমরা যে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ সমর্থন করিয়া লড়াই করিতেছি তাহার কারণ সোভিয়েট ইউনিয়ন কোনো একটি জাতি নহে, রাশিয়া নহে; ইহা বিশ্বের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট গণতন্ত্রগুলির এক সম্মেলন। এ সম্মেলন বর্তমানের, ভবিষ্যতের; আমার, তোমার অর্থাৎ পৃথিবীর যে-কেহ উহাতে থাকিতে চাও সকলেরই।

নিজেকে ও নিজের জাতিকে ভালোবাসা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু এ এক আদিম প্রবৃত্তি; এ ভালোবাসা আজ সমস্ত মানুষের ভালোবাসায় বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হওয়া উচিত। এমন কি প্রত্যেক জাতির স্বার্থের জন্যই ইহার প্রয়োজন। কারণ এমন সময় আসিয়াছে যখন বহির্বিশ্বের জাতিসঙ্ঘকে সে যদি ধ্বংস করে তবে সে নিজে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাই, আজ সমস্ত জাতিকে জতীয়তাবাদী ফাশিজম্-এর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। কারণ ফাশিজম্ই জাতিসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত করিতে চাহিতেছে।

কিন্তু জাতীয়তাবাদ একটি নহে। যুদ্ধের জাতীয়তাবাদ—তার কণ্ঠে

"ভা-তেন-গুয়ের" গান। শান্তির জাতীয়তাবাদ—সেখানে মুনাফা শিকারীর প্রভুত্ব। ফরাসী তরুণদের মধ্যে এমন দল আছে যাহারা 'বাস্তব-বোধের' গর্ব করে এবং 'স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদে' উহার পরিতৃপ্তি খোঁজে। তাহারা বলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে মাথা না ঘামাইয়া আমরা যেন নিজেদের সমস্যা লইয়াই ব্যস্ত থাকি। অথচ জার্মানিতে সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী, শান্তিবাদী ও ইহুদীদের যাহারা দলন করিতেছে; আমেনড্যা, মাত্তেওত্তি ও গ্রামস্কিকে যাহারা হত্যা করিয়াছে: পোন্‌জা ও লাপারী দ্বীপপুঞ্জে যাহারা সান্ত্রীশাসন বসাইয়াছে তাহাদের দিকে ইহারাই সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছে।

এই স্থুল স্বার্থপরতার আমরা প্রতিবাদ জানাই। এই অদূরদর্শী বাস্তববাদের ফলে আমরা একটা গোপনচক্রান্তে জড়িত হইয়া পড়িব এবং উহার কবলিত হইব। ফাসিস্ত শত্রুকে পরাজিত করিতে হইবেই এবং সর্বপ্রথমে স্বদেশেই। স্বস্তিকার বিনাযুদ্ধে জয়লাভের কলঙ্ককাহিনী লইয়া যাহারা উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে সেই সকল উদীয়মান ফুরারকে নিষ্ঠুরহস্তে দমন করিতে হইবে। এ আগাছাকে যদি আমরা শিকড় বসাইতে দিই তবে বিপদ আমাদের ঘনাইয়া আসিবে। এ-বীজ যেন আমাদের ঘিরিয়া না ফেলে। মাৎসিনির যুগের মতো এবং সে-যুগের চেয়ে আরো ব্যাপকভাবে, প্রতিক্রিয়াশীল-শক্তির এই নূতন পবিত্র সম্মেলনের বিরুদ্ধে শুধু নবীন ইউরোপ নহে জগতের সমস্ত জাতিকে জাগ্রত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

সংগ্রামের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত করিতে হইবে। পরিব্যাপ্ত করিতে হইবে উহাকে পৃথিবীর সর্বত্র। বিশ্বের যেখানেই কর্ম ও চিন্তা শৃঙ্খলিত এবং সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত, সেখানেই আমরা আক্রান্ত। যাহা তোমার তাহা আমার। যাহা আমার তাহা তোমার। আমাদের সহযোদ্ধাদের অঙ্গের প্রতি আঘাতটি আমরা বুক দিয়া অনুভব করি, তাহাদের প্রত্যেক অপমানে আমরা অপমানিত হই। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী একটি কঠিন

ফ্রণ্টে আমরা যখন একত্রে দাড়াইব, তখন গোষ্ঠী, জাতি ও ধর্মের বিভেদকে আমরা মানিব না। যে আমাদের পথরোধ করিবে সে ধ্বংস হইবে। সমগ্র মানুষের অভিযাত্রা রোধ করিবার শক্তি কাহারো নাই।

আর. আর

৮। রাইখস্‌ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া যে নারকীয় কাণ্ড শুরু হইয়াছে তাহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় অপরাধী কে বা কাহারা। যে দলিলপত্র ও প্ল্যান-গুলি 'ব্রাউন বুকে' প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায় অট্টালিকার অভ্যন্তরস্থ গভর্নমেণ্ট আফিসগুলি হইতে খুব একটা বড় দল ছাড়া একাজ সম্ভব নহে। রাইখস্ট্যাগের সভাপতি স্বরাষ্ট্র-সচিবের বাসগৃহ রাইখস্ট্যাগের সহিত একটি ভূগর্ভস্থ পথ দ্বারা সংযুক্ত ছিল। অতএব, তাহার নিজের উপর হইতে সন্দেহের বোঝা না সরাইয়া অন্যকে অভিযুক্ত করিবার কোনো অধিকার স্বরাষ্ট্র-সচিবের নাই। তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, যাহা প্রত্যেক দেশের বড় বড় কাগজগুলিতে বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার জবাব তিনি আজো দিতে পারেন নাই। লণ্ডনে যে বিকল্প-বিচার হইতেছে তাহাতে জার্মান গভর্নমেণ্টের অন্যান্য সদস্যগণসহ গোরিংকে দুনিয়ার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হইয়াছে।

৯। ডিমিট্রভ ও তাহার সঙ্গীদের মুক্তিদানের জন্য জার্মান জাতির নিকট আবেদন

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩

আমাদের সময়কার সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর মামলা শেষ হইয়া আসিতেছে। পঞ্চাশ দিনেরও বেশি সাধারণের মধ্যে ও প্রত্যেক দেশের সংবাদপত্রে

প্রকাশ্য আলোচনার পর রাইখস্ট্যাগ মামলা শেষ হইয়া আসিতেছে। টরগলের ডিমিট্রভ, পোপোভ ও টানেভের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যে কত ফাঁকা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সমস্ত জগত জানিয়াছে তাহারা নিরপরাধ। স্বয়ং বিচারকদের ও অভিযোক্তাদেরও বাধ্য হইয়া ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু যে উত্তেজনার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার ফলে বিচারশালার আবহাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং এ-আবহাওয়া যে রায়কে পর্যন্ত প্রভাবিত করিতে পারে এমন আশঙ্কাও দেখা দিয়াছে। যে মন্ত্রীর হাতে বিচার-বিভাগের ভার ন্যস্ত, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর কথা যাহার সবচেয়ে বেশি এবং ধৃত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্য যিনি নিজে দায়ী তিনিই যখন বিচারশালার মধ্যেই দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে আসামীদের ভয় দেখান, রায় যদি তাহার নির্দেশানুযায়ী না হয়, তবে আসামীদের নিহত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে!

চারিটি ব্যক্তির মহান সংগ্রাম এক অপূর্ব দৃশ্য। রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত, কিন্তু নিজেদের নির্বাচিত কৌসুলীর সাহায্য হইতে পর্যন্ত তাহাদের বঞ্চিত করা হইয়াছে। এ মহাকাব্যের উপসংহার যাহাই হউক না কেন ডিমিট্রভের বীরমূর্তি ভবিষ্যতের পটভূমিকায় চিরদিন অনন্ত মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া রহিবে। প্রত্যেক দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বেদনার সহিত এই মর্মান্তিক বিচার-প্রহসন লক্ষ করিয়াছে। শুধু তাহাদের কাছে নহে জার্মানদের কাছেও আমরা আবেদন জানাইতেছি। সমস্ত জাতির জনগণ যে জার্মানিকে তাহার রণলিপ্সা সত্ত্বেও, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভালোবাসিয়া ও শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে, লেখকসহ বহু ফরাসী যে জার্মানির মনীষীদের পূজা করিয়া আসিতেছেন, সেই জার্মানির বিবেকের নিকট আমরা নিবেদন জানাইতেছি। দলগত বিদ্বেষের উর্ধ্বে যে বিবেক এ আবেদন সেই বিবেকের কাছে। আমাদের মতো এ বিবেকও জানে ডিমিট্রভ, টরগলের, পোপোভ ও টানেভ নিরপরাধ। যত উত্তেজনাই

তাহাদের বিরুদ্ধে ধূমায়িত করা হউক না কেন, এ বিবেককে কিছুতেই ভুলানো যাইবে না। জার্মানির বিবেক জানে রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডের সহিত এই চারিজনের কোনো সংযোগ নাই, ইহাদের কেহই কোনো প্রকারেও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল না। জার্মানির বিবেক জানে তাহাদের মুক্তি দেওয়া উচিত। সে জানে তাহাদের শাস্তিদান জার্মানির সম্মানের বিরুদ্ধে (যাহা লইয়া আজ জার্মানিতে এত মাতামাতি চলিয়াছে), ন্যায়ের বিরুদ্ধে, শাশ্বত সুবিচারের বিরুদ্ধে এত বড় অপরাধ হইবে যে উহার ফলে জার্মানি ও বহির্জগতের মধ্যে বিচ্ছেদের এমন এক গহ্বর সৃষ্টি হইবে বহু বৎসরের মধ্যেও যাহা পূর্ণ হইবে না।

জার্মানি আজ দেখাক যে, যুদ্ধের উন্মাদনার মধ্যেও কেমন করিয়া একটি মহান জাতি সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বিচারের ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ন্যায়কে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। অভিযুক্ত চারিজন রাজনৈতিক বন্দী যে নিরপরাধ তাহা আজ সমস্ত জগত বুঝিয়াছে। আমরা আশা করি, তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি যে অন্তসারশূন্য তা জার্মানি প্রকাশ্যে স্বীকার করিবে এবং প্রতিদ্বন্দীদের চরিত্রবলের নিকট শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিবে। আরো আশা করি, বিচার শেষ হইবার পর বন্দীদের জীবন রক্ষার ভারও তাহারা গ্রহণ করিবে। ইহার জন্য জগতের কাছে তাহাদের জবাবদিহি করিতে হইবে।

১০। টরগলেরকে বাঁচাও

ডিসেম্বর, ১৯৩৩

সাক্ষ্য-প্রমাণ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় এবং ঘটনাকালে যে তাহারা অন্যত্র ছিল তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হওয়ায় ডিমিট্রভ, পোপোভ ও টানেভের বিরুদ্ধে মামলা ফাঁসিয়া গিয়াছে। জগতের মুখের উপর উদ্ধত মিথ্যা প্রচার একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। বাধ্য হইয়া তাহাদের নিরপরাধ বলিয়া

স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু অক্ষম-আতঙ্কে উন্মাদ স্বরাষ্ট্র-সচিব গোরিং টরগলের দ্বারা তাহার জীবন বিপন্ন হইবে ভাবিয়া তাহাকে ঘাতকের হাতে তুলিয়া দিয়া প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতেছেন।

আসামিগণের মধ্যে এর্ন্‌স্ট টরগলের সবচেয়ে নিরীহ; সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে তিনি হৃদয়বান। তাহার সমগ্র জীবন নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গের ইতিহাস। স্বভাবত এবং সাধনার ফলেও ব্যর্থ সর্বপ্রকারের হিংসামূলক কার্য হইতে পার্টির মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি দূরে থাকেন। রাইখস্ট্যাগে অগ্নি সংযোগের মতো নির্বোধ, নিষ্ফল, নাটকীয় সন্ত্রাশবাদী কাজ তাহার দ্বারা একেবারেই অসম্ভব। প্ররোচনাকারিগণ তাহার বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষের আগুন জনগণের মনে জ্বালিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র নিজের পার্টির সম্মান রক্ষার জন্যই এই নির্দোষ ও নির্ভীক মানুষটি আসিয়া স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। নিরপরাধ জানিয়াও ইহাকে সাত মাস জেলে রাখা হয়; তাহার মধ্যে তিন মাস শিকল পরাইয়া। নিরপরাধ জানিয়াও এই মানুষটির শির তাহারা চাহিতেছে। কারণ মার্কস্‌বাদকে ধ্বংস করিতে যাইয়া যাহারা নিজেরাই আজ মিথ্যা ও শাঠ্যের জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে এ-শিরে তাহাদের বড় প্রয়োজন। এর্ন্‌স্ট টরগলের আজ নিজের নির্দোষিতায় নিজেই বিপন্ন। তাহারা আজ তাহাকে মারিয়া তাহার পার্টিকে মারিতে চাহিতেছে। তাহাকে মারিয়া তাহারা আজ তাহাদের ঘাতকদের অপরাধের একটা জবাব তৈয়ারী করিতে চাহে!

নিরপরাধকে তবে হত্যা কর। সে পাপ করিবার সাহস যদি তোমাদের থাকে, তবে সর্বহারার পার্টিকে তাহারা এমন এক রক্তাক্ত মহিমায় ভূষিত করিবে যাহার আলোকে সে জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইবে।

১১। থালমানকে বাঁচাও

৯ই মে, ১৯৩৪

হিটলারের গভর্নমেণ্ট জনমতকে ভয় করে। রাইখস্ট্যাগ মামলা জগতের সম্মুখে হিটলার গভর্নমেণ্টের মুখোশ খুলিয়া দিয়াছে। জনমতের ভয়েই ডিমিট্রভ ও তাহার নিরপরাধ সঙ্গীদের সে মুক্তি দিয়াছে। হিটলার-গভর্নমেণ্ট তাই পৃথিবীর চোখকে ফাঁকি দিয়া অন্ধকারে, বিনা আপীলের, বিনা উকীলের, বিনা সাক্ষ্যের গুপ্তবিচারে থালমানকে টুঁটি টিপিয়া মারিতে চাহিতেছে। রাজনৈতিক অপরাধের কাপুরুষতাকে এইভাবে বিচার ব্যবস্থার পর্যায়ে উন্নীত করা হইয়াছে। এই গোপন বিচারের জন্য গোপনে অনুষ্ঠিত অপরাধের কৈফিয়ৎও দেওয়া হয় নাই। থালমানের সব কাজই চিরদিন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। একথা এমন কি জার্মানিতেও প্রত্যেকে জানে যে থালমানকে নির্যাতন করিয়া হিটলার-গভর্নমেণ্ট মানুষ থালমানকে নির্যাতন করিতেছে না, দেখিতেছি তাহার উদ্দেশ্য কমিউনিজমকে নিযাতন।

প্রকাশ্যে এবং সাধারণ বৈধ পদ্ধতিতে থালমানের বিচারের জন্য আমরা হিটলার-গভর্নমেণ্টের নিকট দাবী জানাইতেছি। হিটলার ভালোভাবেই জানে থালমানের নৈতিক মহিমার সম্মুখে সে দাঁড়াইতে পারিবে না। তাই, থালমানের বিরুদ্ধে যে-কোনো গোপন দণ্ডাজ্ঞাকে হিটলার-গভর্নমেণ্টের প্রতি নৈতিক ধিক্কার বলিয়া ধরিয়া লইবার অধিকার জগদ্বাসীদের রহিয়াছে। জগত তাহাকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করিবে।

১২। পারি-নাগরিকদের প্রতি আবেদন

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪

ফাশিজম্ ধনতন্ত্রী প্রতিক্রিয়ার শেষ আঘাত, কিন্তু শেষ আঘাত হইলেও ইহা মারাত্মক হইতে পারে। একটা গলিত ব্যবস্থার সমস্ত বিযাক্ত বীজাণু

রাজনীতি ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গে সংক্রামিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, জাতিবিদ্বেষ, উপনিবেশে দস্যুবৃত্তি, আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র দ্বারা আন্তর্জাতিক শ্রমিক শোষণ, ব্যবসায়ী দুর্নীতির সর্বপ্রকার দানবীয় অভিব্যক্তি, ডুচে ও ফুরারদের পায়ে অন্তঃসারশূন্য বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের আত্মসমর্পণ সমর্থনে দম্ভ ও দাসত্বের সর্বপ্রকার পাশবিক ভাবাদর্শ—এ সকলকে শতগুণ বর্ধিত করিয়া বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের নামই ফাশিজম্।

অতএব, সাবধান! আহ্বান কর শ্রমিকশ্রেণীর সর্বশক্তিকে, লক্ষ লক্ষ সর্বহারাকে, যে-সকল লেখক ও বিপ্লবী শিল্পী সর্বহারার আদর্শের প্রতি আজও অনুগত আছেন তাহাদিগকে। ফাশিজম্ ও আমাদের মধ্যে আমৃত্যু সংগ্রাম। স্মরণ রাখিও ভলতেয়রের বাণী, "এ পাপ ধ্বংস কর।"

১৩। বুদ্ধিজীবীদের সহিত সর্বহারাশ্রেণীর মিলনের আবেদন

যে দানবীয় পরশ্রমজীবী শোষণব্যবস্থা সম্পদস্রষ্টা শ্রমিকের সমস্ত শক্তি তৃষ্ণার্তের মতো শুষিয়া লইয়া তাহাকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে বিশ্বের বিরাট সর্বহারাশ্রেণী অমিতবিক্রমে সংগ্রাম চালাইতেছে।

সমস্ত বুদ্ধিজীবী, সমস্ত সহকর্মীদের কাছে আমি আবেদন জানইতেছি। শ্রমজীবীদের পার্শ্বে আমাদের স্থান। তাহাদের দেহ হইতে আমাদের জন্ম, তাহাদের স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীনতা, তাহাদের শক্তি আমাদের শক্তি। তাহারাই গাছের মূলকাণ্ড; বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প এইগুলি বিভিন্ন শাখা মাত্র। কাণ্ড যদি দুর্বল হইয়া পড়ে, তবে শাখাও শুকাইয়া যাইবে। বুদ্ধিজীবী সুবিধাভোগীশ্রেণী। শোষণকারীরা তাহাদের যে সম্মান ও সুযোগসুবিধা দেন তাহাতেই কৃতার্থ হইয়া তাহারা সাধারণের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। যে-গাছকে আমরা টবের মধ্যে আনিয়া বসাইয়াছি সেই গাছ হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া ফুলের মতো তাহাদের অবস্থা। অল্পকালের জন্য তাহাদের

দীপ্তি থাকে, তারপর তাহারা শুকাইয়া যায়; লোকে তখন সেগুলিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে।

মৃত্যুর বিরুদ্ধে, হত্যাকারীর বিরুদ্ধে, মানবসমাজের দলনকারীর বিরুদ্ধে জীবনের নিকট আবেদন জানাও। ধনিকের ধনমত্ততা, সাম্রাজ্যবাদীর ক্ষমতামত্ততা, বৃহৎব্যবসায়ের একনায়কত্ব, রক্তপানমত্ত ফাশিজম্-এর নানা রূপ—এ-সকলের বিরুদ্ধে জীবনের নিকট আবেদন জানাও। হে শ্রমজীবীশ্রেণী, আমরা হাত প্রসারিত করিয়া দিতেছি, আমরা তোমাদেরই,—আমাদের মিলিত হইতে দাও। আমাদের মধ্যকার বিভেদ ঘুচিয়া যাক। সমগ্র মানবজাতি আজ বিপন্ন!

১৪। ফরাসী তরুণদের প্রতি আবেদন

আজ ফাশিজম্-এর বিরুদ্ধে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। গণতন্ত্রের মুখোশ পরিয়া যে পার্লামেণ্টারী শাসনতন্ত্র মিথ্যার বেসাতি ও উৎকোচের দাসত্ব করে, তাহার উচ্ছেদের প্রয়োজন সম্পর্কে প্রকৃত প্রগতি-বাদীদের মনে কোনো সংশয় নাই। কিন্তু ব্যাঙ্ক, বৃহৎশিল্প ও ব্যাপক ব্যবসায়ের যে-সকল ছদ্মবেশী অধিনায়ক এই মিথ্যা ও ব্যাভিচারের আসল গুরু, যাহারা এতকাল গণতন্ত্রকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন কেবলমাত্র স্বার্থসেবায় উহার উপযোগিতার কথা বিবেচনা করিয়া, তাহারা আজ বুঝিয়াছেন যে ঐ ব্যবস্থার জীবনীশক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, তাই এ-ব্যবস্থা তাহারা নিজেদের হাতে ভাঙিয়া ফেলিতে উদ্যত; ইহাতে একদিকে যেমন জনসাধারণের ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন স্তিমিত হইয়া আসিবে অন্যদিকে তেমনই কৌশলে তাহাদের বিদ্রোহকে নিজেদের ক্ষমতা অব্যাহত করার কার্যে নিয়োগ করা যাইবে। এইখানেই

বিপদ, সাংঘাতিক বিপদ। অধীর, অন্ধ, ভাবাবেগে উন্মত্ত এই তরুণের দল আজ মনে করিতেছে যে, তাহারা বুঝি সমগ্র সমাজের আদর্শ ও স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করিতেছে। এ ভুল তাহাদের একদিন ভাঙ্গিবে, সে-দিন সহসা চকিত আতঙ্কে তাহারা উপলব্ধি করিবে যে, ধনতন্ত্রের মুষ্টিকবলে তাহারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়িয়াছে। কিন্তু এই অন্ধ অভিযান একেবারে নূতন নয়। যাহারা ইতালী ও জার্মানিতে ইহার আত্মবিকাশ দেখিয়াছেন, এতদিনে এ-অভিযানের স্বরূপ তাহাদের চিনিয়া ফেলা উচিত। ইতালী ও জার্মানির মতো এখানেও আজ সমগ্র সমাজের স্বার্থ ও আদর্শসেবার পবিত্র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে। সেই একই প্রতারণা—সেই কথা, কথা, কেবল কথা! উদার রসনা হইতে সহস্র-ধারায়-ঝরিয়া-পড়া সমাজসংস্কারের সেই অজস্র প্রতিশ্রুতি, যে-প্রতিশ্রুতি চিরদিন প্রতিশ্রুতিই থাকিয়া যায় কোনোদিন প্রতিপালিত হয় না। কিন্তু, তথাপি ইতালীর ডুচে ও ফাশিস্ত মহাপরিষদ এবং জার্মানির যুগলদানব হিটলার থিসেন সরল বিশ্বাসী, শৃঙ্খলিত জনসাধারণকে শোষণ করিয়া চলিয়াছে।

এই একই খেলায় মাতিয়া ওঠা ফ্রান্সের তরুণদের কিছুতেই চলিবে না। যদি এই খেলায় সত্যই তাহারা মাতিয়া উঠিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, কোনো কিছু দেখিবার বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের একেবারেই নাই। তাহাদের বুদ্ধিহীনতা এতদূর গিয়া পৌঁছিয়াছে যে, সংবাদপত্রের দানবীয় মিথ্যা প্রচারকে তাহারা নির্বিচারে বিশ্বাস করে, অথচ জানে যে, সংবাদপত্র-জগতের প্রায় সবটাই লৌহ ও স্বর্ণখনির জনছয়েক মালিক ও তাহাদের সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মুষ্টিকবলিত। এই মালিকের উপদলই সমগ্র জগতকে নিজেদের পদতলে আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

সহকর্মিগণ! উহাদের চোখের বাঁধন খুলিয়া দাও। উহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াই ক্ষান্ত থাকিও না, অন্ধকার হইতে উহাদিগকে আলোকে আনো।

জানি, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের দলে হাজার হাজার ভাড়াটিয়া লোক আছে, আর আছে যুক্তিবিদ্বেষী উগ্র প্রতিক্রিয়াবাদীর দল যাহারা অন্ধের মতো বিনা বিচারে তাহাদের অনুগমন করে। কিন্তু এ কথাও জানি যে, তাহাদের দলে এমন হাজার হাজার লোকও আছে, যাহারা নিতান্ত সরল বিশ্বাসে তাহাদের প্রবঞ্চনায় ভুলিয়াছে, কাহারও স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ হিসাবে তাহারা ব্যবহৃত হইতেছে কি না, সে সম্পর্কে যাহাদের মনে এখনো প্রশ্ন জাগে নাই, যাহারা এখনো বুঝিতে পারে নাই যে, যাহা রক্ষা করিতেছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস তাহারই বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য তাহাদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দেওয়া হইতেছে।

গল্প আছে, মৃগের নিকট আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য অশ্ব সামরিকভাবে আরোহীর নিকট আত্মসমর্পন করে। এই সুযোগে আরোহী অশ্বকে চিরদিনের মতো বল্গার বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলে। এই কাহিনীটি আপনাদের স্মরণ রাখিতে বলি। পার্লামেণ্ট ও পতনোন্মুখ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহারা জনসাধারণের বিদ্বেষ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু এই জীর্ণ প্রাচীন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিবে যে তরুণ ও জনসাধারণ, ছায়ার মতো তাহাদের পশ্চাতে ফিরিতেছে ফাশিস্ত অত্যাচারী। আসল শত্রু সেই। ধ্বংস করিতে হইবে ফাশিজম্‌কেই। লৌহ-ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ, ব্যাঙ্ক ও তাহাদের দস্যুদলের বন্ধন শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেল। ফাশিজম্ ধ্বংস হৌক!

১৫। অস্ট্রিয়ায় ফাশিজম্

২০শে জুন, ১৯৩৪

প্রতিবিপ্লবের গত পনের বৎসরের ইতিহাসে ১৯১৯ সালের বার্লিনের রক্তাক্ত জানুয়ারির ঠিক পরেই ১৯৩৪ সালের ভিয়েনার রক্তাক্ত ফেব্রুয়ারির স্থান। ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার নেকড়েদের মধ্যে অস্ট্রিয়ান ফাশিজম্-এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

ইতালী ও জার্মানিতে ফাসিজম্ ও নাৎসীবাদের যে ঝড় বহিয়াছে তাহা আরম্ভ ও চালনা করিয়াছে একদল শক্তিশালী ভাগ্যান্বেষী। জনসাধারণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত প্যতি-বুর্জোয়ার মধ্য হইতে তাহাদের উদ্ভব; বিপ্লবী মার্কস্‌বাদ সম্পর্কে ধনতন্ত্রের ভয় ও বিদ্বেষ ইহাদের উপজীব্য। মার্কস্‌বাদকে তাহারা ধ্বংস করিতে নামিয়াছে বলিয়া ধনতন্ত্রীরা তাহাদের সহযোগিতা করে বটে, কিন্তু দুর্গত জনগণের সহিত একদা তাহাদের সংযোগ ছিল বলিয়া ধনতন্ত্রীরা সর্বদা খুব আতঙ্কে থাকে। বুর্জোয়া ধনতন্ত্রীরা তাহাদের নেতৃশ্রেণীর মধ্যেও রহিয়াছে, আবার বিনাবাক্যে অনুসরণকারীদের মধ্যেও রহিয়াছে; তথাপি সর্বদা ভয় দেখাইয়া তাহারা ইহাদের হাতের মুঠার মধ্যে রাখে।

অস্‌ট্রিয়ার প্রতিবিপ্লব বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে গড়া। মধ্যযুগীয় ও সামরিক প্রতিক্রিয়াশক্তি ইহার সহযোগী। ইহা আন্তর্জাতিক মার্কস্‌বাদ ও জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ (নাৎসীবাদ) উভয়েরই একত্রে বিরোধিতা করে।

যে ধরনের ফাশিজম্‌ই হোক মিথ্যা ও শঠতার চিরআশ্রয়ে সে পরিপুষ্ট হইয়া ওঠে এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনকল্যাণের নামে যে-কোনো উপায় অবলম্বনে দ্বিধা করে না। হিটলার তাহার 'আমার সংগ্রাম' পুস্তকে নির্লজ্জের মতো ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং মুসোলিনী নিজেকে মাকিয়াভেল্লির একজন পাকা শিষ্য বলিয়া গর্বের সহিত ঘোষণা করেন।

কিন্তু মাকিয়াভেল্লির নীতির সহিত ধর্মের কোনো সংশ্রব নাই; ধর্মের নামে অন্তঃসারশূন্য উক্তিকে এ নীতি স্পষ্টভাষায় নিন্দা করে। আর, নাৎসীবাদ বর্বর জাতিবিদ্বেষ প্রচার করিয়া খ্রীস্টধর্মের মূলে আঘাত করিতেছে।

অস্‌ট্রিয়ায় আজ যে নিপীড়ন ও নির্যাতনের বন্যা চলিয়াছে তাহার কাহিনী নিঃশব্দে চাপা দিয়া এবং নিপীড়িত ও নির্যাতিতের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ কুৎসা রটনা করিয়া প্রত্যেক দেশের 'নিরপেক্ষ' বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি যে অপপ্রচারের অভিযান শুরু করিয়াছে তাহা স্বত্বেও এ-সকল ঘটনায় ইউরোপের

শুধু সোশালিস্ট ও কমিউনিস্টদের মধ্যে নহে, লিবারেলপন্থী বুর্জোয়াদের মধ্যেও দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, ফাশিজম্ যখন ধর্মের মুখোশ পরে তখন তার চেয়ে চিন্তার স্বাধীনতার আর বড় শত্রু নাই। সে তাহা জানে; তাই ধর্মসংশ্রবহীন কোনো আন্দোলনকেই সে সহ্য করিতে পারে না।

যুদ্ধের পর ভিয়েনায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া যে অপূর্ব সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ হইয়াছে, ইউরোপের অন্যকোনো বুর্জোয়া দেশের সমাজতন্ত্রীরা তাহা করিতে পারে নাই। ইতালীর মতো কমিউনিজম্-এর মিথ্যা ভীতি-প্রদর্শনের কোনো অজুহাত এখানে ফাশিজম্-এর ছিল না; জার্মানির মতো জাতির অপমানের প্রতিশোধের প্রশ্নও এখানে উঠিতে পারে না। যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হইয়াছিল অষ্ট্রিয়ার। শ্রমিকশাসিত ভিয়েনা তাহাকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছিল। সামরিক পরাজয়ের সে উদার প্রতিশোধ লইয়াছিল। পাপের গুরুভারে নিপিষ্ট এক পুরাতন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার নবনির্মিত অট্টালিকামালা ছিল মুগ্ধবিস্ময়ে দেখিবার মতো; পশ্চিমের সমস্ত গণতন্ত্রগুলির সে ছিল এক মহান দৃষ্টান্ত। তাই ধর্মের মুখোশধারী ফাশিজম্ তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গগনচুম্বী কীর্তিসত্ত্বেও এ পাপের দাগ ভিয়েনার অঙ্গ হইতে কোনোদিন মুছিবে না; ইতিহাস ভিয়েনাকে কোনোদিন ক্ষমা করিবে না।

অষ্ট্রিয়ার পুরাতন ও মারাত্মক শত্রু রোমের অসম্মানকর সামান্য সাহায্য না পাইলে অষ্ট্রিয়ায় ফাশিজম্ মাথা তুলিতে পারিত না। জার্মান ফাশিস্তদের হাত হইতে বাঁচাইয়া অষ্ট্রিয়াকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করাই ছিল ডুচের চক্রান্ত। এই ডুচের পতনের সময় যখন আসিবে অষ্ট্রিয়ার পতন তখন অনিবার্য হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে ভিয়েনাবাসী যে অপূর্ব বীরত্ব দেখাইয়া পরাজিত হইয়াছে তাহাতে ইউরোপের বিপ্লবীদলগুলির মধ্যে নূতন উদ্দীপনার

সৃষ্টি হইয়াছে। শৌর্যের দৃষ্টান্তে ঐক্য আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে। বিনা সংঘর্ষে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রক্ষমতালাভের যে স্বপ্ন তাহারা দেখিতেছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভিয়েনার যুদ্ধ হইতে তাহারা শিখিয়াছে শৌর্য, সাহস ও কর্মের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী। ভিয়েনার এ-শিক্ষায় শুধু ভিয়েনাই লাভবান হইবে না, লাভবান হইবে সমগ্র জগত। রক্তের অক্ষরে এ-শিক্ষা যাহারা লিখিয়া গেল সেই বীরদের আমরা নমস্কার করি।

১৬। মুসোলিনীর জেলে যাহারা মরিতে বসিয়াছেন

সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

মুসোলিনীর উপর হইতে জগতের দৃষ্টি সরাইয়া লওয়া হিটলারের দুষ্কৃতিগুলির অন্যতম। অগ্নিকাণ্ড, পুস্তকের বহ্ন্যুৎসব, নির্যাতন ও হত্যালীলার বীভৎস উল্লাস মেসিনগান ও ক্যাস্টর অয়েলের বীরের মহিমা ম্লান করিয়া দিয়াছে। আডল্‌ফের পাশে বেনিতোকে উদার ও সহৃদয় বলিয়া মনে হইতেছে। বৃদ্ধ শয়তান আজ নির্বিরোধী ভদ্রলোক সাজিয়াছে। সম্প্রতি অধিকাংশ ছবিতেই তাহাকে গম্ভীর ও সহনশীল রূপে দেখান হইতেছে। আজ ফ্রান্স ও ইতালীর মধ্যে যে আপোসের চেষ্টা চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে যাহাতে জনমত গঠিত হইয়া না উঠিতে পারে তজ্জন্য হিটলারের পাশাপাশি মুসোলিনীকে এমনভাবে দেখানোর চেষ্টা হইতেছে যাহাতে মনে হইবে রোমে আজ পুনরায় শৃঙ্খলা আসিয়াছে এবং অগস্টসের মতো মুসোলিনীও বিবদমান উপদলগুলির কলহ কোলাহলের মধ্যেও শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি একজন মহাপুরুষ, বুর্জোয়াদের ভরসার স্থল তিনি। শিশুদের চরিত্রগঠনের জন্য মুসোলিনীর কাহিনী পড়ানো হইতেছে।

এ আনন্দ উৎসবে আমরা বাধা দিতে চাই। আমরা গাহিতে চাই অন্য গান। থালমানের আঠারো মাস কয়েদ বাস দেখিয়া যাহারা গ্রামসির

সাত বৎসর ধরিয়া তিল তিল যন্ত্রণাভোগের কথা ভুলিয়া যান, আমরা তাহাদের দলে নই। ফুরার-এর পাশে, ফুরার-এর উপরে ডুচের স্থান তৈয়ারী কর। ডুচে গুরুদেব, ফুরার শুধু তাহার শিষ্য।

দুজনকে এক পর্যায়ে রাখিয়া আমি ডুচে-র অপমান করিতে চাহি না। 'আর্যামির' নামে যিনি চিৎকার করিতেছেন, তাহার দুষ্কৃতির মূলে রহিয়াছে নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু যিনি মাকিয়াভেল্লি ও মার্কস্ হজম করিয়াছেন তাহার নিকট কি ভালো কি মন্দ সব কিছুরই মূলে বুদ্ধি। (কিন্তু উন্মাদনা, দম্ভ ও বিদ্বেষ একই জাতের জিনিস।) কি তিনি করিতেছেন, তিনি তাহা ভালোভাবেই জানেন। আরেকজনের মতো তিনি পাগল নহেন, রোজেনবের্গের মতো কোনো গুরু তাহার নাই, জাতি-বিদ্বেষের অন্ধ কুসংস্কারের দ্বারা তিনি পরিচালিত হন না।

কোনো ভাবাদর্শ কোনোদিন মুসোলিনীকে পরিচালিত করে নাই; মুসোলিনীই ভাবাদর্শকে পরিচালিত করিয়াছেন। কোনো ভাবাদর্শের অধীনতা তিনি স্বীকার করেন না, ভাবাদর্শকে দিয়া নিজের অধীনতা স্বীকার করান। বিভিন্ন ভাবাদর্শের সহিত তাহার পরিচয় আছে। কোন ভাবাদর্শ কিসের প্রতীক তাহা তিনি ভালোভাবেই জানেন। আরো ভালো করিয়া জানেন কোন ভাবাদর্শ কিসের বিরোধী, কারণ তাহার প্রতি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। আজ যে-গুলিকে তিনি নির্যাতন করিতেছেন ইহা তাহাদের একটি। না, তাহার বিরুদ্ধে আমরা বুদ্ধিহীনতার অভিযোগ আনিতে পারি না। যে কারণে শত্রু তাহার বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া ওঠে সে কারণ খুঁজিবার জন্য তাহাকে কোথাও যাইতে হয় না। যদি সে কারণ তিনি দেখিতে না পান-তবে বুঝিতে হইবে দেখিতে পাওয়াটাই তাহাকে শত্রুনিধনে বাধা দিবে; তাই এ কারণকে তিনি অস্বীকার করিয়া যান। কিন্তু এ কথা তিনি

কখনো ভোলেন না যে, যাহার অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করিতেছেন সে বিদ্যমান ; যাহার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করিতেছেন সে হার মানিতেছে না ; যে ভাবাদর্শ একদিন তাহার নিজের ছিল সেই ভাবাদর্শকে অবৈধ করা সত্ত্বেও নির্বাসনে ও কারাগারে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই তাহা একটি অনুশোচনার অনুভূতির মতোই বাঁচিয়া আছে। এই ভাবাদর্শের প্রতি নিষ্ঠা যাহাদের এতটুকু বিচলিত হয় নাই, মৃত্যু পর্যন্ত হইবেও না, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ তাহার এত বেশি কি তবে এই জন্যই ! যে কারণেই হোক, তাহার তাহাদের না জানার কোনো কারণ নাই ; এবং নিজের সমস্ত কাজের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ না করিবারও কোনো কারণ নাই। এই ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্যই এমন এক বিশেষ দায়িত্ব তাহার আছে যাহা হিটলারের নাই।

আজ আমরা দণ্ডিতদের লইয়া এই দণ্ডাজ্ঞার সম্মুখে উপস্থিত হইব। এই মহাধূর্ত স্বেচ্ছাচারীর নিকট আমরা এই নির্যাতন-নিপীড়নের কৈফিয়ত দাবী করিব। কারণ দুর্বল লোকদের মতো তিনি তাহার কাজের ফলাফলের জন্য ভাগ্যের উপর নির্ভর করেন না। যাহা তিনি করিতে চাহিয়াছেন, তাহাই তিনি করিয়াছেন।

ইতালী পর্যটন শেষ করিয়া সম্প্রতি পারিতে ফিরিয়া যাহারা ফাশিজম্-এর গুণকীর্তন শুরু করিয়াছেন, যাহারা ইতালীর চির-উজ্জ্বল আকাশে কখনো মেঘের ছায়া পর্যন্ত দেখেন নাই, কারাগারে কি নির্বাসনে কোথাও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে সামান্যতম বিক্ষোভও যাহাদের চোখে পড়ে নাই, তাহাদের উচ্ছ্বসিত বর্ণনার পরিপূরক বলিয়া নিম্নোক্ত সামান্য ঘটনা কয়টি যোগ করিয়া দিতে আমরা তাহাদের অনুরোধ করিতেছি।

ইতালীতে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে মোট ৩,৫০০ নাগরিকের বিচার হইয়াছে।

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তের সংখ্যা, ২০০।

১৯২৬ সাল হইতে আজ পর্যন্ত নির্বাসিতের সংখ্যা ৩,০০০।

সর্বসমেত মোট কারাবাস হইয়াছে ১২,০০০ বৎসরের। ১৯৩২ সালের হিসাবে :

স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ২৭৭ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিচার করিয়াছেন ; দণ্ডিতের সংখ্যা ২২০, ইহাদের দুইজনের হইয়াছে মৃত্যুদণ্ড ; ৭০০ জন অতিরিক্ত নির্বাসিত ; প্রায় ১০,০০০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া কিছুকাল বন্দী রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৯৩৩ সালে :

৬১ জনের অতিরিক্ত দণ্ডাজ্ঞা ; প্রায় ৬০০ নির্বাসিত ; ৫০০ জন বিচারের জন্য প্রতীক্ষমান ; গ্রেপ্তার হইয়া কিছুকাল কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন প্রায় ১,৩০০ জন।

রাষ্ট্ররক্ষার জন্য বিশেষ ফাশিস্ত আইন প্রবর্তিত হইবার পর ১৯২৬ সালের নবেম্বর মাস হইতে হাজার হাজার নারীকে রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার করা হয়। উহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ ১৭।১৮ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অধিকাংশকেই রাখা হয় ত্রানির ভয়াবহ কারাগারে অথবা পনৎসাদ্বীপে। স্বাস্থ্যের অবস্থা সেখানে জঘন্যতম। তুরিন-এর শিক্ষয়িত্রী কামিল্লা রাভেরা এবং বলোঞার শিক্ষয়িত্রী লিয়া গিয়াকাগালিয়ার মতো অনেকেই সেখানে ফুস্‌ফুসের অথবা অন্য প্রকারের যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর দিন গণিতেছেন। সেলের মধ্যে নিঃসঙ্গ অবরোধে থাকার ফলে (ফাশিস্ত পিনাল কোড না মানিয়া ত্রানিতে এই শাস্তি সর্বদাই দেওয়া হয়) অনেকের মস্তিস্কবিকৃতি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। যাহাদের উন্মাদরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে জর্জিনা রসেটি একজন। এই তরুণীটি মনগ্রান্দোর কাপড়ের কলে কাজ করিতেন। তাহার অপরাধ, জনৈক দণ্ডিত ব্যক্তির ইনি বাগ্‌দত্তা ছিলেন।

স্ত্রী কয়েদীদের সন্তানগুলিকে পেরুজ, রোম, মিলান ও ত্রিয়েস্তের জেলে রাখা হইয়াছে।

পিয়ানোসার বিষণ্ণ আবহাওয়ায় অথবা সিভিতা ভেকিয়ার জেলে যে সকল বন্দীরা নির্বাসিত বা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন তাহাদের কথাও লিখিতে গেলে একখানি বিরাট শহিদনামা রচনা করিতে হয়।

সিভিতা ভেকিয়ার জেলে আছেন আইনজীবী উম্বের্তো তেরাচিনি। ইনি বিশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত, সম্প্রতি যক্ষারোগে আক্রান্ত। আর আছেন ফাদার্ জিরোলামো লি কোজি, বিশ বৎসর নয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত, সম্প্রতি অবস্থা উদ্বেগজনক। পিয়ানোসায় তুরাতির বন্ধু আইনজীবী সান্দ্রোপর্তিন দশ বৎসরের দণ্ডাজ্ঞা ভোগ করিতেছে, সম্প্রতি যক্ষারোগে শেষ অবস্থায় উপনীত। গ্রেমোনার আইনজীবী রেজোলিনো ফেরানি—বিশ বৎসরের দণ্ডাজ্ঞা, যক্ষায় আক্রান্ত। জিনোলুসেভি নামক কারাবীর এক প্রস্তর-শিল্পী ত্রিশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত, আজ অন্ধ হইতে বসিয়াছেন। ডাঃ মাউরো স্কচ্চিমারো গুরুতর চক্ষুরোগে ভুগিতেছেন, দণ্ডাজ্ঞা বিশ বৎসরের। স্টেশন-মাস্টার ইসিদোরো আৎসারিও-র হইয়াছিল দশ বৎসরের জেল; মস্তিস্ক বিকৃত হওয়ায় ইনি সম্প্রতি উন্মাদ আশ্রমে বন্দী আছেন। খনি-মজুর বাতিস্তা সান্তিয়ার জেল হইয়াছে ১৭ বৎসরের। প্রাক্তন কমিউনিস্ট ডেপুটি দোমেনিকো মার্কিওরোও ১৭ বৎসরের জেল; বর্তমানে গুরুতর পাকস্থলীর পীড়ায় শয্যাগত।

কিন্তু, এই মৃত্যুপথযাত্রীদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, রোমের ঝুটা-সম্রাট যাহাকে রথের চাকায় বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, 'সেই আন্তোনিও গ্রামসির কথা এইবার বলিব।

তিনি নেতা। দুঃখবরণের কঠোরতায় তিনি বহুর মধ্যে স্বতন্ত্র। ইতিহাসে মাত্তেওত্তির পাশেই তাহার নাম ক্ষোদিত থাকিবে। হৃদয় তাহার মাত্তেওত্তির মতোই বিশাল, মনের দিক হইতে তিনি বোধ করি মাত্তেওত্তির চেয়েও বড়। কারণ, ইতালীতে নূতন সমাজব্যবস্থা গঠনে তিনিই ছিলেন অগ্রণী।

এই মহাপুরুষের পরিচয় এখনো ফ্রান্স ভালোভাবে পায় নাই। তাই ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিব।

পৃষ্ঠদেশ সামান্য ন্যুব্জ, বড় বড় দুই চোখে সরল সম্মুখ দৃষ্টি, সে দৃষ্টি যেন কী খুঁজিয়া ফিরিতেছে; বিশাল ললাটটিকে ঘনতরঙ্গিত কেশদাম যেন মুকুটের মতো ঘিরিয়া রাখিয়াছে। দুর্বল দেহে লৌহকঠিন মনোবল। শিশুকাল হইতে রুগ্ন হওয়ার ফলে সঙ্গীদের সাথে তিনি খেলিতে পান নাই; ফলে পড়িবার ও ভাবিবার একটা অদ্ভুত নেশা তাহাকে চিরজীবনের মতো পাইয়া বসিয়াছে। কোনো তিক্ততা নাই। আছে শুধু শিখিয়া শিখাইবার আনন্দ। আর আছে সংস্কৃতির প্রতি একটা অদ্ভুত আসক্তি। শুধু সংস্কৃতি গ্রহণ নহে, সংস্কৃতি বিতরণের একটা অধীর আকাঙ্ক্ষা তাহার মধ্যে অনির্বাণ দীপ শিখার মতো জ্বলিতেছে। উত্তরজীবনে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই সম্পদবিতরণ তিনি পরম কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন: "যাহাদের বর্ণপরিচয় হয় নাই তাহাদের পার্টি হইতে বহিষ্কৃত করিবার উদ্যোগ পর্যন্ত আমি করিয়াছিলাম। কমিউনিস্ট কখনও নিরক্ষর হইতে পারে না। জীবনের যত কিছু মিথ্যা ও শূন্যতাকে আমরা আঁকড়াইয়া থাকি; সব কিছু বিসর্জন দিয়াও তাহাকে ইহা শিখিতে হইবে।"

তাহার জন্ম হয় সার্দিনিয়ায়, তুরিনে তিনি শিক্ষালাভ করেন। অল্প বয়সেই তিনি পিয়ের মন্তেসির শক্তিশালী শ্রমিকদের সংস্পর্শে আসেন। ইতালীর মজুর ও কৃষকদের মধ্যে সংযোগ সাধন করিতে তিনি ছাড়া আর কেহ পারে নাই। ইতালীয় রাষ্ট্র কর্তৃক নিপীড়িত সার্দিনিয়ার বাসনা বেদনা এবং উত্তর ইতালীর শ্রমিকের বিপ্লবী প্রকৃতি তাহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, বক্তৃতার ঝড় তিনি তুলিতে পারেন না। যাহারা পারে তাহাদের তিনি সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে দেখেন। কিন্তু লেখনী

তাহার ক্ষুরধার, তীক্ষ্ণ ও নির্মম। তাহার রচনাভঙ্গীকে পেগুয়াই-এর রচনাভঙ্গীর সহিত তুলনা করা হয়। বারম্বার তীব্র তীক্ষ্ণভাবে এককথা বলিয়া বক্তব্যকে তিনি পাঠকের মনের গহনে প্রবেশ করাইয়া দেন। তাহার দার্শনিক মন হেগেলীয় দর্শনে পরিপুষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভাষাতত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাই মন তাহার সর্বোপরি দ্বান্দ্বিক শক্তিতে শক্তিমান। তাহার প্রথম প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয় তুরিনের ক্রিঁ ত্য প্যেপ্‌ল্‌ কাগজে এবং লাভান্তি-তে। ১৯১৯ সালের মে মাসে ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকরী সমিতির সহযোগিতায় তিনি আর্দিনে নুওভো নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাহার সম্পাদকীয় দপ্তর এক সময় ইতালীর শ্রমিক বিপ্লবের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯২৫ সালে তিনি লেখেন: "বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; ইহাই যথেষ্ট নহে। স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন কখনো শ্রমিকশ্রেণীকে বর্তমান বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমা ছাড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না। চাই সচেতন যোদ্ধা, চাই ভাবাদর্শের জ্ঞান অর্থাৎ যে-অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম সে করিতেছে সে-অবস্থা তাহাকে বুঝিতে হইবে, যে সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যে সে বাস করে শ্রমিককে তাহার স্বরূপ চিনিতে হইবে; এই সম্পর্ক-ব্যবস্থার মধ্যে কোন মৌলিক শক্তি কাজ করিতেছে, বুঝিতে হইবে সামাজিক বিকাশের সেই ধারাগুলিকে, সমাজের বুকের সমন্বয়ের অযোগ্য কতকগুলি বিরোধীশক্তি যে-ধারাগুলির মূলে……"

এইভাবে তিনি শ্রমিকবিপ্লবের শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু তাহার শিক্ষা প্রকাশ পাইল কথার মধ্য দিয়া নহে, কাজ ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মধ্য দিয়া। ১৯১৯-২০ সালে তুরিনে তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই 'কারখানা-পরিষদ' আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। এইগুলিকেই তিনি সংগ্রামের মধ্যে বিপ্লবী সেনাবাহিনীর ইউনিটে এবং জয়লাভের পর শ্রমিক রাষ্ট্রের ইউনিটে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। জয়লাভ তাহার দেখিয়া যাওয়া ঘটিল না, কারণ সোশাল ডেমোক্রাট

দলের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কারখানা অধিকার, বিশেষ করিয়া ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে ২৫,০০০ শ্রমিকের তুরিনের ফিয়াট কারখানা অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই।

কিন্তু তুরিনের শ্রমিকেরা একটা মহান দৃষ্টান্ত দেখাইল। ইউরোপের অপরপ্রান্তে বলশেভিক রাশিয়ার বিরাট ও বিজয়ী রাষ্ট্র-পরীক্ষার সহিত এ দৃষ্টান্তের সংযোগ রহিয়াছে। এই তরুণ নেতার প্রতি জর্জেস সোরেল ও বেনেদেত্তো ক্রোচে-র দৃষ্টি পড়িল।

গ্রামসি ছিলেন ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য। তাহার অর্দিনে নুওভো পত্রিকা তখন দৈনিক হইয়াছে। এই দৈনিকখানি দুই বৎসর ধরিয়া শ্রমিকশ্রেণীর সংযুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের জন্য, মতবাদের দিক হইতে (Theoretical) পার্টির পুনরুজ্জীবনের জন্য, এবং নিম্নমধ্যশ্রেণী বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশের সমর্থন লাভের জন্য সংগ্রাম চালায়। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবচেয়ে হৃদয়বান পিয়েরো বাবেত্তির সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। দুইজনেই ছিলেন হেগেলীয় দর্শনে সুপণ্ডিত। তাহারা দুইজনে মিলিয়া লিবারেলিজম্ ও কমিউনিজম্-এর সর্বশক্তি একত্রিত করিবার চেষ্টা করিলেন।

১৯২২ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল-এর তিনি ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং ১৯২৩-২৪ সালে ভিয়েনার অধিবেশনে বিশেষ যোগ্যতার সহিত ইতালীর প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ভেনিসে ডেপুটি নির্বাচিত হন এবং মাত্তেওত্তির মৃত্যুর পর পার্টির পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। বিরোধীদলের সম্মেলনে তিনি সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট ঘোষণার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাহার প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। তিনি তাহার সংখ্যালঘু দল লইয়া পার্লামেণ্টে ফিরিয়া আসেন এবং একদিকে ফাশিজম্-এর বিরুদ্ধে ও অপরদিকে লাভান্তির

নিরাকার প্রতিরোধের বিরুদ্ধে একসঙ্গে সংগ্রাম চালান। শ্রমিক বিপ্লবের ভয়ে লাভাস্তি দল তখন বিনা সংগ্রামেই পলাতকা-নীতি গ্রহণ করেন। যদিও তাহাদের এই কার্যে মুসোলিনীই লাভবান হইলেন, তথাপি দার্শনিক মহামতি আমেন্দ্যো মুসোলিনীর প্রতিহিংসার কবল হইতে রক্ষা পাইলেন না। এই বিষণ্ণ দার্শনিকের রাজনীতি খাপ খাইত না; তথাপি কেমন করিয়া যেন রাজনীতিতে তিনি ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন।

গ্রামসির কাছে দর্শন ও রাজনীতি বিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনিও ডুচের কবল হইতে রক্ষা পাইলেন না। কিন্তু তিনি পতিত হইলেন যুদ্ধ করিতে করিতে। ১৯২৬ সালে নবেম্বরের প্রথম দিকে রোমে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যদিও তিনি একজন ডেপুটি ছিলেন তথাপি তাহাকে উস্তিকা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। কয়েক মাস পরে ঐ দ্বীপেই আবার তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির অন্যান্য সদস্যদের সহিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে অবৈধভাবে তাহার বিচার হয়। ইহা বিশেষ আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বেকার ঘটনা। তিনি নেতা ছিলেন বলিয়া তাহারা তাহাকে বিশ বৎসরের কারদণ্ড দিয়া সম্মানিত করে।

যে লোক মেরুদণ্ডের যক্ষা, ফুসফুসের ক্ষত, রক্তের চাপবৃদ্ধি প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছে তাহার পক্ষে এ দণ্ডাজ্ঞার অর্থই মৃত্যু। তুরি দি বারি-র কারাগারে কয়েকদিন ধরিয়া বার বার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন এবং গায়ে তাহার চব্বিশ ঘণ্টা জ্বর রহিয়াছে; তার উপর ভালো সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা সেখানে নাই। রোম হাসপাতালের ফাশিস্ত অধ্যাপক উম্বের্তো আর্কাঞ্জেলি ১৯৩৩ সালের মে মাসে তাহাকে দেখিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে তিনি স্বীকার করেন: "এ অবস্থায় তিনি বেশি দিন বাঁচিতে পারেন না এবং যদি তাহাকে শর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া সম্ভব না হয় তবে তাহাকে কোনো বেসামরিক হাসপাতালে অথবা ক্লিনিকে স্থানান্তরিত করা উচিত।"

শর্তাধীনে স্বাধীনতার প্রস্তাব তাহার নিকট করা হইয়াছিল। শর্ত ছিল ক্ষমা প্রার্থনা ও মতবাদ প্রত্যাহার। ইহাকে আত্মহত্যা করার সামিল বলিয়া এ-শর্ত তিনি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমরাও তাহার জন্য ও তাহার পক্ষ লইয়া মার্জনা ভিক্ষা করিব না। যিনি আজীবন পরম নিষ্ঠার সহিত আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন তাহার তো মার্জনা চাহিবার কিছু নাই।

তাই তিনি মরিতে চলিয়াছেন। মরিয়া তিনি হইবেন ইতালীয় সাম্যবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। তাহার ছায়ামূর্তি, তাহার রাখিয়া-যাওয়া প্রদীপ্ত দীপশিখা ইতালীর কমিউনিজম্‌কে ভবিষ্যৎ সংগ্রামে পরিচালিত করিবে। ইহাই কি ছিল মুসোলিনীর চক্রান্ত? শুনিয়াছি সম্প্রতি তিনি রোমান ফোরামে কর্নেলে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। নেপোলিয়ানের অনুকরণে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, তিলসিতে নেপোলিয়ান তাহার সম্মুখে সিয়ানে নাটকের অভিনয়ের নির্দেশ দিয়াছিলেন। মুসোলিনী এ নাটকখানি পড়িলে উপকৃত হইবেন। তিনি বুঝিতে পারিবেন তাহার মধ্যে চিরদিন কিসের অভাব : উদারতা।

১৭। স্পানিশ-বিপ্লবকে অভিনন্দন

৪ঠা নবেম্বর, ১৯৩৪

বার্সেলোনা ও ওভিত্রভোর যোদ্ধাগণের উদ্দেশে আমরা নমস্কার করি। অভিনন্দিত করি সেই অভিযানকে, ১৮৭১ সালের কমিউনের পর পশ্চিম ইউরোপে যার চেয়ে বীরত্বপূর্ণ সর্বহারার অভিযান আর হয় নাই। কমিউনের পরাজয় হইতেই যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজয়ী বিপ্লব জন্ম লইয়াছে, তেমনই অস্ট্রিয়াসের রক্তসিক্ত পর্বতমালা হইতে ইউরোপের সর্বহারাদের এমন এক বিজয়বন্যা নামিয়া আসিবে যাহা সমগ্র জগতকে পরিপ্লাবিত করিবে।

স্পেনের অনির্জিত বিপ্লবের সহিত আমরা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন ঘোষণা করিতেছি। তাহাদের নিকট আমাদের ঋণ অপরিসীম। তাহাদের ক্ষতে

আমরা যেন প্রলেপ লাগাইতে পারি, ঘাতকের হাত হইতে শিকার যেন আমরা ছিনাইয়া আনিতে পারি।

১৮। ফাশিজম্ই শত্রু, উহাকে ধ্বংস কর

১০ই জুন, ১৯৩৪

যে ধনতন্ত্রী ব্যবস্থা আজ পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া রাজত্ব করিতেছে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুধু তাহার অনিবার্য পরিণতি নহে, বাঁচিবার শর্তও বটে। অস্ত্রোৎপাদনকারিগণের, বৃহৎ ব্যাবসায়িগণের, তৈল, ইস্পাত ও রাসায়নিক শিল্পের ধনপতিগণের শেষ আশ্রয়স্থল এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। ইহারাইতো নেপথ্য হইতে গভর্নমেণ্ট পরিচালনা করে। এই অস্ত্রসজ্জিত বণিক-পর্যটক সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধে বিজয়ী ধনতন্ত্রের পণ্য বলপূর্বক বিজিত দেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। সামাজিক বিক্ষোভকে বিভ্রান্ত করিবার পক্ষেও ইহার চেয়ে বড় অস্ত্র আর নাই। 'দেশ বিপন্ন' এই ধ্বনি তুলিয়া সামরিক আইনের আঘাতে বিদ্রোহকে সে শান্ত করে। যুদ্ধরত কোনো জাতির পরাজয় ও দুর্দশার সুযোগ লইয়া ধনতন্ত্রীব্যবস্থার উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে নূতন সমাজব্যবস্থা স্থাপনা মোটেই সহজ নহে। রাশিয়ায় যাহা ঘটিয়াছে তাহা অস্বাভাবিক, সচরাচর ইহা ঘটে না। প্রায় ক্ষেত্রেই যুদ্ধ জাতিকে এক অন্ধ সামরিক দাসত্বে অভ্যস্ত করিয়া নিজেদের চিন্তা করিবার ও সংকল্প করিবার পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দেয়। একটি ভয়াবহ জাতীয়তাবাদী দম্ভে আচ্ছন্ন হইয়া তাহারা বৃহত্তর মানবসমাজের অনুভূতি হারাইয়া বসে। ইহার ফলে দেখা দেয় স্বেচ্ছাচারী এক-নায়কত্ব ও ফাশিজম্। জীবন দিয়া আমাদের ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে।

ইউরোপের হাজার হাজার লোক এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন, তাই তাহারা ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দলবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু এ-কথাও না বলিয়া পারিতেছি না যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমস্টার্ডাম—প্লেই-

এলে'র আন্দোলনের অনস্বীকার্য গুরুত্ব সত্ত্বেও ফ্রান্সে (ফ্রান্সের কথাই সবচেয়ে ভালো জানি) বিশেষত ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলিয়াছে। দুর্নীতিদুষ্ট পার্লামেন্টী শাসনের কতকগুলি কদর্য কলঙ্ক সম্প্রতি প্রকাশ হইয়া পড়িবার পর ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলেই বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের বিদ্রোহ বিভ্রান্ত বিক্ষোভে ধূলিকণায় ঝড়িয়া পড়িতেছে এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তি সেই ধূলিকণাগুলিকেই ধরিয়া একত্রে তাল পাকাইয়া আপনার কাজে লাগাইতেছে। (বুদ্ধিজীবীরা ইহা জানুক বা না জানুক এই ব্যাপারই ঘটিতেছে)। মূঢ় আত্মসন্তোষে অন্ধ হইয়া বাস্তবকে আমি অস্বীকার করিতে পারিব না। অন্যান্য দেশের মতোই ফ্রান্সেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকল বুদ্ধিজীবীই একটা দাম্ভিক ভাবাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ দূরে থাকুক, সাধারণ মানুষের কল্যাণের চেয়ে নিজেদের সুযোগ সুবিধা রক্ষার এমন কি বাড়াইবার জন্য তাহারা উদগ্রীব।

শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শ সম্পর্কে তাহারা শুধু উদাসীন নহেন, সম্প্রতি ইহাতে তাহারা উদ্বিগ্ন ও ক্রুদ্ধ হইতেও শুরু করিয়াছেন। ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে তিন চার বৎসর অতীতে যাইতে হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন সমগ্র জগতের সম্মুখে তাহার বিপুল সাফল্যের কথা এবং বিপ্লবী ও গঠনমূলক লেনিনপন্থী মার্কসবাদের বিজয়বার্তা ঘোষণা করিল তখন হইতেই ইউরোপের বুদ্ধিজীবিগণ আপনাদের অবস্থা সম্পর্কে স্বার্থপরের মতো শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। কমিউনিজম্‌কে অলীক কল্পনা ভাবিয়া তাহার ছায়া লইয়া এতদিন তাহারা খেলা করিতেছিল, আজ তাহার সত্যকার মূর্তি দেখিয়া শঙ্কায় তাহারা পিছাইয়া গেল। যে শ্রমজীবীজগতে বুদ্ধিজীবীর বিশেষ সুবিধাভোগের অধিকার থাকিবে না সেই জগতের অভ্যুদয়ের প্রতি তাহাদের যে ভয় ও বিতৃষ্ণাকে তাহারা এতকাল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে গোপন করিয়া আসিয়াছে, সেদিন

হইতে সে ভয় ও বিতৃষ্ণাকে তাহারা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করিতে লাগিল। তরুণদের কাছে বিপ্লব কথাটির একটা বড় আকর্ষণ আছে। তাই তাহারা তরুণদের কাছে বাগবিভূতি বিস্তার করিয়া প্রমাণ করিতে লাগিয়া গেল যে সত্যকার বিপ্লব শ্রেণী-সংগ্রামের বিপ্লব নহে, বিশেষ সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রভুত্বই প্রকৃত বিপ্লব। ইহাকেই বুদ্ধিজীবীরা ফ্রান্সে গালভরা নাম দিয়াছে, "মনের বিপ্লব।"

অগ্রগামী মানুষের জীবন্ত জগত হইতে বিচ্ছিন্ন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের কুলীনেরা যে সম্ভোগের দিবাস্বপ্ন দেখিতেছেন তাহার কথা আমরা ভালোভাবেই জানি। শিশু কিন্তু বয়সে বৃদ্ধ রেনানের মুখে ইহার কথা আমরা শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন ভবিষ্যতে শাসন চালাইবে একদল বুদ্ধিজীবী, কোনো এক মহাপ্রাণ দার্শনিক স্বেচ্ছাচারীর নেতৃত্বে। (এ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজের তার খুব বেশি আস্থা ছিল না)। যে মিথ্যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে একদিন আমরা আমাদের বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পের উৎস বলিয়া ভাবিতাম তাহার পদস্খলন আমরা বুদ্ধিজীবীরা অতীতে দেখিয়াছি। নিজের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষুদ্র অধিকার-বোধকে একদিন আমরা প্রায় সকলেই ভুল করিয়া সেই বৃহত্তর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত এক করিয়া দেখিয়াছিলাম যাহা সমাজের গভীরে শিকড় প্রোথিত করিয়া প্রাণরস আহরণ করে। মানুষের সৃষ্টিপ্রয়াসের যে আবশ্যিক ঐক্য ও সংযোগ ইতিহাসে আমাদের সমস্ত বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহার কথা আমাদের চিন্তা করা উচিত। যে শিল্পী সব চেয়ে বেশি স্বাতন্ত্র্যবাদী সে যখন ভাবে যে নিজেকে ছাড়া আর কাহাকেও সে ব্যক্ত করিতেছে না, তখন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সেই ভূমিকাটুকুরই অভিনয় করিতেছে যে-টুকু তাহার জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে আরব্ধ এক ঐকতানের বিকাশের জন্য তাহাকে দিবার অগ্রিম ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে শুধু নিজের উচ্চারণ, নিজের গন্ধটুকু যোগ করিয়া যাইতেছে। আমরা সকলেই

সেই বিরাট 'অর্কেস্ট্রার সভ্য। সেই মহাসংগীতের মহাসঙ্গত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমাদের একক সংগীতের কোনো মূল্যই থাকিবে না।

সাম্যবাদী সমাজ যখন আজ তাহাদের বিকাশের পথে আরো বিস্তৃতি, আরো গভীরতা, আরো স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি লইয়া দেখা দিয়াছে, তখন তাহাদের আর ভয় কিসের? কোপার্নিকাস ও গালিলিওর পূর্বে যাহারা জন্মিয়াছিলেন তাহারা তাহাদের গ্রহটির চিরস্থায়ী শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসন হইতে বিচ্যুতির সম্ভাবনায় শঙ্কিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাদের মনে হইয়াছিল শূন্যের অসীমত্ব প্রচার হইয়া পড়িলে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবেন।

আজিকার মিথ্যা ও সত্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বেলায়ও এই কথাই খাটে। আমি দুইটি। এক আমি আমার অহমিকা লইয়া; দ্বিতীয় আমি সমস্ত মানুষের সহিত মিশিয়া আমি। যাহারা একদিন গালিলিওকে দণ্ডিত করিয়া পৃথিবীর গতি বন্ধ করিতে চাহিয়াছিল আজিকার প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীরা তাহাদেরই জ্ঞাতিভ্রাতা। নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা আজ মানুষের বিবর্তনের অমোঘ আইনকে বাধা দিতে চাহিতেছে। তাহাদের বিপরীত বিপ্লবের ইহাই গোপন উদ্দেশ্য। তাহাদের 'মনের বিপ্লব' স্বার্থান্বেষী-গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া মাত্র।

তার উপর রাজনীতির জটিল যন্ত্রটিকে বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই, দাম্ভিকতার ফলেই তাহারা অতি সহজে নেপথ্যবিহারী বণিকধুরন্ধরগণের হাতের মধ্যে গিয়া পড়ে। তাহারা তাহাদের দিয়া নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে এবং তাহাদের হাত দিয়াই উহাদের ফাশিস্ত বটিকা খাওয়াইয়া দেয়।

ফাশিজম্ আজ ইউরোপের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত, কোথাও আর্সি হাতে বিজয়ীর বেশে, কোথাও গোপনে ঘাসের মধ্যে সাপের মতো। ইতালী

কি জার্মানিতে উহা যে-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে ফ্রান্সে সম্ভবত সে-রূপে হইবে না: দশটি জাতির সংমিশ্রণে গঠিত ফরাসী জাতি জাতি-বিদ্বেষী ভাবাদর্শ গ্রহণ করিবে না: ডুচের ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞাও রপ্তানির বস্তু নহে। স্বল্পবিত্ত নিম্ন-মধ্যশ্রেণী, গোষ্ঠীস্বার্থান্ধ জাতীয়তাবাদী সরকারীশ্রেণী, উদ্ধত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যস্ফীত বুদ্ধিজীবীর দল, ধর্মযাজকীয় প্রতিক্রিয়া দ্বারা দীর্ঘদিন ধরিয়া সুনিপুণভাবে দীক্ষিত ও শিক্ষিত এক জেনারেল স্টাফের অধীনস্থ সেনাবাহিনী এবং বৃহৎ ব্যাঙ্ক ও বৃহৎ শিল্পের অধিনায়ক অল্পসংখ্যক অথচ দারুণ শক্তিশালী নেপথ্যবিহারী কয়েকজন লোক—এই সকলের মিশ্রণেই ফরাসী ফাশিজম্ গড়িয়া উঠিতেছে। এ যেন ক্রাসাস, লুকুসাস ও সাইলার রোমান গণতন্ত্র—সামরিক ও বাণিজ্যিক অধিনায়কগণের গণতন্ত্র।

এই বিপদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের অনভিজ্ঞ তরুণদের সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। পার্লামেন্টের গলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্বেষকে জাগাইয়া তোলা হইয়াছে; প্রথম আঘাতেই ইহা ধ্বসিয়া পড়িবে। কিন্তু এই আঘাত যাহারা হানিবে সেই জনসাধারণ ও তরুণের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া স্বেচ্ছাচারী ফাশিজম্। ফাশিজম্ই প্রকৃত শত্রু। ফাশিজম্কেই ধ্বংস করিতে হইবে।

আমি কাহাদের জন্য লিখি

ডিসেম্বর, ১৯৩৩

কেন লিখি? কাহাদের জন্য লিখি? এ দুইটি প্রশ্নকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারি না। তাই প্রশ্ন দুইটির এক সঙ্গেই জবাব দিব।

"কেন লিখি?" কারণ, না লিখিয়া আমি পারি না। যদি কাগজের উপর নাও লিখিতাম, তবে লিখিতাম মনে-মনে, লিখিতাম চিন্তার মধ্যে, লিখিতাম আমার চিন্তাগুলিকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিয়া তুলিবার জন্য। কেন লিখি? কারণ, লেখা আমার কাছে চিন্তা করিবার, কাজ করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। লেখা আমার কাছে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের মতো, লেখা ছাড়িয়ে আমি বাঁচিব না।

'কমিউন' পত্রিকা যে প্রশ্নাবলী আমার নিকট পাঠাইয়াছেন সেই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাহারা এই 'কেন'র মধ্যে যে 'আদর্শবাদী নৈরাশ্যের' ইঙ্গিত করিয়াছেন, আমার 'কেন'র মধ্যে তাহা নাই। প্রত্যেক মানুষ শ্বাসযন্ত্র দিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে। প্রত্যেকেরই কাজ করিবার নিজস্ব ভঙ্গী আছে। যেমন মানুষ তেমনই কাজ—হয় নৈরাশ্যবাদী, নতুবা আশাবাদী, হয় স্বার্থপর অথবা সমষ্টি কল্যাণগত।

আমার সকল কাজ সকল ক্ষেত্রেই চিরদিনই গতিপন্থী। যাহারা থামিয়া নাই, চিরদিন আমি তাহাদের জন্যই লিখিয়াছি। আমি নিজে কোনো দিন থামি নাই; আশা করি যতদিন বাঁচিব থামিব না। জীবন যদি সম্মুখপানে চিরচলমান না হয়, তবে আমার কাছে জীবন অর্থহীন। তাই যে সকল জাতি ও শ্রেণী পথ কাটিয়া চলিয়াছে মহামানবের সমুদ্র পানে, আমি আছি তাহাদের

সাথে। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমজীবী সাধারণের এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট গণতন্ত্র সঙ্ঘের সহযাত্রী আমি। ঐতিহাসিক বিবর্তনের অপ্রতিরোধ্য উত্তাল তরঙ্গ তাহাদের বহন করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের ভবিতব্যই আমার ভবিতব্য।

'কাদের জন্য লিখি'। অভিযাত্রী সেনাবাহিনীর যাহারা অগ্রগামী দল, এমন এক বিপুল আন্তর্জাতিক সংগ্রাম যাহারা শুরু করিয়াছে যাহা সফল হইলে শ্রেণী ও সীমান্তের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া এক মহামানব সমাজের সৃষ্টি হইবে, আমি লিখি তাহাদেরই জন্য। আজ কমিউনিজম্ সমাজসংগ্রামের এমন এক বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান যাহা আপোস জানে না, গোপনতা জানে না, যাহা এক সুচিন্তিত, নির্ভীক যুক্তিবাদকে সম্বল করিয়া সু-উচ্চ পর্বতভূমি অধিকার করিতে চলিয়াছে। সেনাবাহিনীর অবশিষ্টাংশ তাহাদের অনুসরণ করিবে —পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে হয়তো অনেকেই, হয়তো অনেকেই করিবে দলত্যাগ, হয়তো পশ্চাদপসরণ হইবে বহুবার। যাহারা পিছনে পড়িয়া আছে তাহাদের দ্রুত আগাইয়া আসিবার জন্য আমরা লেখকেরা আহ্বান জানাইতেছি। অভিযাত্রী বাহিনী কখনো থামিবে না।

আর. আর